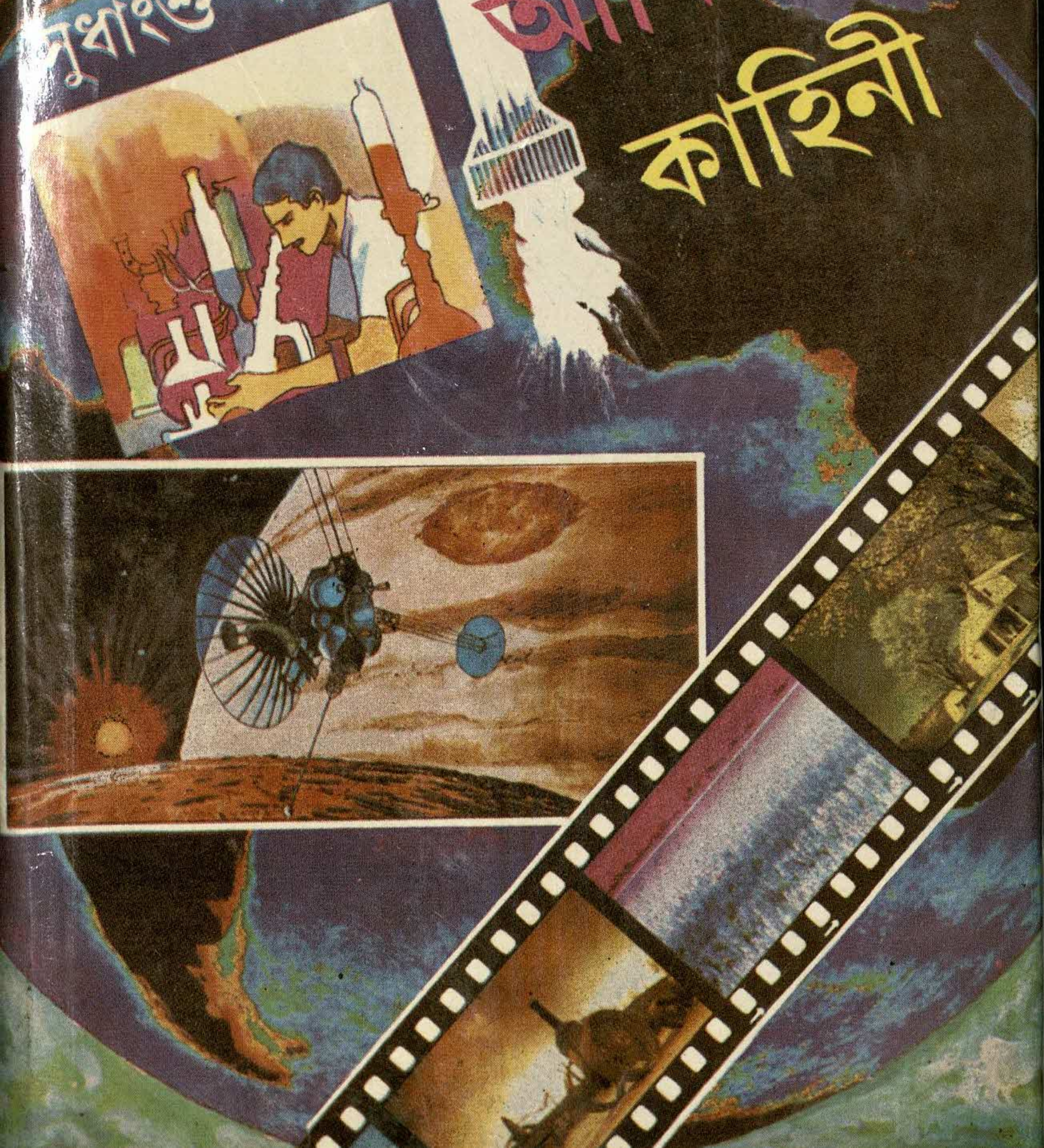
আরও একশত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী

সুধাংশু পাত্র



আরও একশত

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী

সুধাংশু পাত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ ১৩৯৯
এপ্রিল ১৯৯২

প্রকাশক :
সুধাংশু শেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

ISBN-81-7079-118-9

মুদ্রাকর :
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৪

Acc. no. - 16584

দাম : ৫০ টাকা
Price : Rupees Fifty only.

সূচীপত্র

আরও একশত
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী

এই লেখকের অন্যান্য বই

একশত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী
চাঁদের দেশ
ভারতের মহাকাশ গবেষণা ও অগ্নি
পশুপাখী ও পতঙ্গদের গপ্পো
সভ্যতার আদিপর্বের আবিষ্কার ও তৎপরতা
বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত
জীবজগতের বিস্ময়
পদার্থ বিজ্ঞানের সহস্র জিজ্ঞাসা
মহাকাশ বিদ্যা ও কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা
বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ
বিজ্ঞানী চরিতকথা
বিজ্ঞানে অমর প্রতিভা
মনের মতো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গপ্পো
ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অভিযান
ছোটদের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা
বিশ্ব পরিবেশ ও মানুষ
জীবনের জয়যাত্রায় মানুষ
আজকের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা
বিজ্ঞানের সহজপাঠ
খাদ্য, পুষ্টি ও পরমায়ু
মহাসাগরের মহাবিস্ময়

পৃথিবীর ফেলে আসা দিন

অতীতের পৃথিবী—প্রায় সাড়ে চারশ' কোটি বছর আগে যার জন্ম, উত্তপ্ত পরিবেশটাকে শীতল করতে যার সময় লেগেছিল প্রায় দুশ' কোটি বছর, যার অঙ্গের লাবণি আর বক্ষের সুষমা আনাতে সাগর তলায় মুখ ঢেকে জীব ও উদ্ভিদের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল কম করে পঞ্চাশ কোটি বছর, এক-কোষী থেকে বহুকোষীদের আনতে আরও অন্তত কয়েক কোটি বছর সাধনায় নিমগ্ন হতে হয়েছিল, সেই সেকাল থেকে সে কী নিজ অক্ষের চারদিকে, চব্বিশ ঘণ্টায় একবার করে পাক খেয়ে আসছে? সেই প্রথম থেকে কী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে আজকের মত ৩৬৫ ¼ দিনে?

জবাব দেবে কে? তার শ্রেষ্ঠ সন্তান মানুষদের সভ্যতা এইতো সেদিনের ঘটনা—আজ থেকে বড় জোর পাঁচ কী সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগের ঘটনা। তার আগে মানুষ তো একরকম পশুরই সামিল ছিল। বনে বনে ঘুরে বেড়াতো, কাঁচা ও অর্ধদগ্ধ মাংস খেতো, লিখতে পড়তে জানতো না, এমনকি মুখের ভাষাও ছিল না পরিণত। তাহলে এত আগেকার কথা—সেই কোটি কোটি বছর আগের দিনগুলোর কথা কেমন করে জানবে মানুষ!

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, সেই আদি কাল থেকে—পৃথিবীর একেবারে জন্মলগ্ন থেকে—আজও পর্যন্ত অনন্তকাল একই ছন্দে, একই গতিতে নিজ অক্ষের উপর পাক খেতে খেতে পিতৃদেব সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে সুবোধ এক বালিকার মত। কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন নি, কেউ ভাবনা চিন্তা করার প্রয়োজন অনুভব করেন নি, কেউ বিজ্ঞান-সম্মতভাবে পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলোর দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকাবার চেষ্টাও করেন নি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন কয়েকজন ধুরন্ধর বিজ্ঞানী। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন স্যার এডমণ্ড হ্যালি। ইনি সেই হ্যালি—যিনি ধূমকেতু সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করে মানুষের কুসংস্কারকে দূর করেছিলেন এবং

এঁর আবিষ্কৃত একটি ধূমকেতু আজও হ্যালির ধূমকেতু নামে পরিচিত। একাধারে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ—যিনি নিউটনের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন এবং নিউটন যাঁর সাহায্য গ্রহণ করে কালজয়ী গ্রন্থ প্রিন্সিপিয়া প্রকাশ করেছিলেন।

প্রায় সারাটা জীবন ধরে হ্যালি আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রদের নিয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। একবার কী খেয়াল চাপলো তাঁর, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের প্রচলিত সূত্রগুলোকে খতিয়ে দেখতে শুরু করলেন। কেলেডীয় বিজ্ঞানীরা গ্রহণের যে সূত্র নির্দেশ করেছিলেন—সেগুলোর গাণিতিক নিয়ম দেখলেন, নিজেও অঙ্ক কষলেন। অপরদিকে বর্তমানে গ্রহণের কাল এবং সময়ও পরীক্ষা করলেন। দেখলেন, পূর্বের সঙ্গে বর্তমানের সময়ের সামান্য হলেও অসঙ্গতি রয়েছে। কিন্তু কেন? গণনায় তো অসঙ্গতি হওয়ার কথা নয়! অঙ্কের সমাধান সর্বক্ষেত্রে একই হওয়ার কথা!

অনেক ভাবলেন, অনেক চিন্তা করলেন হ্যালি। শেষে সিদ্ধান্তে এলেন, গাণিতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে—যদি ধরে নেওয়া যায় অতীতে পৃথিবীর আবর্তন বেগটা বেশী ছিল। ঐ সূত্র থেকে তিনি উল্লেখ করলেন, পৃথিবীর আবর্তন বেগটা অতীতে বেশী ছিল, একটু একটু করে কমতে কমতে বর্তমানে সে ২৪ ঘন্টায় একবার করে পাক খাচ্ছে।

কিন্তু কেন? অতীতে আবর্তন বেগ বেশী ছিল, সেই বেগ কমতে শুরু করলো কেমন করে? তার প্রমাণ-ই বা কোথায়?

হ্যালি পারলেন না কারণ ব্যাখ্যা করতে, কোন নজির তুলে ধরতে পারলেন না। আর পারলেন না তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও। তবে সমস্যাটিকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হলো বিজ্ঞানীমহলে।

এই ঘটনার পর থেকে প্রায় আশিটি বছর কেটে গেল। অবশেষে হ্যালির সমস্যাটিকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করলেন এক দার্শনিক। নাম তাঁর ইমানুয়াল কান্ট—সর্বকালের সেরা দার্শনিকদের একজন। গণিতজ্ঞও ছিলেন তিনি এবং বিজ্ঞান নিয়েও যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করতেন। পৃথিবীর জন্ম রহস্য, পৃথিবীর বয়স, পৃথিবীর আবর্তন বেগ, ইত্যাদি অনেক বিষয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রদান করেছিলেন। যদিও তাঁর মতবাদের অধিকাংশকে বিজ্ঞান বাতিল করে দিয়েছে, তবু দীর্ঘকাল তাঁর মতকে বিজ্ঞানীরা বেদবাক্যের মত গ্রহণ করে এসেছিলেন। সেই কান্টই উল্লেখ করেছিলেন, পৃথিবীর আবর্তন বেগ মন্থর হওয়ার মূলে পৃথিবীর উপরিস্থ বিশাল জলভাগ। পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ পৃথিবীর কাছাকাছি অবস্থান করছে। মূলত তারই আকর্ষণে পৃথিবীর জলভাগে প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে জোয়ার ভাটা হয়ে থাকে। তাতে পৃথিবীর জলভাগে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, সেই আলোড়ন বাধা দেয় পৃথিবীর স্বচ্ছন্দ আবর্তনকে। পরিমাণটা নিতান্তই কম। প্রতি পঞ্চাশ হাজার বছরে মাত্র এক সেকেণ্ডের মত।

কাল যেখানে বিপুলা সেখানে পঞ্চাশ হাজার বছরে একটি সেকেণ্ড—সে কী কম? এক লাখ বছরে দু সেকেণ্ড, এককোটি বছরে ২০০ সেকেণ্ড বা ৩⅓ মিনিট। ১৮ কোটি বছরে হবে পুরো এক ঘণ্টা। অথাৎ হিসেব অনুযায়ী আজ থেকে ১৮ কোটি বছর আগে পৃথিবীর আবর্তন বেগ ছিল ২৪ − ১ = ২৩ ঘণ্টায় একবার। আরও বলতে হয় যে, ১৮ কোটি বছর আগে পৃথিবীর এক দিন ও এক রাতের পরিমাণ ছিল ২৩ ঘণ্টা। ৩৬ কোটি বছর আগে ২২ ঘণ্টা, ৫৪ কোটি বছর আগে ২১ ঘণ্টা, ইত্যাদি। তেমনই ১৮ কোটি বছর পরে পৃথিবীর আবর্তন বেগ হবে ২৫ ঘণ্টায় একবার।

এই তো গেল তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে, তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তকে সত্য প্রতিপন্ন করতে হলে বাস্তব পরীক্ষার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষার আয়োজন কেমন করে করা যাবে?

চিন্তিত হলেন বিজ্ঞানীরা। যত্নবান হলেন পৃথিবীর বুকে তেমন কোন নিদর্শন খুঁজতে। তাঁদের জানা ছিল, বহুবর্ষজীবী গাছ তার বয়সের ছাপ আপন দেহের অভ্যন্তরে রেখে যায়। আশ্চর্য এক প্রাকৃতিক ঘটনা যেন। বছর বছর গাছ তার গুঁড়িতে রেখে যায় এক একটি বলয়। গাছের বার্ষিক বলয় বলা হয় তাকে। বলয়গুলো আবার একই ধরনের নয়। অতিবৃষ্টির বছর যে ধরনের বলয় রচনা করে, অনাবৃষ্টির বছর রচিত বলয়ের আকার ভিন্ন। তাই বলয় পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা অতীতের আবহাওয়ার খবর জ্ঞাত হয়ে থাকেন। ঠিক এই ধরনের অতীতের কোন নিদর্শন কী পৃথিবীর বুকে নেই?

বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, এতকাল আগেকার ঘটনা গাছের গুঁড়িতে পাওয়া সম্ভব নয়। কেন না, আজকের উদ্ভিদজগতের আবির্ভাব হয়েছিল বড় জোর সাত কোটি বছর আগে। আর এমন পরমায়ু কোন গাছের নেই। অপরদিকে আরও-আরও পূর্বের—অন্তত ৫০ কোটি বছর আগের নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু কী সে নমুনা?

একমাত্র নমুনা হতে পারে, আজ থেকে পঞ্চাশ কোটি বছর আগে যারা আবির্ভূত হয়েছিল—তাদের জীবাশ্ম। সেই জীবাশ্মের ভেতর দিয়ে হয়ত অতীতের ইতিহাসটা পৃথিবী নিজেই মুদ্রিত করে গেছে।

কে বা কারা এসেছিল এতকাল আগে? এসেছিল খোলকধারী প্রাণীরা—যারা নিজ দেহের চারদিকে গড়ে তুলতো চুনাপাথরের আস্তরণ বা খোলক। এসেছিল সামুদ্রিক প্রবাল, এসেছিল সামুদ্রিক শঙ্খ ও গুগলি—নানা জাতের নানা মাপের।

বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি প্রথমে ঐ প্রবালের উপর পতিত হলো। এরা কবে—সেই সুদূর অতীতে—আজ থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন কোটি বছর আগে আদিম জলমগ্ন পৃথিবীর বুকে এসেছিল। এখনও আসে। তবে অতীতে এরা

আসতো প্রচুর পরিমাণে। অকল্পনীয় ছিল তাদের সংখ্যা। সারা সাগরকে একেবারে ছেয়ে ফেলেছিল, সহস্র সহস্র কোটি একত্রে এক একটা কলোনি বানিয়েছিল এবং অগভীর সাগর তলায় স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকতো দিনের পর দিন বছরের পর বছর।

এতকাল ধরে বেঁচে নেই ওদের কেউ। তবে বংশধারা টিকে আছে, আর টিকে আছে—সেদিন যারা এসেছিল তাদের কেবল খোলকটাই। শক্ত পাথর বলে নষ্ট হয়ে যায়নি, টিকে আছে জীবাশ্মের আকারে। এত জীবাশ্ম অপর কোন জীবের নেই। সেগুলো জমা হতে হতে কোথাও গড়ে উঠেছে প্রবাল দ্বীপ, কোথাও বিস্তীর্ণ প্রবাল প্রাচীর।

প্রবাল কীটরা ভারি মজার প্রাণী। ছোট্ট কীট। দেহের খোলকটা চুন জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি। ওরা নিয়মিতভাবে সারাটা জীবন খোলক তৈরি করে যায়। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর—গাছরা যেমন নিজের গুঁড়িতে রচনা করে চলে বলয়। তাই তাদের গায়ে থাকে ডোরা ডোরা দাগ। সে ডোরা বছরে একটি এবং যত বছর বেঁচে থাকে গায়ে ঠিক ততটি ডোরা থাকে। অর্থাৎ ডোরাগুলো একত্রে তাদের বয়সের মাপকাঠি।

বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, ডোরাগুলো যতখানি চওড়া ঠিক ততটা কোন একটি বিশেষ সময়ে গড়ে উঠতে পারে না। তারজন্য লেগেছে পুরো একটি বছর। প্রতিদিন একটু একটু করে গড়েছে, তারপর এক বছরে সম্পূর্ণ করেছে ডোরাটা। এক একটি ডোরাকে ভালভাবে পরীক্ষা করলে নিশ্চয়ই সে সময়ের বার্ষিক দিন সংখ্যা নির্ধারণ করা যাবে।

বিজ্ঞানীরা এবার ঐ ডোরাগুলোকে পরীক্ষা করতে যত্নবান হলেন। ৩৬ কোটি বছর আগে গঠিত পৃথিবীর পাললিক শিলাস্তর থেকে গ্রহণ করলেন প্রবালের জীবাশ্ম। তারপর শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখে অবাক হলেন। এ-কী? চারশ'টি অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বলয়ের সমাবেশে গড়ে উঠেছে এক একটি বার্ষিক বলয়।

এবার আজকের দিনের প্রবালকে নিয়ে শুরু করলেন পর্যবেক্ষণ। না, যা ভেবেছেন—তাই। এদের বার্ষিক বলয়ের ভেতরে গড়ে ৩৬৫¼ টি বলয়। যা আজকের বছরের দিনসংখ্যা।

এবার বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত প্রমাণ পেলেন, আজ থেকে ৩৬ কোটি বছর আগে পৃথিবীর বছর হতো ৪০০ দিনে। পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমার পথ ছোট হয়ে আসেনি অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যের কাছে সরে আসেনি। সেদিন যে বেগে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরতো এবং যেটুকু সময় ব্যয় করতো আজও তাই আছে। অন্য সূত্র থেকে প্রমাণও করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাই এক্ষেত্রে হের ফের হওয়ার মূলে একটিমাত্র কারণ, পৃথিবীর আবর্তন বেগ আগে বেশী ছিল।

আবর্তন বেগ বেশী হওয়ায় কী হয়েছিল? পৃথিবী কম সময়ে নিজ

অক্ষের উপর পাক খেতো। আজ যে সময় লাগছে তার চেয়ে কম সময়ে একটা আবর্তন পূর্ণ করতো।

এবার হিসেব করার পালা। ২৪ ঘণ্টায় একবার করে আবর্তন ধরলে ৩৬৫¼ দিনে তথা ৮৭৬৩ ঘণ্টায় পৃথিবী সূর্য প্রদক্ষিণ করে আসছে। সেদিনও সময় লাগতো ঐ ৮৭৬৩ ঘণ্টা। কেন না সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব একই আছে। তাই সংখ্যাটিকে ৪০০ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল ২২ এর কাছাকাছি হয়। তার মানে ৩৬ কোটি বছর আগে পৃথিবীর আবর্তন বেগ তথা দিন-রাতের পরিমাণ ছিল কিছু কম ২২ ঘণ্টা।

চাঁদ ছুটছে দূর আকাশে

পৃথিবীর যত মা, সবাই ডাকেন—আয় আয় চাঁদ মামা। দুষ্টু খোকারা মায়ের সুরে সুর মিলিয়ে ডাকে আয় চাঁদ-আয় না। মা আর খোকাদের বায়না শুনতে শুনতে চাঁদ যেন ঝালাপালা। পালিয়ে যেতে চাইছে দূরে—দূরে—আরও দূরে।

হ্যাঁ, চাঁদ পালাচ্ছে। একটু একটু করে পা বাড়াচ্ছে মহাকাশের পানে। দুষ্টু খোকারা যেমন মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঘরের বাহিরে পা বাড়ায়, মায়ের বাঁধন ছিড়ে উধাও হয়ে যেতে চায়, পৃথিবীর জনারণ্যে হারিয়ে যেতে চায়, ঠিক তেমনই চাঁদও পৃথিবীকে ফাঁকি দিয়ে অনন্ত মহাশূন্যে হারিয়ে যেতে চায়।

বিশ্বাস হচ্ছে না ? হবেই বা কেমন করে ? আমরা যে সারাটা জীবন চাঁদকে একই রকমের দেখছি। আমাদের বাবা-মা দেখেছেন, দাদু-দিদারা দেখেছেন, পুরুষ পুরুষ ধরে সবাই দেখছেন চাঁদ যেন পৃথিবী থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে রয়েছে। তার আকারের কোন হেরফের হচ্ছে না।

না, চাঁদের আকারের পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু এত কম যে, হাজার পুরুষেও ধরা যায় না। তবু বিজ্ঞানীরা বলেছেন, চাঁদ দূরে সরে যাচ্ছে—একটু একটু করে। তাঁদের মতে, এককালে চাঁদ পৃথিবীর অনেক কাছে ছিল, পৃথিবী থেকে তাকে দেখাতো মস্ত বড় এক রূপার থালার মত। আলোও তখন ছিল জোরালো—থৈ থৈ বন্যা।

কিন্তু সে কবে ? কোন্ সুদূর অতীতে ?

না, তেমন বড় ও সুন্দর চাঁদকে মানুষের কোন খোকাই দেখেনি। দেখেছিল আরশোলাদের খোকারা, ডাইনোসোরদের খোকারাও কিছুটা দেখেছিল।

আর সাগর জলে মস্ত বড় এক ঝুড়ির মত প্রতিবিম্বটাকে দেখেছিল আদিম অস্ট্রাকোডার্মি মাছরা।

ডাইনোসোর, অস্ট্রাকোডার্মিরা হারিয়ে গেছে কোন্ কালে। জীবন্ত জীবাশ্ম আরশোলাদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহেরও কোন উপায় নেই। তাহলে আজকের মানুষ জানলো কেমন করে?

হ্যাঁ, এক্ষেত্রেও সেই সন্দেহ, অনুমান, পরে আবিষ্কার। সন্দেহটা প্রথম প্রকাশ করেছিলেন সেই হ্যালিই। এবং তাঁর সন্দেহ হয়েছিল চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে প্রাচীন গণনাকে মেলাতে গিয়ে।

প্রবালের খোলক পরীক্ষা করে পৃথিবীর ফেলে আসা দিনগুলোর যখন হদিস পাওয়া গেল, তখন এই সত্যটিও উদ্ঘাটন এবং যাচাই করার জন্য শুরু হলো তোড়জোড়—খোঁজ-খবর। বিজ্ঞানীরা খোঁজ-খবর শুরু করলেন প্রবালের মত কোন খোলকধারী জীব অতীতের চান্দ্রমাসকে নিজ খোলকের ভেতরে ধরে রেখেছে কিনা!

বহু খোঁজ-খবরের পর এই বিংশ শতাব্দীতেই পাওয়া গেল একটি নমুনা-নাম তার নটিলাস।

নটিলাসদের আগমন হয়েছিল আদিম সাগর বক্ষে ঐ প্রবালদের আগমনের কিছু পরে পরেই। কম করে চল্লিশ কোটি বছর আগে তো বটেই। সামুদ্রিক খোলকধারী জীব—স্কুইড অক্টোপাসদের নিকটতম জ্ঞাতি—শঙ্খ-শামুকদের পর্বভুক্ত।

এককালে সাগর বক্ষে ওদের বহু প্রজাতি এসেছিল। অনেকে হারিয়ে গেছে। টিকে আছে কয়েকটি প্রজাতি। যারা হারিয়ে গেছে, আর যারা আজও তাদের বংশধারাকে টিকিয়ে রেখেছে তাদের সবার জীবাশ্ম পাওয়া গেছে পাললিক শিলাস্তরে। কী ভেবে ঐ নটিলাসের উপর পরীক্ষা চালাতে সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন বিজ্ঞানীরা।

হাতের কাছে আনা হলো, চল্লিশ কোটি বছর আগেকার নটিলাসের জীবাশ্ম আর আজকের জীবন্ত নটিলাস। নটিলাসদের খোলকের অভ্যন্তরে থাকে ছোট্ট ছোট্ট, কুঠুরির মত। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হলো, ঐ কুঠুরিগুলো ওরা বানায় এবং বানায় প্রতিমাসে একটি একটি করে। দুই কুঠুরির ব্যবধান কতকগুলো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ডোরা বা রেখা। সেই প্রবালদের বলয়ের মত কিংবা গাছের বার্ষিক বলয়ের মত প্রতিদিনে অল্পে অল্পে গড়ে ওঠে। তারপরে একমাসে সম্পন্ন হয় একটি কুঠুরি।

আজকের নটিলাসের কুঠুরিকে নিয়ে পরীক্ষা করতে দেখা গেল, দুই কুঠুরির মধ্যে রেখার সংখ্যা কোনটিতে ২৯, আবার কোনটিতে ৩০। গড়ে ২৯.৫-যা আজকের এক একটি চান্দ্রমাসের দিন সংখ্যা। অর্থাৎ পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে বর্তমানে চাঁদের লাগছে ২৯.৫ দিন। ছোট-বড়, কম বয়সের বেশী বয়সের সব নটিলাসেরই রেখার সংখ্যা দেখা গেল ঐ একই অর্থাৎ

গড়ে সেই ২৯.৫ টি।

এবার বিজ্ঞানীরা অতীতে আবির্ভূত নটিলাসদের জীবাশ্ম নিয়ে পরীক্ষা করলেন। এবার সত্যসত্যই অবাক হলেন তাঁরা। আড়াইকোটি বছর আগের নটিলাসদের জীবাশ্মে পাওয়া গেল ২৫টি রেখা। তার আগেরগুলোতে ধীরে ধীরে রেখার সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। অবশেষে ৪০ কোটি বছর আগে আবির্ভূত জীবাশ্মগুলোতে সেই রেখার সংখ্যা মাত্র ৯।

নমুনাগুলো থেকে বিজ্ঞানীরা এবার প্রমাণ করলেন, বর্তমানে চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ২৯.৫ দিনে পরিভ্রমণ সম্পন্ন করলেও অর্থাৎ আজকের চান্দ্রমাস ২৯.৫ দিনে হলেও আড়াই কোটি বছর আগে চাঁদ ২৫ দিনে ভ্রমণ সম্পন্ন করতো। চল্লিশ কোটি বছর আগে চাঁদের ভ্রমণ সম্পন্ন করতে সময় লাগতো মাত্র ৯ দিন।

চাঁদের গতিবেগ যে একই আছে বিজ্ঞানীরা অন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে তার প্রমাণ পেয়েছেন। অর্থাৎ আগে সে যে গতিবেগ নিয়ে অগ্রসর হতো এখনও তার সেই একই বেগ। তাহলে ৪০ কোটি বছর আগে এত কম হওয়ার কারণ কী হতে পারে?

একটাই কারণ, চাঁদ তখন কাছে ছিল—তারপর একটু একটু করে দূরে এগিয়ে যাচ্ছে। আরও পূর্বে সে ছিল আরও কাছাকাছি। কত কাছে ছিল তার নমুনা সংগ্রহ করা যাবে না। তবে অনুমান করতে কোন অসুবিধা নেই যে, এককালে হয়ত চাঁদের মাত্র একদিন লাগতো পৃথিবী পরিক্রমা করতে। সে সময় পৃথিবীর দিনও ছিল অনেক ছোট। অর্থাৎ আজকের তুলনায় তখন পৃথিবীর আবর্তন বেগ বেশী ছিল।

অতএব কাছে থাকার জন্য চাঁদের পৃথিবী পরিক্রমার পথটা ছোট ছিল, যত দূর সরে গেছে ততই পরিক্রমার পথ বেড়েছে। ভবিষ্যতে আরও দূরে চলে যাবে—অতি মন্থরভাবে। আজ থেকে ৩০ লক্ষ বছর পরে চান্দ্রমাসের পরিমাণ হবে ২৯.৫ দিনের স্থলে ৩৩ দিনের মতন তখন পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইল বাড়বে। কারণ, এই সময়কালের মধ্যে পৃথিবীর আবর্তন বেগটাও মন্থর হবে এবং দিনের পরিমাণ বাড়বে।

এই সত্যকে সামনে রেখে একবার পিছনের দিকে মুখ ফেরানো যেতে পারে। সেই কোন সুদূর অতীতে পৃথিবীর জন্মমুহূর্তে চাঁদ কোথায় ছিল? সে কী পৃথিবী থেকে জন্মলাভ করেছে?

না, চাঁদ পৃথিবীর অংশ নয়। যদিও আগে অনেকেরই এমন ধারণা ছিল। আজকে সবাই মনে করেন, পৃথিবী এবং চাঁদ পৃথক পৃথকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এখন প্রশ্ন আসে চাঁদ পৃথিবীর কতটা কাছে ছিল? যদি খুব কাছাকাছি ওর অবস্থান ছিল, তাহলে পৃথিবীর আকর্ষণে ওর তো পৃথিবীর বুকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাওয়ার কথা। তা হয়নি কেন?

না, হুমড়ি খেয়ে পড়ার একটা সর্ত আছে। যদি কোন উপগ্রহ তার

নিজস্ব গ্রহের ব্যাসের ২.৪৫ গুণের বেশী দূরে থাকে তাহলে সে হুমড়ি খেয়ে পড়বে না। পৃথিবীর ব্যাস ৭৯০০ মাইল। হিসেব করে দেখা গেছে, জন্ম সময়ে চাঁদ পৃথিবীর ব্যাসের অন্তত চার গুণেরও বেশী দূরে ছিল। আদিতে ওদের উভয়ের আয়তনটাও বড় ছিল। পরে সঙ্কুচিত হওয়ায় দূরত্ব বেড়েছে।

পার্থিব জীবনের উৎস

কোথায় জীব নেই? জলে, স্থলে, আকাশে, পাহাড় ও মরুভূমির বুকে সর্বত্রই জীবের আবাস। আর কত বিচিত্র ধরনের জীব!

পৃথিবীর এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবজগৎটাকে দেখে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, পৃথিবীর বুকে এত জীব এলো কোথা থেকে? কেনই বা এমন বৈচিত্র্য?

মানুষের এ প্রশ্ন চিরন্তন। আদিতে সে মনে করতো, পৃথিবীর সমূহ জীব ও উদ্ভিদকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। খ্রীস্টান দুনিয়া মনে করতেন, ঈশ্বর মাত্র ৬ দিনের ভেতরেই সমস্ত জীবের এক এক জোড়া-পুরুষ ও স্ত্রী নিজ হাতে গড়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। তারাই বংশবিস্তার করে ভরিয়ে ফেলেছে বিশ্বটাকে। সৃষ্টি থেকে এ পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। ভারতীয় আর্যঋষিরা মনে করতেন, পিতামহ ব্রহ্মার আদেশে কয়েকজন প্রজাপতি মিলে উৎপাদন করেছেন পৃথিবীর বৈচিত্র্যপূর্ণ এই জীব-জগৎটাকে।

দীর্ঘকাল ধরে মানুষ বিশ্বাস করে এসেছিল এইসব কথা—গালগল্প। এক কথায় জীব সৃষ্টির ব্যাপারটা ঈশ্বরের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। যেহেতু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান—তাঁর অসাধ্য কিছু নেই। এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, জীব ও জৈব পদার্থ প্রকৃতির অবদান। জীবতো দূরের কথা, কোন জৈব পদার্থকেও মানুষ তৈরি করতে পারে না। উক্ত ধারণাকে প্রথম ওলোট পালট করেছিলেন বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াসের এক তরুণ ছাত্র উইলার। সম্পূর্ণ অজৈব পদার্থ থেকে ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে তৈরি করেছিলেন ইউরিয়া—বার্জেলিয়াসেরই ভাষায় যার মৌল উপাদান প্রাণশক্তি। এই প্রথম দোটানায় পড়ে গেলেন বিজ্ঞানীরা। উৎসাহিত কিছু কিছু বিজ্ঞানী আরও বহু জৈব পদার্থ যখন তৈরি করলেন, তখনই জীব সৃষ্টির ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু হলো। জীবদেহের উপাদানগুলোকে নিয়েও শুরু হলো পরীক্ষা নিরীক্ষা।

একদিন লুইপাস্তুর প্রমাণ করলেন, জীব স্বয়ম্ভূ নয়। তাদের প্রত্যেকেরই পূর্বপুরুষ আছে। মহাত্মা ডারউইন প্রচার করলেন তাঁর বিবর্তনবাদ। একটু একটু করে সন্দেহ ঘনীভূত হলো। ঈশ্বরকে ছেড়ে জীবনের উৎস সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন বিজ্ঞানীরা। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কেউ কেউ উল্লেখ করলেন, পৃথিবীর বুকে জড়পদার্থগুলো যেমন অনাদি-অনন্তকাল ধরে বিরাজ করছে, তেমনই জীবনও।

কিন্তু জীবনটা এসেছিল কোথা থেকে? অনেকেই বললেন, জীবনের উৎস অন্য কোন গ্রহ। বীজের আকারে প্রাণশক্তি ভেসে ভেসে এসেছিল শূন্য পথে। তারপর তাদের কিছু কিছু প্রবেশ করেছিল পৃথিবীর আবহমণ্ডলে। সেই প্রাণশক্তির বীজ থেকে পৃথিবীতে কালক্রমে সৃষ্টি হয়েছে জীব। অতঃপর বিবর্তনের ধারায় কোটি কোটি বছরের অধ্যবসায়ে আজকের এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবজগৎ।

জীবের বিবর্তনের ধারাকে ততদিনে মেনে নিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। অতি ক্ষুদ্র এককোষী থেকে বহুকোষী, অমেরুদণ্ডী থেকে মেরুদণ্ডী, জলচর থেকে উভচর ও পরে স্থলচর, অণ্ডজ থেকে স্তন্যপায়ী ঠিক এইভাবে জীবের হয়েছে উত্তরণ। কিন্তু জীবনের বীজ কী সত্যসত্যই ছুটে এসেছিল মহাকাশ থেকে? কেউ সন্তুষ্ট হলেন, কেউ হতে পারলেন না।

১৯১০ খ্রীস্টাব্দ। পৃথিবীর আবহমণ্ডলকে নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এক নতুন তথ্য প্রদান করলেন। তাঁরা জানালেন, সূর্য থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে মারাত্মক সব রশ্মি। বিশেষ করে আলট্রাভায়োলেট রশ্মির সংঘাতে কোন প্রাণ টিকে থাকতে পারে না। পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উপরের স্তরে ওজোন নামক গ্যাসটির স্তর বিদ্যমান। এই স্তরটা যেন ছাতার মত ঘিরে রেখেছে পৃথিবীকে। সেই ছাতাকে ভেদ করে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি পৃথিবীপৃষ্ঠে অবতরণ করতে পারে না বলেই সম্ভব হয়েছে পৃথিবীতে জীবন। তাঁরা আরও জানালেন, আদিতে পৃথিবীর উপরিভাগে ওজোনের স্তর আদৌ ছিল না। তখন সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিগুলো সরাসরি নেমে আসতো। অনেক পরে ওজোন এসেছে এবং স্তর গঠন করেছে।

এই গবেষণা গ্রহান্তরের প্রাণশক্তির বীজ থেকে পৃথিবীতে জীবনের যাত্রা— মতবাদটি অসার প্রতিপন্ন করলো। তখনই অনেকে ভাবতে শুরু করলেন সূর্য যেহেতু পৃথিবীর সব শক্তির মূল উৎস, অতএব জীবনের মূলেও সৌরশক্তি থাকা সম্ভব।

এবার শুরু হলো অতীত পৃথিবীর আবহমণ্ডলকে নিয়ে গবেষণা। কিন্তু গবেষকরা একমত হতে পারলেন না। একদল বললেন, পৃথিবীর আদিম আবহমণ্ডলের উপাদান ছিল মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন এবং জলীয় বাষ্প; অপর দল বললেন, সেদিনের আবহমণ্ডলের মূল উপাদান ছিল নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং কার্বন

মনোক্সাইড। তবে দু-দলের সবাই স্বীকার করলেন, সেদিনের আবহমণ্ডলে অক্সিজেন আদৌ ছিল না।

গবেষকদের মধ্যে একজন ছিলেন কেলভিন মিলার। তিনি ছিলেন প্রথম মতের সমর্থক। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি একটা বাস্তব পরীক্ষার পরিকল্পনা করলেন। একটা বড় কাচের পাত্রে আদিম পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উপাদান মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন ও জলীয় বাষ্পের মিশ্রণ (ঐ মতেরই সমর্থক ছিলেন মিলার) নিলেন। আদিম পৃথিবীর উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পাত্রটিকে উত্তপ্ত করলেন। তারপর ঘটালেন বিদ্যুতের স্ফুরণ। যেমনটি আদিম পৃথিবীর আবহমণ্ডলে সৌর বিকিরণ হয়েছিল।

ঠিক এই অবস্থায় প্রায় এক সপ্তাহকাল রেখেছিলেন কাচের পাত্রটিকে। সপ্তাহ পরে পাত্রের উপাদানকে নিয়ে পরীক্ষা করলেন। দেখলেন, তিন ধরনের অ্যামিনোঅ্যাসিডের আবির্ভাব ঘটেছে। অ্যামিনোঅ্যাসিডগুলো যথাক্রমে গ্লাইসিন, অ্যালানাইন ও অ্যাডেনাইন।

বিজ্ঞানীরা জানতেন, জীবনের মূলে রয়েছে কয়েক ধরনের অ্যামিনো-অ্যাসিড। মোট কুড়িটির অধিক অ্যামিনোঅ্যাসিডের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে জীবনের পক্ষে অপরিহার্য মাত্র ৬টি অ্যামিনোঅ্যাসিড। সেগুলো যথাক্রমে গ্লাইসিন, অ্যালানাইন, থিয়োনাইন, গ্লুটামিক অ্যাসিড, অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড ও সেরিন। মিলার যখন তিনটি অ্যামিনোঅ্যাসিড লাভ করলেন, তখন ভাবলেন সন্দেহের নিরসন ঘটলো। অর্থাৎ পৃথিবীর আদিম আবহ-মণ্ডলে অ্যামোনিয়া, মিথেন ও হাইড্রোজেনের প্রাধান্য ছিল এবং পৃথিবীর প্রাণশক্তির বীজ সংশ্লেষণী পদ্ধতিতে পৃথিবীর আবহমণ্ডলেই নিহিত হয়েছিল।

অপর মতের যাঁরা সমর্থক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বিজ্ঞানী আবেলসন। তিনি শুরু করলেন কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন, হাইড্রো-জেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডকে নিয়ে পরীক্ষা। ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে প্রমাণ করলেন কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন থেকে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড এবং ফরম্যালডিহাইড প্রস্তুত করা যায়। আরও দেখালেন, হাই-ড্রোসায়ানিক অ্যাসিডকে যদি আলট্রাভায়োলেট রশ্মির দ্বারা সংঘাত সৃষ্টি করা যায় তাহলে ষোল রকমের অ্যামিনোঅ্যাসিড তৈরি হয়। অপরদিকে প্রমাণ করলেন ফরম্যালডিহাইডকে উত্তপ্ত করলে শর্করা পাওয়া যায় এবং হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড ও জলীয় বাষ্প থেকে পাওয়া যায় পলিপেপটিক যৌগ। মিলার অপেক্ষা জোরালো হলো আবেলসনের পরীক্ষা। দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দুজনের পরীক্ষাই প্রমাণ করলো, আদিম আবহমণ্ডলেই প্রথম প্রাণশক্তির বীজ নিহিত হয়েছিল। উৎপন্ন পদার্থগুলো—যা আবহমণ্ডলে সংশ্লেষিত হয়েছিল—তা জীবন নয়। জীবনের সম্ভাবনা—ভবিষ্যৎ জীবনের উপাদান—কতকগুলো জৈব যৌগমাত্র।

আবহমণ্ডলে জৈব যৌগগুলো যেমন উৎপন্ন হচ্ছিল, তেমনই তাদের মধ্যে একটা বিবর্তনও চলেছিল। হ্যাঁ, বিবর্তন। যেমনটি জীবের ক্ষেত্রে হয়েছে, তেমনটি ঐ যৌগগুলোর ক্ষেত্রেও হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা বলেছেন রাসায়নিক বিবর্তন বা কেমিক্যাল ইভোল্যুসন এবং এই বিবর্তন চলেছিল কোটি কোটি বছর ধরে।

আবহমণ্ডলে সংশ্লেষিত সেইসব জৈবকণা—অ্যামিনোঅ্যাসিড, শর্করা, রাসায়নিক বিবর্তনের মাধ্যমে অ্যামিনোঅ্যাসিডের শৃঙ্খল বা পলিপেপটিক শৃঙ্খল, ইত্যাদি আকাশেই ছিল। পরে পৃথিবীর উত্তপ্ত পরিবেশটা শীতল হলে আবহমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করলো। একদিন শুভক্ষণে সেই মেঘ থেকে ঝর ঝর করে ঝরলো বারি। সে কী বর্ষণ! এক-নাগাড়ে কম করে ষাট হাজার বছর ধরে ঝরেছিল। পৃথিবী আত্মগোপন করেছিল জলের তলায়। সেই বৃষ্টি ধারার সঙ্গে নেমে এসেছিল আকাশে সংশ্লেষিত জৈব কণাসমূহ। অধিকাংশ আশ্রয়গ্রহণ করেছিল সমুদ্রের তলদেশে। পরিমাণে কম ছিল না। আদিম সমুদ্রের একশ ভাগের একভাগ পূর্ণ হয়েছিল এদের দ্বারা। নষ্ট হওয়ারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। কালক্রমে কোন এক জৈব রাসায়নিক ক্রিয়ায় যৌগগুলো থেকে উদ্ভব হয় প্রাণপঙ্ক—বিজ্ঞানীদের ভাষায় অরগ্যানিক সূপ। সেই প্রাণপঙ্কে একদিন পঙ্কজের মত ফুটে উঠেছিল একটিমাত্র কোষ দিয়ে গড়া জীবন।

ব্যাপারটা আজও জিজ্ঞাসার বিষয় হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও অনেকে নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন এবং কিছু কিছু আভাসও প্রদান করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানী ফক্স ও বিজ্ঞানী ইয়ং-এর গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। তবে তার আগে জীবদেহ ও জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে দু-এক কথা বলতে হয়।

পার্থিব জীবদেহের মূল উপাদানগুলোর মধ্যে প্রধাণ কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। ঐ চারটে মৌলিক উপাদান ছাড়া স্বল্প পরিমাণে থাকে ফসফরাস, সালফার কিংবা পটাসিয়াম। এগুলো বিভিন্ন সংখ্যায় যুক্ত হয়ে জটিল অণুর আকারে জীবদেহের কাঠামো তৈরি করে। কেবলমাত্র কাঠামো থাকলে জীবন হয় না। তার জন্য দরকার শক্তির উৎস এবং সেই শক্তির উৎসের প্রভাবে সে বড় হবে, আর নিজের মত করে অপত্য গড়ে তুলবে।

দেহের কাঠামো হচ্ছে প্রোটিন, শক্তির উৎস হচ্ছে শর্করা এবং বংশধারার নিয়ামক হচ্ছে জীন। প্রোটিন হচ্ছে অ্যামিনোঅ্যাসিড দিয়ে গঠিত পলিমার বা বহু যৌগ। অর্থাৎ অনেকগুলো অ্যামিনোঅ্যাসিড রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গঠন করে প্রোটিন। আদিম আবহমণ্ডলে সংশ্লেষণী পদ্ধতিতে উৎপন্ন অ্যামিনোঅ্যাসিড থেকে প্রোটিন তৈরি হওয়া অসম্ভব নয়। উৎপন্ন শর্করা, জৈব ফসফেট এবং সৌরশক্তি—শক্তির যোগান

দিয়েছিল বলে বিশ্বাস। আর বংশধারার নিয়ামক জীনের দায়িত্ব পালন করেছিল প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড।

উপরোক্ত যুক্তিগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক বিজ্ঞানী বাস্তব পরীক্ষারও সাহায্য গ্রহণ করেছেন। ফক্স, পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন, অনার্দ্র অ্যামিনোঅ্যাসিডকে উত্তপ্ত করলে প্রোটিনয়েড পাওয়া যায়। প্রোটিনয়েড প্রোটিন না হলেও প্রোটিনের মতই এবং এর মধ্যে প্রোটিনের অনেকগুলো গুণ বিদ্যমান থাকে। ঐ প্রোটিনয়েডকে পর্যায়ক্রমে উত্তপ্ত ও শীতল করে জলে নিক্ষেপ করলে এক ধরনের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলক তৈরি করে। হলডেন ও পারিন প্রভৃতি বিজ্ঞানী ফক্স এর পরীক্ষাকে সমর্থন করেন এবং তাঁরাও লক্ষ্য করেন, কোন কোন অবদ্রব জটিল অণু উৎপাদনের মাধ্যমে তৈরি করে ফাঁপা গোলক। আরও আশ্চর্য, ঐ ফাঁপা গোলকের মাঝখানে থাকে পর্দা—অনেকটা জীবকোষের নিউক্লিয়াসের চারদিকে পর্দাটার মত।

বিজ্ঞানী ইয়ং তাঁর পরীক্ষাটিকে আরও এক ধাপ উপরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি পরীক্ষাগারে আদিম পৃথিবীর আবহমণ্ডল সৃষ্টি করে লাভ করেছেন ঠিক সেই ধরনের অতি ক্ষুদ্র গোলক। তিনি আরও দেখিয়েছেন, অনুরূপ উপায়ে প্রাপ্ত গোলকগুলির প্রত্যেকটির নিউক্লিয় পর্দার মত পর্দা আছে এবং জীবকোষের অনেকগুলো গুণ লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। এতে শক্তির যোগান দেওয়ার মত কোন চর্বির আস্তরণ ছিল না। তবে জৈব ফসফেট—বিশেষ করে অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেটকে বিভাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিভাজনের ফলেই শক্তির উদ্ভব হয়। আর ঠিক এই উপায়ে একটি পুরোপুরি জীবকোষ না হলেও প্রায় জীবকোষের মত জিনিস লাভ করা গেছে।

কোষের মত জিনিস অথচ ঠিক কোষ নয়—এমন অবস্থা থেকে পুরোপুরি গুণবিশিষ্ট পূর্ণ একটা জীবকোষ কেমন করে যে গড়ে উঠেছিল তা এখনও সঠিকভাবে বলার কোন উপায় নেই। কোষের অনুরূপ বলা হচ্ছে এই কারণে, ওতে কোন নিউক্লিক অ্যাসিড নেই। অথচ জীবকোষ তার অনুরূপ আর একটি কোষ গঠন করতে গেলে নিউক্লিক অ্যাসিডের দরকার হয়। নিউক্লিক অ্যাসিড এনজাইম ধর্মী এবং অনুঘটকের কাজ করে।

কেউ কেউ মনে করেন প্রাথমিক পর্যায়ে সাগর তলায় সিলিকেটগুলোই অনুঘটকের কাজ করেছিল। পরের দিকে তার আর দরকার হয়নি।

যাই হোক না কেন, জীবনের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে এখনও বিজ্ঞানীরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যেই আছেন। প্রায় কোষ তাঁরা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন বটে, কিন্তু পুরোপুরি একটি কোষ গঠন করতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও তাঁরা স্থির করেছেন, জীবনের বীজ প্রথম পৃথিবীর আবহমণ্ডলেই সংশ্লেষিত হয়েছিল। তার পরের ঘটনা অতীব জটিল ক্রিয়াকাণ্ড এখনও আলো-আঁধারের মধ্যে দোল খাচ্ছে।

টাপুর টুপুর বৃষ্টি

ভ্যাপসা গরমের পর একপশলা রিমঝিম বৃষ্টি কতই না মধুর, কতই না মিষ্টি। অবিশ্রান্ত ও অতি বর্ষণ হলে বর্ষা জীব ও উদ্ভিদজগতে নতুন প্রাণস্পন্দন জাগায়, একটা রোমাঞ্চও। তাইতো বর্ষাকে ঘিরে কত গল্প, কত কবিতা, কত গান।

গল্প, কবিতা ও গানের কথা থাক। যে বৃষ্টি এত মনোগ্রাহী, মনোজগতে যার এমন সুচিরস্থায়ী অবদান, সেই বৃষ্টিও এক মননের বিষয়। কবি, সাহিত্যিক ও ভাবুকের কাছে বর্ষা সৌন্দর্যের পসরা পেতে ধরে, কৃষকদের কাছে বয়ে আনে আগামীদিনের প্রত্যয়, আর বিজ্ঞানীদের কাছে নিয়ে আসে জিজ্ঞাসা—আকাশে কেমন করে মেঘ জমে আর সেই মেঘ থেকে কেমন করে বারি ঝরে?

জিজ্ঞাসাটা আজকের নয়, অনেককালের। কিন্তু সমাধান হয়েছে বিংশ-শতাব্দীতে। তবু সবটুকু যে সমাধান হয়েছে এমন নয়। কেন না সব রহস্যের সমাধান হলে মানুষ কৃত্রিমভাবে মেঘকে ডেকে আনতে পারতো, ইচ্ছেমত বর্ষা ঝরাতে পারতো, অতি বর্ষণেরও মোকাবিলা করতে পারতো। যদিও বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে বৃষ্টিপাত ঘটিয়েছেন, তবু পুরোপুরি সফলকাম নন। এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার স্তরে আছে।

বৃষ্টির পূর্ববর্তী পর্যায় মেঘ। মেঘ সৃষ্টির মূলে আছে জলীয়বাষ্প। বাতাসে সবসময় অবশ্য কিছু না কিছু জলীয়বাষ্প থাকে। যখনই যথেষ্ট পরিমাণ জলীয়বাষ্প বাতাসে প্রবেশ করে, তখনই বাতাসে ভাসমান বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাকে অবলম্বন করে সেই জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয় এবং ঘনীভূত জলকণাগুলো মেঘের রূপ নেয়।

বর্ষাকালেই বেশী করে মেঘের সঞ্চার হয় এবং সেই মেঘ থেকে যখন তখন পশলা পশলা বৃষ্টি ঝরে। কখনও বা সারাদিন ও রাত টুপুর টাপুর। কেন এমন হয়?

প্রকৃতপক্ষে বর্ষাকালটা গ্রীষ্মেরই অংশ। মার্চ মাসে দিবা রাত্রি সমান সমান হওয়ার পর থেকে দিবাভাগ একটু একটু করে বাড়তে থাকে আর রাত কমতে থাকে। জুনমাসে দিবাভাগ সবচেয়ে বড় হয় এবং রাত হয় ছোট। দিবাভাগে পৃথিবী যে তাপটুকু গ্রহণ করে, রাত ছোট বলে বিকিরণ করা সত্ত্বেও যথেষ্ট তাপ উদ্বৃত্ত থেকে যায়। অপরদিকে প্রখর সূর্যতাপে জলভাগের জল

Acc. no- 16584

দ্রুত বাষ্পীভবনের ফলে বাষ্পের আকারে বাতাসে প্রবেশ করে। তার উপর আছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাব। সাগরের উপরিভাগ থেকে বয়ে আসে প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প। বায়ুর তাপমাত্রা বেশী হওয়ায় তখন বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতাটাও বেড়ে যায়। আর্দ্র বায়ু যেহেতু হালকা, তাই এগুলো উপরে উঠে গিয়ে আয়তনে বেড়ে যায় আর উপরের ভারি বায়ু নিচে নেমে আসে। পরে সেও আর্দ্র হয়ে উপরে উঠে যায়। এই-ভাবে একটা পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয় এবং একটা বিরাট অংশের বায়ু জলীয়বাষ্পে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। আর মেঘের সূচনা হয় তখনই।

কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে, জলীয়বাষ্প পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলেও অনেক সময় বৃষ্টি হয় না। যদি হতো, তাহলে কোন বছরই অনাবৃষ্টি হতো না। কেন হয় না?

এ বিষয়ে প্রথমে আলোকপাত করেন কুলিয়ের এবং এইটসন নামে দুজন বিজ্ঞানী। বাস্তব পরীক্ষার সাহায্যে তাঁরা প্রমাণ করেন, বায়ুতে ধূলিকণা, গ্যাসকণা, নানা ধরনের আয়ন ইত্যাদি আদৌ না থাকলে সম্পৃক্ত জলীয়বাষ্প ঠাণ্ডা হলেও মেঘ সৃষ্টি করে না। মেঘ সৃষ্টির জন্য চাই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকা—যাদের অবলম্বন করে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হতে পারবে।

জলীয়বাষ্প কোনকিছুকে অবলম্বন করে ঘনীভূত হলেই জলকণার সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ঐ জলকণার ব্যাস এত কম যে, তা কিছুতেই পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে নেমে আসতে পারে না। মেঘের আকারেই তখন ভাসতে থাকে। এইসময় এর ব্যাস থাকে মাত্র দশ মাইক্রনের মত। অর্থাৎ এক মিটারের এক লক্ষ ভাগের একভাগ।

মেঘ থেকে বৃষ্টি হওয়ার মূলে প্রথম তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের উপস্থাপনা করেন অধ্যাপক বার্জেরন। তিনি উল্লেখ করেন, মেঘ উপরে উঠলে এবং তুষারকণার সংস্পর্শে এলে আকারে বড় হয়। অবশেষে বৃষ্টির আকারে নেমে আসে।

পরের দিকে বার্জেরনের এই মতটিকে বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা দেখলেন, ভূপৃষ্ঠ থেকে অন্ততঃ ৬ কিলোমিটার উর্ধ্বেই তুষারকণার সম্ভাবনা রয়েছে। তার নিচের দিকে বায়ুর তাপমাত্রা 0° ডিগ্রীর উপরে। অতএব ৬ কিলোমিটারের নিম্নে তুষারকণা জমা সম্ভব নয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, যেসব মেঘ থেকে হামেশাই বৃষ্টি হয়, তারা ৬ কিলোমিটারের অনেক নিচে থাকে।

বার্জেরনের মতবাদ তাই পরিত্যক্ত হয়। তারপর শুরু হয় নতুন করে ভাবনা-চিন্তা। অধ্যাপক ল্যাংমুর প্রথম প্রমাণ করেন, দুই বা ততোধিক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে উৎপন্ন করে বড় আকারের জলকণা। জলকণাগুলো সংঘর্ষের ফলে আরও যখন বড় হয়ে ওঠে এবং এইভাবে বাড়তে বাড়তে ওদের ব্যাস যখন ৫০০ মাইক্রনের মত হয় তখনই

নেমে আসে বৃষ্টি-বিন্দুর আকারে এবং তখনই বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর। অপরদিকে বৃষ্টিকণাগুলো বায়ুর সঙ্গে সংঘর্ষে ভেঙেও যায় এবং অনেক সময় বাষ্পীভূত হয়ে পুনরায় উপরেও উঠে যায়। কোন কোন সময় উষ্ণ বায়ুস্তর ভেদ করে আসবার সময় বাষ্পীভূতও হয়ে যায়। তখন সে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় না। মেঘের মধ্যে ৫০০ মাইক্রন ব্যাস অপেক্ষা অনেক কম ব্যাসের যে অসংখ্য জলকণা থাকে, সেগুলোও নেমে আসতে পারে না।

ল্যাংমুরের তত্ত্বকে ভিত্তি করে ল্যাংমুরেরই সহকর্মী অধ্যাপক সেফার কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি ঝরানোর একটা তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন, যদি কৃত্রিম উপায়ে মেঘের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফকণাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে, বৃষ্টিকণাগুলো ঘনীভূত হওয়ার সুযোগ পাবে এবং মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরবে। এমন অবস্থায় তিনি শুষ্ক বরফের নাম প্রস্তাব করেন।

শুষ্ক বরফ হচ্ছে জমাটবাঁধা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। ঐ বরফ তরলে রূপান্তরিত না হয়ে সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। যেহেতু গ্যাসকে শীতলীকরণের মাধ্যমে শুষ্ক বরফে পরিণত করা হয়, তাই সামান্য পরিমাণ শুষ্ক বরফের উপস্থিতিতে অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফকণা সৃষ্টি হতে পারবে এবং জলকণাগুলো তাড়াতাড়ি আয়তনে বেড়ে উঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সেফারের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তটিকে কাজে লাগানো হয়েছিল ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে। বৃষ্টি অবশ্য হয়েছিল, কিন্তু আশানুরূপ পাওয়া যায়নি। তখন অপর এক বিজ্ঞানী ডঃ ভনেপুট শুষ্ক বরফের পরিবর্তে সিলভার ব্রোমাইড নামক একটি রাসায়নিক পদার্থের নাম প্রস্তাব করেন। এবার ভনেপুটের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে শুষ্ক বরফ অপেক্ষা কিছুটা ভাল ফল পাওয়া গেল।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি ঝরাতে নানা ধরনের গবেষণা শুরু করেন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য প্রকৃতির নির্মম খেলা অনাবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। এককথায় প্রকৃতিকে জয় করার প্রচেষ্টা। এই ব্যাপারে পৃথিবীর নানা দেশ শুরু করেছিল গবেষণা। এইসব গবেষণার মূল বিষয়বস্তু ছিল মেঘে নানা ধরনের দ্রাবক পদার্থকে ছড়ানো।

দ্রাবক পদার্থ হিসেবে অনেকেই সাধারণ খাদ্যলবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইডকে বেছে নিয়েছিলেন। বেশ সহজলভ্য, দামেও সস্তা। কিন্তু খাদ্য লবণকে ছড়িয়ে দুই বিপরীত ফল লাভ করলেন বিজ্ঞানীরা। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল বৃষ্টি পাওয়া গেল, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গোটা মেঘটাই উধাও হয়ে গেল। উধাও হয়ে যাওয়ার কারণ নির্ণয় করতে দেখা গেল, মেঘের আর্দ্রতা বেশী না থাকার জন্য এমনটি ঘটে। অপরপক্ষে আর্দ্রতা বেশী হলে খাদ্যলবণ ছড়িয়ে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানো যায়।

কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে এখনও সেই একই পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। সবদিক থেকে সিলভার ব্রোমাইডই উপযুক্ত। কিন্তু দাম বেশী। তবে সন্দেহ একটা থেকেই গেছে। যে মেঘ থেকে দ্রাবক পদার্থ ছড়িয়ে বৃষ্টি আনা হচ্ছে, সে মেঘ থেকে স্বাভাবিক অবস্থায়ও কিছুটা বৃষ্টিপাত হতে পারতো। তাহলে কৃতিত্বটা কোথায়! খেয়াল-খুশিমত মেঘ তো আর সৃষ্টি করা যাচ্ছে না।

এইসব নানা কারণে, কৃত্রিমভাবে বৃষ্টিপাত ঘটানো এখনও গবেষণার পর্যায়ে আছে। তবে আকাশে সরু নলের মাধ্যমে তীব্র বিদ্যুৎস্ফুরণ ঘটিয়ে বর্ষাকে আনানো অনেকখানি সুবিধে হয়েছে।

চুষে খাওয়া চকোলেট

চকোলেট! আহা কী মিষ্ট আর কী মধুর গন্ধ! দোকানে কাচের বা পলিথিনের স্বচ্ছ জারে থরে থরে সাজানো রঙ-বেরঙের চকোলেটগুলোকে দেখলে কার না জিভে জল আসে? ছোটরাতো হাতে পয়সা পেলে আগে ছুটে যায় চকোলেটের দোকানে। বুঝি বা ভাবে, কোন্ রসিক এমন আশ্চর্য সুন্দর জিনিসটাকে প্রথম তৈরি করেছিল? হয়ত আরও ভাবে, এগুলো বাড়ীতে যদি তৈরি হতো তাহলে কী মজাই না হতো? মায়েরা অনেক কিছুতো তৈরি করেন, এমন লোভনীয় জিনিসটাকেই বা তৈরি করেন না কেন?

অনেকেরই ধারণা, চকোলেট তৈরি হয় চিনি, গুঁড়ো দুধ এবং সুগন্ধি মশলা সহযোগে।

হ্যাঁ, এগুলো চকোলেটে থাকে বৈকি। কিন্তু আরও একটা জিনিস থাকে যার নাম অনেকেই জানেন না। অথচ চকোলেটের মূল উপাদান ঐটিই—এক ধরনের গাছের বীচি।

কী সেই গাছ যার বীচি এমন উপাদেয় খাদ্য তৈরি করতে পারে?

গাছটার নাম ক্যাকাও। ঐ গাছের বীচির এমন অদ্ভুত গুণটা কেমন করে আমরা জ্ঞাত হলাম, কোথা থেকে চকোলেট তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলো, সেই কথাই বলা হচ্ছে এবং সে এক ইতিহাস।

ক্যাকাও গাছের আদি বাসস্থান উত্তর ও মধ্য আমেরিকায়। বিষুবরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে ২৫° অক্ষাংশের মধ্যে উষ্ণ ও আদ্র অঞ্চলে গাছটা ভালো

জন্মায়। এখন আমেরিকা থেকে বীজ এনে অন্যত্র চাষ করা হচ্ছে চকোলেট তৈরির জন্য।

প্রথমে গাছটার কথায় আসা যাক। ওর বৈজ্ঞানিক নাম থিওব্রোমা ক্যাকাও। এরা-তিন ধরনের। গাছগুলো প্রায় ৩০ ফুটের মত লম্বা হয়, ডালপালাগুলো অনেকটা লালরঙের এবং পাতাগুলো সবুজ। প্রায় ১৫ বছর বয়স হলে গাছে ফল ধরতে শুরু করে। ফল ধরে বছরে দুবার। ফলগুলো আকারে বেশ বড় সড়। এক একটার ওজন গড়ে ৫০০ গ্রামের মত। বীচি থাকে ৩০ টি থেকে ৪০টি। শাঁসের ভেতর থেকে বীচিগুলোকে খুবলে খুবলে বার করে নিতে হয়। হালকা বাদামী রঙের ঐ বীচিগুলো থেকেই তৈরি হয় চকোলেটের উপাদান।

বীচিগুলোকে কাঁচা খাওয়া যায় না। স্বাদে বেশ তেতো। কিন্তু খুব পুষ্টিকর। শর্করা, স্নেহ, প্রোটিন ও খনিজ উপাদানে সমৃদ্ধ। ফল থেকে বীচিগুলোকে সরিয়ে নেওয়ার পর কয়েকদিন ফাঁকা জায়গায় এবং ঠাণ্ডায় ফেলে রাখা হয়। তাতে গেঁজে উঠে বীচিগুলো। তবে বর্তমানে ৪৫° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাসায়নিক উপায়ে অল্পদিনের ভেতরে গাঁজিয়ে নেওয়া হয়।

গেঁজে উঠলে বীচিগুলো বেশ ফুলে উঠে। রঙটাও হয়ে উঠে গাঢ় বাদামী। এবার বীচিগুলোর খোসা ছাড়িয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর পেষাই করা হয় ভারি জিনিস ঠুকে ঠুকে বা মেসিনে।

বীচিতে থাকে তৈল জাতীয় পদার্থ। ঐ কারণে ভাল করে পিষে ফেললে একটা লেই-র মত জিনিস তৈরি হয়। লেইকে শুকিয়ে কেকের মত করে রেখে দেওয়া হয়। প্রয়োজন মত ঐ কেকের অংশ কেটে নিয়ে এবং তার সঙ্গে চিনি, গুঁড়ো দুধ, মশলাপাতি ইত্যাদি মিশিয়ে বা কোন মুখরোচক খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে চাপ দিয়ে লম্বা দণ্ডের মত করে নেওয়া হয়। বাতাসে ভালভাবে দণ্ডটাকে শুকিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ও পরে কাগজে প্যাক করে বাজারে পাঠানো হয়।

এবার ঐ চকোলেটের জন্মবৃত্তান্তে আসা যাক। ওকে নিয়ে সভ্য জগতে নানান ঘটনা ঘটে গেছে। কত করুণ, কত মজাদার সে সব কাহিনী!

আগেই বলা হয়েছে, ক্যাকাও গাছ এককালে কেবল মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাতে জন্মাতো আর ঐ আমেরিকা মহাদেশটি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিতই ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতেই ভৌগোলিক আবিষ্কারকদের দ্বারা আমেরিকা তার অবগুণ্ঠন মোচন করতে বাধ্য হয়েছে।

আমেরিকা পৃথিবীর সভ্য মানুষের কাছ থেকে দূরে, সমুদ্রগর্ভে আত্ম-গোপন করে থাকলেও সেখানে জনবসতি ছিল। তারা অসভ্য ছিল না, দস্তুরমত এক নগরসভ্যতা গড়ে তুলেছিল। তবে ধাতুর ব্যবহার জানতো না,

জানতো না গোলাবারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার, একরকম প্রস্তরযুগেই পড়েছিল তারা। সেখানকার অধিবাসীদের রেড ইণ্ডিয়ান নামে অবিহিত করেছিলেন আবিষ্কারক কলম্বাস।

রেড ইণ্ডিয়ানরা সেখানে যে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল তার নাম দেওয়া হয়েছে মায়া সভ্যতা। মায়া সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিল ওদেরই এক বিশেষ শাখা আজটেক রা। ঐ আজটেকদের ভেতরেই ক্যাকাও বীচিকে গাঁজিয়ে খাওয়ার প্রচলন ছিল, ওরা ক্যাকাও বীচি সংগ্রহ করতো, ঠাণ্ডায় ফেলে রেখে গাঁজিয়ে তুলতো, গেঁজে যাওয়া বীচিকে ভেজে খোসা ছাড়াতো, তারপর পিষে কেকের মত তৈরি করতো। খাওয়ার সময় জলে গুলে ফেলতো, মশলাপাতি মেশাতো, কখনও বা ছাতুতে গুলে ফেলতো। ভারি পছন্দ তাদের ঐ পানীয়তে। অনেক আদিবাসী যেমন দলবেঁধে হাঁড়ি হাঁড়ি পচাই খায়, এরাও তেমনই প্রচুর খেতো। পচাইর মত জোরালো নেশা অবশ্য হতো না। তবে ঐ বীচিতে সামান্য পরিমাণ থিওব্রোমিন ও ক্যাফিন থাকার জন্য কিছুটা মাদকতা আসতো। কথিত আছে, সেকানকার রাজদরবারেও পানীয়টির যথেষ্ট খাতির ছিল। রাজা, অভিজাতরা, প্রজারা সবাই খেতেন। প্রজারা রাজাকে কর হিসেবে দিতেন ক্যাকাও বীচি, বিনিময়ের মাধ্যম ছিল ক্যাকাও বীচি, কাউকে অভ্যর্থনা জানাতে দেওয়া হতো ক্যাকাও বীচির সরবত।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর এবং নতুন দেশ বলে জানাজানি হওয়ার পর দলে দলে ইওরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য এবং এক একটা এলাকাকে দখল করার জন্য হানা দিতে শুরু করে। দক্ষিণ আমেরিকার দিকে অভিযান চালিয়েছিল স্পেন। দলপতি ছিলেন হের্ণাণ্ডো কোর্টেস। তিনি যেমন দুঃসাহসী ছিলেন, তেমনই ছিলেন লোভী ও নিষ্ঠুর। আজটেক সভ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে তিনিই ধ্বংস করেন। কথিত আছে, কোর্টেস এবং তার দলবলকে দেখে আজটেকদের রাজা মন্তেজুমা ভেবেছিলেন, স্বর্গ থেকে দেবতারা নেমে এসেছেন তাঁর রাজ্যে। রাজা ও রাজপুরষুদের সবাই নতজানু হয়ে কোর্টেসদের সামনে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন এবং বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। পান করতে দিয়েছিলেন তাঁদের সবচেয়ে মূল্যবান পানীয়-ক্যাকাও-বীচির সরবত।

কোর্টেসের কিন্তু আদৌ দয়া হয়নি। রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, রাজভোগ খেয়েছিলেন, রাজা ও প্রজাদের শ্রদ্ধাভক্তি কুড়িয়েছিলেন, শেষে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হত্যা করেছিলেন তাঁদের। রাজ্য গ্রাস করার পর ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এক বিরাট এলাকাকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছিলেন।

কোর্টেসরা আজটেকদের কাজ থেকে হয়ত কোনকিছুই গ্রহণ করেন নি। তাদের হত্যা করেছেন, সভ্যতাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু পানীয়টির লোভ ছাড়তে পারেন নি। সেখানকার অধিবাসীদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে নিজেরা

বীচি সংগ্রহ করেছিলেন এবং বীচি থেকে পানীয় প্রস্তুত করেছিলেন। কেবল নিজেরা খেয়ে সন্তুষ্ট থাকেন নি। বীচি সংগ্রহ করে দেশেও পাঠিয়েছিলেন।

সভ্যজগতে একমাত্র স্পেনই প্রথম ক্যাকাও বীচির সরবতে অভ্যস্ত হয়েছিল এবং এ বীচি থেকে কেক ও চকোলেট বানিয়েছিল। তারপর শুরু করে ব্যবসা। কিন্তু ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করেনি রহস্যটা। প্রায় একশ বছর ধরে তারা চুটিয়ে ব্যবসা করেছিল এবং সব বীচিই নিয়ে আসতো আমেরিকা থেকে।

এদিকে আমেরিকায় যখন ইওরোপীয়রা বসতি স্থাপন করলো, তখন গীর্জা স্থাপন করা হলো এবং ধর্মযাজকরাও ছুটলেন আদিবাসীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করানোর জন্য। প্রধান ধর্মযাজক গীর্জায় থাকতেন এবং তাঁর অধীনস্থ তরুণ ধর্মযাজকরা আদিবাসীদের কাছে ছুটাছুটি করতেন। বেজায় পরিশ্রম হতো তাঁদের। তাই তাঁরা আদিবাসীদের দেখাদেখি পান করতে শুরু করেন ঐ সরবত। সরবত পানের পর শরীরটা বেশ ঝরঝরে মনে হতো বলে তাঁরা ঐ সরবত পানে একরকম অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

প্রধান ধর্মযাজক কিন্তু অতশত জানতেন না। প্রকাশ্যে সবাইকে ঐ সরবত পান করতে দেখে তিনি খোঁজখবর নেন। সব শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন তিনি এবং সরবত পান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেন।

ফলটা কিন্তু ভাল হয়নি। তরুণ ধর্মযাজকরা লুকিয়ে লুকিয়ে পান করতে শুরু করলেন এবং যেসব ইওরোপীয় পুরুষ ও মহিলা প্রতিদিন গীর্জায় প্রার্থনা করতে যেতেন, আর মনের আনন্দে গরম গরম সরবত পান করতেন, তাঁরা বিদ্রোহী হলেন। বিশেষ করে মহিলারা। তাঁরা গরম সরবত নিয়ে আসতেন আর প্রার্থনা শেষে সবাই মিলে পান করতেন। কারও কারও মতে ঐ মহিলাদের ভেতরে কেউ একজন প্রধান ধর্মযাজককে বিষ দিয়ে গোপনে হত্যা করেছিলেন। ক্যাকাও বীচির সরবতের প্রতি এত অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা।

প্রধান ধর্মযাজকের মৃত্যুর পর আর কোন বাধা আসেনি। সবাই এন্তার গ্রহণ করতে শুরু করেন এবং দেশেও পাঠাতে শুরু করেন। ক্রমে পাশ্চাত্যের দেশগুলো ধীরে ধীরে আকর্ষণ বোধ করে ক্যাকাওবীচির প্রতি।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে ক্যাকাও বীচি সংগ্রহ করে প্রথম লণ্ডনেই তৈরি হয় কেক এবং এর রহস্য গোপন না রেখে প্রকাশ্যেই বিক্রি করা হয়। ফ্রান্স কিন্তু ঐ বীচির মহিমা জানত না। সেখানে ক্যাকাও কেকের প্রচলন করেন সম্রাট চতুর্দশ লুইর পত্নী রাণী মারিয়া থেরেসা। ইনি স্পেনের রাজকন্যা ছিলেন এবং ছেলেবেলা থেকেই ক্যাকাও বীচির সরবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রচলন ছিল কেক থেকে সরবত বানিয়ে খাওয়া। ঐ সরবত গরম কিংবা ঠাণ্ডা যাঁর যেমন অভ্যাস তেমনই খেতেন এবং যে কেউ ইচ্ছেমত মুখরোচক খাবারেও গুলে খেতেন। ওর চমৎকার রঙ

গন্ধ ও স্বল্প মাদকতা সবাইকে আকৃষ্ট করতো। এবং পান করার রীতিটা ইওরোপীয় দেশগুলোতেই একরকম সীমাবদ্ধ ছিল। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ওকে নিয়ে একটা বড় রকমের ব্যবসা ফাঁদলেন। কেক বিক্রি না করে চুষে চুষে খাওয়ার জন্য বানালেন চকোলেট। কেকের সঙ্গে দুধ, মিষ্টি মশলা ইত্যাদি মিলিয়ে তৈরি করা চকোলেট দুদিনেই বাজার মাৎ করে ছাড়লো।

চকোলেটের অদ্ভুত জনপ্রিয়তা দেখে এবার এগিয়ে এলেন লণ্ডনের আর একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। আরও মুখরোচক চকোলেট উপহার দিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানই বিখ্যাত ক্যাডবেরি কোম্পানী। ক্যাডবেরি চকোলেট বলতে আজকে অনেকেই অজ্ঞান। অবশ্য এখন ঐ চকোলেট সব দেশেই তৈরি হচ্ছে।

লাল রঙ নীল রঙ

রঙের সমাবেশ কার না ভাল লাগে! গোধূলির অন্তরাগ, অশোক-পলাশের রক্তিমা, আমাদের মনে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়; আকাশের নীলিমা, অশ্রুসিক্ত ডাগর ডাগর চোখের মত শিশির ভেজা অপরাজিতা মনকে করে উদাসীন; লাল লাল প্রবাল, ময়ূরের গলায় নীল নীল আভা মনকে কেড়ে নেয়।

সত্যি, বড় ভালবাসি আমরা রঙকে। তাইতো পোষাকে পরিচ্ছদে জৌলস আনাতে, অঙ্গের সৌষ্টব বাড়াতে, খাদ্য ও পানীয়কে নয়নরঞ্জক করতে রঙের শরণাপন্ন হই।

রঙের নেশা মানুষের যেন চিরন্তন। অনেক জীবজন্তু বর্ণান্ধ বলে রঙের বাহার তাদের চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু মানুষের চোখে অতিবেগুনী এবং অবলোহিত ছাড়া সব রঙই ধরা পড়ে। ধরা পড়ে বলেই যেদিন মানুষ বনে বনে বিচরণ করতো, পশুচর্ম পরিধান করতো, কাঁচা মাংস খেতো, সেদিনও সে অঙ্গের শোভাবর্ধন করানোর জন্য গায়ে রঙ মাখতো। হয়ত রঙ্গীন কোন কিছুকে দেখলে দুদণ্ড তাকিয়ে থাকতো, হাতে নিয়ে পরখ করতো, যত্ন করে কাছে কাছে রাখতো। রঙের প্রতি আকর্ষণ ছিল বলেই সেকালেও তারা লাল প্রবাল, নীল স্ফটিক পাথর ইত্যাদিকে সংগ্রহ করেছিল। এমনও হতে পারে, রঙের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ তাদের প্রস্তর যুগ থেকে টেনে এনেছিল

তাম্র যুগে। তবে অনেকের মতে সেদিনের মানুষের নিরাপত্তা বলতে কিছুই ছিল না, মৃত্যু সর্বত্রই প্রতীক্ষা করে থাকতো, তাই সংস্কারবশে অশুভকে দূর করতে গায়ে রঙ মাখতো এবং রঙবেরঙের পাখীর পালক দিয়ে মুকুট বানিয়ে মাথায় পরতো। পরের দিকে গুহাগাত্রে ছবি আঁকতে গিয়েও রঙের ব্যবহার করেছিল।

মানুষ যেদিন কাপড় বুনতে শিখেছিল, সেইদিন থেকে কাপড়কে আরও জমকালো করার জন্য খুঁজেছিল প্রাকৃতিক রঙ। খুঁজতে খুঁজতে হয়ত পেয়েছিল মঞ্জিষ্ঠা নামে এক ধরনের লতানে গাছ। যার শেকড় থেকে লাভ করেছিল সুন্দর হলুদ রঙ। পরে কোন শিল্পী ঐ হলুদ রঙের সঙ্গে ফটকিরি মিশিয়ে লাভ করেছিল চমৎকার লাল রঙ। সম্ভবতঃ মঞ্জিষ্ঠা প্রাচীন ভারতেই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিল—সুতীবস্ত্রের রঞ্জক হিসেবে এবং পরের দিকে এর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছিল মিশরে ও গ্রীসে।

রঞ্জকের জন্য সেকালের সমূহ সভ্য দেশ মঞ্জিষ্ঠার চাষ করতো। একরকম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্তও অব্যাহত ছিল মঞ্জিষ্ঠার চাষ। ঐ ঊনবিংশ শতব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন কৃত্রিমভাবে তৈরি জৈব যৌগসমূহ একের পর এক আসতে শুরু করে তখনই কোন কোন রাসায়নবিজ্ঞানীর ধারণা হয়, প্রাণীজ এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থগুলোকে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা অবশ্যই সম্ভব হবে। তাই সেই থেকে জৈব যৌগগুলোর গঠন রহস্য উদ্ঘাটনে যত্নবান হয়েছিলেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ হফম্যান ছিলেন অন্যতম। তাঁরই এক তরুণ ছাত্র পার্কিন একদিন আকস্মিকভাবে সম্পূর্ণ অজৈব পদার্থ থেকে তৈরি করে ফেললেন এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ।

এবার চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। রসায়নবিদদের পূর্ব ধারণা হলো বদ্ধমূল। অনেকেই বসে গেলেন পরীক্ষানিরীক্ষা করতে। তারই ফলস্বরূপ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নবিজ্ঞানী ভেরকুইন কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করে ফেললেন আশ্চর্য সুন্দর লাল রঙ ম্যাজেন্টা।

কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ তৈরির ক্ষেত্রে প্রখ্যাত রসায়নবিদ অ্যাডলফ ফন বেয়ারের অবদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘকাল ধরে তিনি কৃত্রিমভাবে রঙ উৎপাদনের জন্য গবেষণা করছিলেন এবং বহু ছাত্রকে উৎসাহিত করেছিলেন। জার্মানীতে একটা গবেষণাগারও স্থাপন করেছিলেন তিনি। তাঁরই গবেষণাগার থেকে লিবারম্যান এবং কার্লগ্রীব নামে দুজন রসায়নবিজ্ঞানী সর্বপ্রথম অ্যালিজারিন অণুর গঠন সঠিকভাবে নির্ণয় করেন। অ্যালিজারিন সেই লতানে গাছ—মঞ্জিষ্টার শেকড়ের রাসায়নিক উপাদান। বাজারে এর চাহিদা যথেষ্ট ছিল বলে অনেকেই এ বিষয়ে গবেষণা করছিলেন। কার্লগ্রীব ও লিবারম্যানের গবেষণা এবার অ্যালিজারিন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দিক উদ্ঘাটিত করলো। সংশ্লেষনী পদ্ধতিতে তৈরি করার একটা উপায়ও আবিষ্কৃত হলো। কিন্তু তৈরি করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, বাজারে

প্রচলিত অ্যালিজারিন থেকে এর দাম পড়লো অনেক-অনেক বেশী। কিছুতেই প্রতিযোগিতা করা গেল না। বাধ্য হয়ে অন্য উপায় চিন্তা করতে হলো।

কিন্তু খুব বেশীদিন অপেক্ষা করতে হলো না। সেই কার্লগ্রীব এবং লিবারম্যান অপর এক সহজতম উপায় উদ্ভাবন করলেন। দেখা গেল, এই উপায়ে অ্যালিজারিন তৈরি করতে খরচ পড়লো অনেক কম। ১৮৭১ সালে তাঁরা এই রঙ বাজারে ছাড়লেন এবং গুণগত বৈশিষ্ট্য ও অল্প দামের জন্য সঙ্গে সঙ্গে বাজার মাৎ করে দিল। পেছু হঠতে বাধ্য হলো মঞ্জিষ্ঠা। অতি অল্পদিনের ভেতরে ওর চাষ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

নীল রঙের বেলায়ও মানুষ প্রকৃতির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল। এশিয়া মহাদেশের নানান-জায়গায় নীলগাছের চাষ হতো এবং ঐ নীল চাষ থেকেই বাজারে নীল রঙের চাহিদা পূরণ হতো।

সেকালে নীলচাষ ছিল লাভজনক ব্যবসা। কে না জানেন, বাংলায় নীলচাষকে কেন্দ্র করে নীলকরদের অত্যাচারে বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকার উঠেছিল! আর এও সত্য যে, নীলকররা এদেশ পরিত্যাগ করেছিল নীল-বিদ্রোহের জন্য নয়, বাজারে তার পরিপূরক অল্পমূল্যের রাসায়নিক নীল আমদানির জন্য।

কৃত্রিমভাবে নীল রঙ তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সেই রসায়নবিজ্ঞানী অ্যাডলফ ফন বেয়ার। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দেই শুরু করেছিলেন গবেষণা। সুদীর্ঘ ১৮ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর নীলের রাসায়নিক সংযুতি নির্ধারণ করেন এবং একটি বিশেষ পদ্ধতিতে নীল রঙ তৈরি করতে সমর্থ হন।

অ্যালিজারিনের মত প্রাথমিক অবস্থায় কৃত্রিম নীল রঙও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। কারণ সেই একই—খরচ পড়তো বেশী। তাই স্বল্প দামে বাজারে পাঠাবার জন্য নতুম উপায়ের অনুসন্ধান শুরু হয়। পরিশেষে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী হফম্যান নীল রঙ তৈরির সহজ উপায় উদ্ভাবন করেন এবং কৃত্রিম নীলে বাজার ছেয়ে যায়।

কৃত্রিম উপায়ে লাল ও নীল রঙ তৈরির ক্ষেত্রে অসমান্য অবদানের জন্য বেয়ারকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

হীরে মণি মুক্তো

সাত রাজার ধন এক মাণিক! ঠিক তাই। ওকে সহজে পাওয়ার কোন উপায় নেই। দামটা এমন আকাশছোঁয়া যে, বহু অর্থবান ব্যক্তিরও ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে। তাই অধিকাংশের ধরা ছোঁয়ার বাহিরে মাণিক বা মণি।

এমনকি অনেকের জীবনে একবার দেখার সৌভাগ্যও ঘটে না। তাছাড়া মণির কদর জহুরীর কাছে। যিনি কখনও মণি দেখেন নি তাঁর হাতে মণি খণ্ড তুলে দিলে তিনি এক টুকরো কাচ বলেই ভাববেন। সেই গল্প—উজ্জ্বল একটুকরো মণি পেয়ে গাধার মালিক চমৎকার এক কাচের টুকরো মনে করে গাধার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল।

মণি সাপের মাথায় থাকে না, অজানা সেই রাজকন্যার চোখ থেকেও ঝরে না, মণি থেকেই মণি পাওয়া যায়—হীরে যাকে বলে। আর উন্নত মানের হীরকই মণি নামে পরিচিত। যেমন কোহিনুর মণি। কোহিনুর তুল্য দ্বিতীয় মণি পৃথিবীতে নেই।

হীরে কয়লারই রূপভেদ। পৃথিবীর অর্ধেক জায়গায় হীরকের খনি আছে। এর ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল থেকেই। প্রাচীন নগর সভ্যতার যুগে রাজা ও রাণীরা হীরের অলঙ্কার ব্যবহার করতেন। দেখতে ভারি সুন্দর, সহজে নষ্টও হয় না। শত-সহস্র বছর ধরে উজ্জ্বল্য তেমনই অম্লান থাকে। তাইতো ওদের কদর এত বেশী। তার উপর অতি শক্ত পদার্থ—কাচকেও কাটতে পারে। তাই হীরের চেয়ে শক্ত পদার্থ এখনও কিছু পাওয়া যায়নি। রত্ন হিসেবে ওর বিশেষ প্রসিদ্ধি রয়েছে।

রত্ন হিসেবে আরও কতকগুলো জিনিসকেও মানুষ খাতির করে। সেগুলোও মূল্যবান, কঠিন এবং দেখতেও সুন্দর। তাই তাদের নামের শেষে মণি কথাটা যুক্ত করা হয়েছে। নীলকান্ত মণি, বৈদুর্যমণি, চন্দ্রকান্ত মণি, মরকত মণি, গোমেদ মণি ইত্যাদি নাম। এদের উপাদান কিন্তু হীরের মত কার্বন বা কয়লা নয়। বেশীরভাগের মূল উপাদান অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড। আজ পর্যন্ত প্রায় ১০০ রকমের ঐ জাতীয় রত্ন আবিস্কৃত হয়েছে। এরাও সহজলভ্য নয়। কিছু কিছু আগ্নেয় ও পাললিক শিলায় পাওয়া গেলেও বেশীরভাগ পাওয়া যায় রূপান্তরিত শিলায়।

এদের সবাইও বেজায় কঠিন। কাঠিন্যের দিক থেকে হীরের স্থান প্রথম। হীরের কাঠিন্য ধরা হয়েছে ১০। কাঠিন্যের দিক থেকে চুনির ৯, বৈদুর্য মণির ৮½, পান্না ও পোখরাজের ৮, গোমেদের ৭½। হীরের কাঠিন্য বেশী হওয়ায় সে পরবর্তীদের গায়েও দাগ কাটতে পারে।

না, হীরে বিষাক্ত নয়। হীরকচূর্ণ খাইয়ে কাউকে মারা যায় না, হীরকের আংটি চুষে আত্মহত্যাও করতে পারে না কেউ। এগুলো গপ্পো, গপ্পের ঘোড়া যেমন আকাশে উড়ে বেড়ায় এও তেমনই। স্রেফ কল্পনা।

হীরেই হোক, আর চুনি পান্নাই হোক, ওদের সৌন্দর্য নির্ভর করে—কাটা ও পালিশ করার উপর। প্রকৃত জহুরীর হাতেই ওদের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। হীরের দামও নির্ভর করে বিশেষ কোণে পল করে কাটার উপর এবং পালিশের উপর। হীরককে সাধারণতঃ ৪১ ডিগ্রী কোণ করে পল কাটা হয়। এতে আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসে। তখনই ঝকমক করে এবং সৌন্দর্যটা আমাদের

চোখে ধরা পড়ে। আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসা মানেই আলোর প্রতিসরণ ঘটা। হীরে স্বচ্ছ এবং এর প্রতিসরাঙ্ক ২.৪২। অন্যান্য রত্ন পাথরদের প্রতিসরাঙ্ক ২ থেকে কম।

হীরে স্বচ্ছ। কিন্তু অন্যান্যদের নিজস্ব রঙ আছে। পান্না বা মরকত মণির রঙ সবুজ, চুনি বা রুবি লাল রঙের, নীলা বা নীলকান্ত মণি নীল রঙের, বৈদুর্যমণি বা ক্যাটস আই বেড়ালের চোখের মত, গোমেদ খয়েরি রঙের, প্রবাল গাঢ় লাল রঙের ইত্যাদি। ঐসব মণিদের নিয়ে প্রায় সব দেশেই কিছু না কিছু সংস্কার আছে। যেমন বলা হয়ে থাকে—নীলা কারুর সহ্য হয়, আবার কারুর সর্বনাশ ঘটায়। এমনকি পরিবারেরও। ঐ সংস্কার-গুলোকে নিয়ে বহু লোমহর্ষক কাহিনীও গড়ে উঠেছে। সেগুলো ভিত্তিহীন। অর্থাৎ বিজ্ঞান খুঁজে পায়নি। কোহিনুরকে ঘিরেও সংস্কার আছে।

এমন যে মূল্যবান পদার্থগুলো—তাদের কৃত্রিমভাবে তৈরি করতেও বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হয়েছেন, তৈরিও করেছেন। রত্ন পাথর তৈরি করা কোন সমস্যাই নয়। নীলাকে তৈরি করা হয় অতি মিহি ও বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের গুঁড়োকে গলিয়ে, ৬ ভাগ বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের গুঁড়োর সঙ্গে ৫ ভাগ ক্রোমিয়াম অক্সাইডের গুঁড়ো মিশিয়ে এবং উচ্চতাপে গলিয়ে চুনিকে তৈরি করা হয়। রত্ন ব্যবসায়ীরা এবং জ্যোতিষীরা হয়ত ক্ষেপে যাবেন। বলবেন, এরা প্রাকৃতিক নয় এবং রত্ন হিসেবে কোন মূল্য নেই। আসলে, উহারা বোধহয় জানেন না, কিংবা জেনে অস্বীকার করেন দোকানে ঝুড়ি ঝুড়ি যে পাথরগুলো বিক্রি হয় তাদের অধিকাংশই কৃত্রিম।

হীরেকেও তৈরি করা যায়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম হেনরি ময়সাঁ কৃত্রিম হীরক তৈরি করেছিলেন। বিশুদ্ধ চিনি, কয়লা ও লৌহচূর্ণকে নিয়ে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে উত্তপ্ত করেছিলেন তিন হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে। ওতে মিশ্রণটা গলে গিয়েছিল এবং সহসা ঐ মিশ্রণটাকে শীতল করে ফেলেছিলেন। অতি উচ্চ তাপমাত্রায় চিনি কয়লা থেকে যেটুকু কার্বন গলিত লোহায় দ্রবীভূত হয়েছিল, হঠাৎ শীতল করার ফলে তারই একাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল কেলাসের আকারে। ঐ কেলাসই হীরক।

অনুরূপ উপায়ে প্রাপ্ত হীরকের কিন্তু বাজার দাম নেই। টুকরোগুলো অতি ক্ষুদ্র। ওর উপর পল কাটাও যায় না, পালিশ করাও সম্ভব হয় না। কেবলমাত্র হীরকের বড় টুকরোগুলোই রত্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হীরক খণ্ডটির নাম কুলিনান, ওজনে ৩০৩২ ক্যারেট (১ ক্যারেট =০.২ গ্রাম)। কিংবদন্তীর নায়ক কোহিনুরের ওজন ছিল ১৩৬.২৫ ক্যারেট।

এবার মুক্তোর কথায় আসা যাক। মুক্তোর সঙ্গেও মানুষের পরিচয় অনেককালের। রত্ন হিসেবে মুক্তোরও সুখ্যাতি আছে। শোনা যায়, প্রাচীনকালে রাজ-রাজড়াদের রত্নভাণ্ডারে মুক্তোর ছড়াছড়ি ছিল।

মুক্তোকে রত্ন হিসেবে ধরা হলেও, অন্যান্য রত্নের সঙ্গে ওর প্রভেদ বিস্তর। প্রবালও তাই। অন্যান্য মূল্যবান রত্নের সঙ্গে মুক্তোকে কবে যে মানুষ অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং কেমন করে সংগ্রহ করতো—তা ঠিক করে কিছু বলার উপায় নেই। তবে মুক্তো সম্বন্ধেও নানা গাল গল্প গড়ে উঠেছিল। এই সেদিনও পর্যন্ত অনেকে মনে করতেন হাতীর মাথার ভেতরে মুক্তো জন্মায়—নাম গজমুক্তা। গল্প অনুযায়ী সব হাতীর মাথায় পাওয়া যায় না; দৈবাৎ এক একটির মাথায়। তার মানে কারুর মাথায় নয়।

মুক্তো পাওয়া যায় ঝিনুকের ভেতর থেকে এবং এ কথাটা অনেক আগে থেকেই মানুষ জানতো। কোন কোন দেশ মনে করতো, সমুদ্রের ঝিনুকরা রাতের বেলায় বেলাভূমিতে উঠে এসে শিশির বিন্দু পান করে। সেই শিশির ওদের পেটে গেলে রূপ নেয় মুক্তার। আজও পশ্চিমবাংলার গ্রামেগঞ্জের সাধারণ মানুষ মনে করেন, আশ্বিনের সংক্রান্তিতে গভীর রাতে আকাশ থেকে নেমে আসে মাত্র কয়েকবিন্দু বিশেষ ধরনের শিশির। ঐ শিশির সাপের মাথায় পড়লে সাপের মাথায় মণি গজায়, হাতীর মাথায় পড়লে মুক্তো গজায়, ঝিনুকের উপরে পড়লেও মুক্তো হয়, ইত্যাদি।

এইসব ভ্রান্ত ধারণা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। লিনে নামে একজন ফরাসী বিজ্ঞানীই প্রথম উদ্ঘাটন করেছিলেন মুক্তোর রহস্য।

সব রকমের ঝিনুক মুক্তো তৈরি করতে পারে না। পার্লঅয়েস্টার নামে এক ধরনের সামুদ্রিক ঝিনুকই মুক্তো তৈরি করতে সক্ষম। চলতি কথায় আমরা ওদের বলি শুক্তি।

সব ঝিনুকেরই শরীরটা থলথলে জেলির মত। দুটি খোলকের ভেতরে আবদ্ধ রাখে নরম ও থলথলে শরীরটাকে। কিন্তু জীব-তো! খোলকের ভেতরে গুটিয়ে থাকলে চলে না। এখানে ওখানে চলাফেরা করতে হয়, খাদ্য অন্বেষণ করতে হয়, শত্রুর চোখে ধুলোও দিতে হয়। তাই খাদ্য খুঁজতে খোলক খুলে নরম শরীরটাকে পেতে ধরতে হয় সাগর তলায়—হাঁটাচলাও করতে হয় অতি মন্থরভাবে।

সাগর তলায় বালুকণার অভাব নেই। চলতে গেলে অনেকসময় ছোট্ট বালুকণা ঢুকে পড়ে শরীরের ভেতরে। তখন খুব অস্বস্তি অনুভব করে। থলথলে শরীর বলে কিছুতেই বেরিয়ে যেতে পারে না—একেবারে লেপ্টে থাকে যেন।

তখন অন্য উপায়ে অস্বস্তি থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করে। খোলকের তলায় দুদিকের দুটি ঝিল্লী থেকে লালা ঝরতে শুরু করে এবং সেই লালা বালুকণাটিকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলে।

লালার নিঃসরণ ঘটে অনেকদিন পর্যন্ত। পর পর সেই লালা শক্ত হয়ে ওঠে। আস্তরণের পর আস্তরণ জমা হয় পেঁয়াজের খোসার মত।

কালক্রমে আস্তরণগুলো শক্ত হয়ে ওঠে এবং ঐটি শেষ পর্যন্ত মুক্তোর রূপ নেয়।

বর্তমানে প্রাকৃতিক মুক্তা খুব বেশী পাওয়া যায় না। ওকে সংগ্রহ করে ডুবুরীরা। মুক্তোর দামের জন্য কৃত্রিমভাবে চাষ করা হচ্ছে আজকাল। ফরাসী বিজ্ঞানী লিনের গবেষণাকে অবলম্বন করে বড় বড় চৌবাচ্চায় পার্ল-অয়েস্টারদের পালন করা হয়। অতি দক্ষতার সঙ্গে এবং অত্যন্ত সাবধানতায় ঝিনুকের শরীরে ছোট্ট বালুকণা কৃত্রিমভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কখনও বা স্বল্প একটু আঁচড় কেটে দেহে অস্বস্তির সৃষ্টি করা হয়। লক্ষ্য করা হয়, অস্বস্তিটা যেন ওকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে না যায়।

অনেক শিক্ষিত ডুবুরীও ওদের উপনিবেশে গিয়ে বালুকণা প্রবেশ করিয়ে আসেন।

ঝিনুকদের দেহে মুক্তো জমতে দীর্ঘ সময় লাগে। কৃত্রিম উপায়ে মুক্তো তৈরি করতে গেলে এতদিন অপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। মাত্র কয়েক বছরের ভেতরেই ঝিনুকের দেহ থেকে মুক্তোটা বার করে আনা হয়। এই মুক্তো স্বাভাবিক মুক্তো অপেক্ষা ছোট্ট এবং নিকৃষ্ট। স্বাভাবিকভাবে ঝিনুকের দেহে যে মুক্তো জন্মে তা বেশ বড় হয় এবং রঙটা গোলাপী আভা মুক্ত আর কৃত্রিম মুক্তো সাদা।

নানা দেশে মুক্তোর চাষ হচ্ছে আজকাল। জাপান এ বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছে। সেখানকার মেয়েদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তাঁরাই মুক্তো চাষের সঙ্গে বেশী যুক্ত থাকেন।

আকাশের বাজ আর বজ্রনিরোধক

কড় কড় শব্দে যখন বাজ পড়ে তখন ছোটরা ঘরের কোণে ভয়ে কাঁপতে থাকে। বড়দেরও বুক দুরু দুরু করে, কেউ বা ভয়ে ভির্মি খায়। কাছাকাছি যদি কোথাও বাজ পড়ে তাহলে তীব্র আলোর ঝলকানিতে চোখে ধাঁ-ধাঁ লেগে যায়, প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে যায়, বুকের ধড়ফড়ানিতে শ্বাস যেন রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়।

আকাশের বাজকে ভয় সবার। প্রতি বছর কত জীবজন্তু, কত মানুষজন, কত গাছপালা যে মারা যায় তার ঠিক ঠিকানা নেই। শুধু কী তাই! কত ঘরবাড়ী ফেটে চৌচির হয়ে যায়, কত পুরাকীর্তিকে ধ্বংস করে দেয়, কত গাছ-

গাছড়া নষ্ট হয়ে যায়। বাজ তাই একটা আতঙ্ক।

বাজের প্রতি ভয় মানুষের চিরকালের। মানুষ যখন অরণ্যচারী ছিল তখন আরও ভয় করতো বাজকে। তাদের ধারণা ছিল, আকাশের বজ্র ও বিদ্যুৎ এক অশুভ শক্তি—দেবতার রুদ্ররোষ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে নেমে আসে স্বর্গ থেকে। সেই অশুভ শক্তি থেকে মুক্তিলাভের জন্য হাজার সংস্কারে জড়িয়ে পড়েছিল মানুষ। দেবরাজ ইন্দ্রের হাতের বজ্র যাতে নেমে না আসে তার জন্য পুজো-পদ্ধতি ও যাগ-যজ্ঞ করতো। অশুভের ভেতরে অবশ্য কিছু শুভের ইঙ্গিত থাকে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বাজপড়া গাছ থেকে আগুন নিয়ে মানুষ প্রথম অগ্নিদেবতাকে বন্দী করেছিল। অপরদিকে আকাশের বাজ আর বিদ্যুতের ফলে পর্যাপ্ত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে জলের ধারার সঙ্গে মাটিতে নেমে আসে। তাতে গাছ-গাছড়া নাইট্রোজেন ঘটিত খাদ্য লাভ করে।

আদি মানবের আমল থেকে একরকম সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আকাশের ঐ বজ্র যে কী তা কারও জানা ছিল না। জানবেই বা কেমন করে? মানুষের হাতে তখনও বিদ্যুৎ আসেনি, বিদ্যুৎ সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না, বিদ্যুতের আশ্চর্য ক্ষমতা কল্পনারও বাহিরে ছিল।

একদিন শুভক্ষণে বিজ্ঞানীরা স্থির তড়িৎ সম্বন্ধে জ্ঞাত হলেন। বিজ্ঞানের এই নতুন দিকটাকে নিয়ে শুরু করলেন নানাজনে গবেষণা। সেইসময় কারো কারো মনে সন্দেহ দেখা দেয়—আকাশের কালো মেঘের বুকে ঝলকানিগুলো সম্ভবতঃ বিদ্যুৎ।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নামে এক ব্যক্তি নিজস্ব ছাপাখানায় কাজ করতেন। খুব চিন্তাশীল ছিলেন তিনি। বয়স তখন তাঁর চল্লিশের কাছাকাছি। কী খেয়াল হলো তাঁর! নবাবিষ্কৃত স্থিরতড়িতের প্রতি বেজায় আকর্ষণ অনুভব করলেন। শুরু করলেন এ বিষয়ে পড়াশোনা এবং যন্ত্রপাতি কিনে শুরু করেছিলেন পরীক্ষা নিরীক্ষা।

প্রথম প্রথম বেঞ্জামিন ফ্লাঙ্কলিনের পরীক্ষা ছিল, অপরের আবিষ্কৃত সত্যগুলোকে হাতে নাতে করে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা। পরে নতুন উদ্যম নিয়ে রীতিমত গবেষণা শুরু করে দিলেন। প্রায় আট বছরকাল ব্যাপৃত ছিলেন এই কাজে। তড়িৎ সম্বন্ধে বহু তথ্যও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এবং আবিষ্কৃত তথ্যগুলোকে প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করেছিলেন। ফলে তড়িৎবিজ্ঞানের এক গবেষক হিসেবে তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এইসময় বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের অন্যান্য বিজ্ঞানীর মত সন্দেহ হয়, তাঁদের তৈরি বিদ্যুতের সঙ্গে আকাশের বিদ্যুতের যেন কিছুটা সাদৃশ্য আছে। তড়িৎ যেমন কোন পরিবাহীর মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাচল করতে পারে, তেমনি আকাশের বিদ্যুৎও বড় বড় গাছ, কারখানার চিমনি ইত্যাদিকে অবলম্বন করে নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। তড়িৎ যেমন

কোনকিছুকে পুড়িয়ে দিতে পারে, ধাতুকে গলাতে পারে, একাধিক পথে সঞ্চালিত হতে পারে, তেমনই আকাশের বিদ্যুৎও পারে।

এবার পরীক্ষা করে দেখার পালা। কেন না, ভাবনা চিন্তার মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তো বৈজ্ঞানিক সত্য বলে স্বীকৃতি পায় না! তাকে বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করতে হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ তো আকাশে চমকায়, আর আচমকা নেমে আসে। তাকে পরীক্ষা করে দেখা যাবে কেমন করে? তাছাড়া এ যে বড় ভয়ংকর জিনিস! মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা।

না, বিজ্ঞানীদের এত ভয় করলে চলে না। বেঞ্জামিন স্থির করলেন, আকাশের বিদ্যুৎকে নামাতেই হবে। গভীর চিন্তার পর একটা সরঞ্জাম বানালেন, তারপর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে রইলেন একটি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য—যেদিন কালোমেঘে ঢাকা পড়বে আকাশ, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাবে, আর কড় কড় করে বাজ পড়বে।

১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তেমনই একটি দিন এলো। আকাশে মেঘের ঘনঘটা, ক্ষণে ক্ষণে প্রভা দান করছে ক্ষণপ্রভা, আর মেঘ ডাকছে গুরু গুরু রবে। ফ্রাংকলিন এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য বেরিয়ে পড়লেন ঘর ছেড়ে।

আগেই তৈরি করা ছিল সিল্কের রুমাল দিয়ে তৈরি একটা ঘুড়ি। ঘুড়িটির মাথায় বাঁধা ছিল সুঁচলো অগ্রভাগবিশিষ্ট একটা লোহার দণ্ড, আর তড়িৎ সংগ্রাহক যন্ত্র লীডেনজার।

ফ্যাংকলিন লম্বা সুতো দিয়ে ঘুড়িটা আকাশে ওড়ালেন। সুতোর অন্যপ্রান্তে সিল্কের ফিতে বেঁধে যুক্ত করেছিলেন লীডেনজারের সঙ্গে।

যা ভেবেছিলেন তাই-ই হলো। একটু পরেই লীডেনজার নির্দেশ দিল তড়িতের। নিজ হাতেও অনুভব করলেন তড়িতের শক। নিশ্চিন্ত হলেন তিনি এবং তাঁর পরীক্ষার কথা প্রচার করলেন বিজ্ঞানীদের মধ্যে। বললেন, ছুঁচলো অগ্রভাগবিশিষ্ট লৌহদণ্ডের মাধ্যমে আকাশের বিদ্যুৎকে নিরাপদে মাটিতে নামিয়ে আনা যায়।

চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। অনেকেই ফ্রাংকলিনের মত আকাশের বিদ্যুৎকে মাটিতে নামিয়ে আনতে আগ্রহী হলেন। কিন্তু পরের বছর একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সেন্ট পিটার্সবার্গের জর্জ রিখম্যান নামে এক বিজ্ঞানী আকাশের বিদ্যুৎকে নামাতে গিয়ে তড়িৎপৃষ্ঠ হয়ে মারা গেলেন। শোনা যায়, পরীক্ষা চালানোর কালে বেঞ্জামিনও অতি অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছিলেন।

আকাশের তড়িৎকে পরীক্ষা করার পর বেঞ্জামিনের চিন্তা অন্যখাতে প্রবাহিত হলো। বাজ পড়ে বহু পুরাকীর্তি, বহু বাড়ী নষ্ট হয়ে যায়। যদি ছুঁচলো অগ্রভাগবিশিষ্ট ধাতবদণ্ডকে বাড়ীর মাথার উপর থেকে সরাসরি মাটিতে নামিয়ে আনা যায়, তাহলে বিদ্যুৎ মাটিতে নেমে আসবে এবং বাড়ীটির কোন ক্ষতি হবে না। এককথায় প্রকৃতির উপর হস্তক্ষেপ করতে

চাইলেন তিনি এবং সফলও লাভ করলেন।

বেঞ্জামিন তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানাতেই অধিকাংশ পাকাবাড়ীর মালিক বজ্রনিরোধক দণ্ড ব্যবহার করতে শুরু করলেন। কিন্তু ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের সেণ্টপল গির্জার মাথায় বজ্রনিরোধক স্থাপন করার সময় বাধলো গোলমাল। গোলমাল বাধলো বজ্রনিরোধক দণ্ডটির অগ্রভাগ সূঁচলো হবে না ভোঁতা হবে—এই নিয়ে ফ্রাঙ্কলিনের তত্ত্বকে যেন পুরোপুরি মেনে নিতে পারলো না লণ্ডন।

কারণ অবশ্য ছিল। ইংলণ্ডের রাজা তখন তৃতীয় জর্জ। তাঁরই সময় আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম নেতা ছিলেন বেঞ্জামিন ফ্যাঙ্কলিন। স্বাধীনতায় আমেরিকার যে নায্য অধিকার —এই দাবী নিয়ে তিনি আন্দোলন করেছিলেন এবং ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সমর্থন আদায়ে যত্নবান হয়েছিলেন। যেহেতু আমেরিকা ছিল ইংলণ্ডের উপনিবেশ এবং এখান থেকে ইংলণ্ড যথেষ্ট রোজগার করতো, তাই ইংলণ্ডের চোখে বেঞ্জামিন ছিলেন শত্রু। শত্রুর আবিষ্কৃত তত্ত্বকে সরাসরি গ্রহণ করতে চায়নি ইংলণ্ড। শুরু হয়েছিল বিতর্ক।

রাজা তৃতীয় জর্জ বেঞ্জামিনের তত্ত্বকে নাকচ করে মেনে নিলেন ভোঁতা মুখ ওয়ালা বজ্রনিরোধক। তিনি রয়েল সোসাইটিকে চাপ দিলেন—যাতে তারাও নাকচ করেন বেঞ্জামিনের প্রদত্ত তত্ত্বকে। কেবল তাই নয়, বার্মিংহামের রাজপ্রাসাদে রাজা ছুঁচলো বজ্রনিরোধকের পরিবর্তে ভোঁতা মুখওয়ালা বজ্র রক্ষী স্থাপন করলেন।

রয়েল সোসাইটির উপর রাজার চাপ সমস্ত সদস্যদের বিভ্রান্ত করলো। তাঁরা রাজার যুক্তিকে মেনে নিতে পারলেন না। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে রাজা যে বিরোধিতা করে চলেছেন—তাও বুঝতে পারলেন। তবু রাজরোষের ভয়ে প্রকাশ্যে কেউ বিরোধিতা করতে সাহসী হলেন না এবং কোন মতামতও ব্যক্ত করলেন না।

রয়েল সোসাইটির তখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন জন প্রিঙ্গল। রয়েল সোসাইটি যখন কোন মতামত পাঠালেন না, তখন রাজা তৃতীয় জর্জ সভাপতির উপরই চাপ সৃষ্টি করলেন।

সমস্যায় পড়লেন জন প্রিঙ্গল। একদিকে রাজরোষ, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক সত্য। কাকে তিনি গ্রহণ করবেন ?

শেষ পর্যন্ত তিনি জানিয়ে দিলেন, বৈজ্ঞানিক সত্যকে তিনি অবমাননা করতে পারবেন না। এমনকি রাজার আদেশেও নয়।

জন প্রিঙ্গল জানতেন তিনি যা করলেন রাজরোষ অবশ্য বর্ষিত হবে এবং সভাপতির পদও তাঁর থাকবে না। তাই রাজার কাছে মতামত ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেন এবং পদত্যাগ পত্রটি পাঠিয়ে দিলেন রাজার কাছে।

বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এক অভাবনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন জন প্রিঙ্গল। শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছিল তাঁরই এবং জয় হয়েছিল উক্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদ্গাতা বেঞ্জামিন ফ্যাংকলিনের। তাই এখনও সব দেশে প্রচলিত আছে ছুঁচলো মুখওয়ালা বজ্রনিরোধক।

জিপসাম সিমেণ্ট

হাত পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেলে ডাক্তারবাবু প্লাস্টারের ব্যবস্থা করেন। এক ধরনের সাদা সাদা গুঁড়োকে জল দিয়ে মেখে চাপিয়ে দেওয়া হয় ভাঙ্গা জায়গার উপরে। কিছুক্ষণের ভেতরে সেটি শক্ত হয়ে পাথর হয়ে ওঠে যেন।

ঐ সাদা সাদা গুঁড়ো জিপসাম নামক এক ধরনের পাথর থেকে তৈরি করা হয়। ধবধবে সাদা খনিজ পাথর জিপসাম। ওর রাসায়নিক গঠন ক্যালসিয়াম সালফেট এবং দুটি অণু জল ($CaSO_4$, $2H_2O$)। ১২০° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় পুড়িয়ে ফেললে শতকরা ১৫ ভাগ জল বাষ্পীভূত হয়ে যায়। পরিণত হয় সাদা সাদা গুঁড়োয়। এখন ওর গঠন হয় ($CaSO_4$)$_2$, H_2O।

সাদা গুঁড়াটাকে বলা হয় প্লাস্টার অব প্যারিস। এই গুঁড়োটির প্রধান গুণ, সাধারণ তাপমাত্রায় সহজে জলকে শোষণ করে নিয়ে সিমেন্টের মত শক্ত জিপসামে পরিণত হয়ে যায়। তাই ঢালাই-র কাজে, ভাস্কর্যে, হাত পা ভাঙ্গলে প্লাস্টার করতে, কখনও কখনও ঘরের মেঝেকে সুন্দর করতে কেউ কেউ এটা ব্যবহার করেন।

জিপসামকে অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ ব্যবহার করে আসছে। সাদা চকখড়ির মত দেখতে বলে এটির নামকরণ করা হয়েছিল জিপসাম। শব্দটি গ্রীক শব্দ জিপসাম থেকে নেওয়া। নামকরণ করেছিলেন প্রখ্যাত গ্রীকবিজ্ঞানী থিওফ্রেসটাস।

থিওফ্রেসটাসের বহু আগে থেকেই জিপসাম ব্যবহার হয়ে আসছে। মনে হয়, ওটিকে সর্বপ্রথম প্লাস্টারের কাজে ব্যবহার করেছিল প্রাচীন মিশর। কে যে এর বৈশিষ্ট্যটুকু প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন—তা জানা যায় না। জিপসামকে তারা যে কী বলতো, তাও বলার উপায় নেই। কেবল একে পুড়িয়ে ফেললে যে সাদা গুঁড়োয় পরিণত হয় এবং সেই গুঁড়োকে জল মাখিয়ে ইট বা পাথর গাঁথলে শক্ত হয়ে বসে যায়—এই সত্যটি আবিষ্কার করেছিল। জল না দিয়ে কেবল গুঁড়ো দিয়ে গাঁথলেও শক্ত হয়ে যায়। কেন না ঐ গুঁড়ো জলকে আকর্ষণ

করেও জমাট বাঁধতে পারে।

ঐ গুণটি মিশরীয়রা আবিষ্কার করেছিল বলেই সেকালে তারা এমন উঁচু উঁচু পিরামিড গড়তে পারতো। যে পিরামিড আজকের দিনেও আমাদের কাছে অন্যতম এক আশ্চর্যরূপে পরিগণিত। এর গাঁথুনি এমন মজবুত যে আজ প্রায় চারহাজার বছর ধরে অক্ষত আছে। ভবিষ্যতেও বহুকাল থাকবে।

প্রকৃতিতে তিন ধরনের জিপসাম পাওয়া যায়। সেলেনাইট, অ্যালাবাসটার ও সাটিনস্পার। সেলেনাইট স্বচ্ছ পাথর এবং মূল্যবান। সাটিনস্পার আঁশযুক্ত এবং অ্যালাবাস্টার অস্বচ্ছ সাদা পাথর। গাঁথুনির কাজে ঐ অ্যালাবাস্টরই ব্যবহার করা হয়। মিশরীয়রাও ব্যবহার করতো অ্যালা-বাস্টারকে। পিরামিডের তলায় ফ্যারাওদের মমির পাশে অ্যালাবাস্টারের তৈরি বহু বোতল পাওয়া গেছে। সেকালে ওর যে যথেষ্ট মূল্য ছিল তার প্রমাণ এটি। মিশরীয় সম্রাট বা ফ্যারাওরা সাধারণ জিনিস ব্যবহার করতেন না কিনা!

গ্রীক রোমান আমলে জিপসামের চথেষ্ট চাহিদা ছিল। বিশেষ করে রোমানরা বিলাসী ও সৌন্দর্যপ্রিয় হওয়ায় বড় বড় অট্টালিকা গড়েছিল। গাঁথুনির উপাদান এত জিপসাম লাভ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই জিপসাম ছাড়াও অন্য উপায় আবিষ্কার করেছিল। আগ্নেয়গিরির লাভার সঙ্গে চুন মিশিয়ে তৈরি করতো গাঁথুনির মশলা। ব্যবস্থাটা পাথরের সিমেন্টের মতই ছিল। অর্থাৎ সিমেন্টের যেন গোড়াপত্তন করেছিল রোমানরা।

জিপসামের গুঁড়ো ব্যয়বহুল বলে পরের দিকে সস্তায় গাঁথুনির মশলা উৎপাদন করতে অনেকে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। অনেক ব্যবস্থা অবশ্য গড়ে উঠেছিল। প্রকৃত সিমেন্টের মত পদার্থ প্রথম তৈরি করেন জোসেফ অ্যাস্পিডিন নামে ইংলণ্ডের জনৈক রাজমিস্ত্রী। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চুনের সঙ্গে মাটির গুঁড়ো মিশিয়ে মিশ্রণটিকে ভালভাবে পুড়িয়ে ফেলেন। পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন হয়েছিল এক ধরনের গুঁড়ো। ঐ গুঁড়োর সঙ্গে জল মেশাতে গিয়ে দেখা গেল, পোর্টল্যাণ্ড দ্বীপের এক ধরনের কঠিন পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠেছে। তখনই নামকরণ করা হয়েছিল পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট। এই ধরনের নামকরণের মূলে রয়েছে, সে আমলের বিশেষ ব্যবস্থা। ইংলণ্ডে দালান তৈরির জন্য বয়ে আনা হতো পোর্টল্যাণ্ড দ্বীপ থেকে শক্ত পাথর। জোসেফ অ্যাস্পিডিনের তৈরি গাঁথুনির মশলা অনুরূপই হয়েছিল।

বর্তমানে পদ্ধতিটির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। একভাগ পরিষ্কার কাদা মাটি এবং তিনভাগ চুনাপাথরকে নিয়ে উত্তমরূপে গুঁড়ো করা হয়। সেই গুঁড়োকে এবার জলের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করা হয় লেই-র মত জিনিস। তারপর একটা বিশেষ ধরনের ঘূর্ণায়মান চুল্লীতে ১৪০০° সেণ্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করা হয়।

প্রচণ্ড তাপে মিশ্রণটি গলে যায় এবং কাঁকরে পরিণত হয়। কাঁকরগুলো ঠাণ্ডা হলে গুঁড়ো করা হয়। ঐ গুঁড়োই সিমেণ্ট।

সিমেণ্ট সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম সিলিকেট ও ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেটের মিশ্রণ। মিশ্রণের প্রধান প্রধান যৌগ যথাক্রমে ট্রাইক্যালসিয়াম সিলিকেট, ক্যালসিয়াম অর্থোসিলিকেট ও ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট। এগুলো ছাড়া কিছু কিছু ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডও থাকে।

স্কার্ভিরোগ ও ভিটামিন সি

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভৌগোলিক আবিষ্কারের জন্য সাড়া পড়ে গিয়েছিল পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে। প্রায় সব দেশই অংশগ্রহণ করেছিল এতে। সোনাদানা, অর্থসম্পদ, যশ-প্রতিপত্তি ইত্যাদি লাভের জন্য দুঃসাহসী নাবিকদেরও অভাব হয়নি। রূপকথার রাজপুত্ররা যেমন রাজকন্যার খোঁজে সাতসমুদ্র তের নদী পেরিয়ে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়াতেন, তেমনই সেই নাবিকরাও সাগরগর্ভে লুকিয়ে থাকা কোন দেশের খোঁজে অথবা দূরবর্তী দেশসমূহের সঙ্গে জলপথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য মাসের পর মাস ধরে কেবল এগিয়ে যেতেন। অনেক সময় খাদ্যে তাঁদের ঘাটতি ঘটতো, তবুও আশায় আশায় বুক বেঁধে জীবনমরণ পণ করে অর্ধাহারে কাল কাটিয়েও এগিয়ে যেতেন।

দীর্ঘকাল সাগরে সাগরে ঘোরাফেরা করার ফলে নাবিকদের ভেতরে এক ধরনের রোগ দেখা দিতো। রোগটা ভারি সাংঘাতিক। প্রথম প্রথম দাঁতের মাড়ি ফুলতো, তারপর ফোলাটা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে ঝুলে এসে দাঁতগুলোকে ঢেকে ফেলতো। কেবল তাই নয়, ফোলা অংশটা একসময় ফেটে গিয়ে প্রচুর রক্তপাত ঘটাতো। সে কী যন্ত্রণা! যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে হয়ে একদিন মারা যেতেন সেই সব নাবিক। সে এক আতঙ্ক!

শোনা যায়, ভাস্কো-ডা-গামা—যিনি ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁরও বহু নাবিক প্রাণ হারিয়েছিলেন এই রোগে।

রোগটি কেন হয় তার কারণটা কিন্তু কেউ জানতেন না। পরিচিত ছিল স্কার্ভি নামে। প্রধানতঃ নাবিকদেরই হতো। অন্যান্যদের মধ্যে তত ব্যাপক ছিল না।

স্কার্ভির ভয়াবহতা দেখে পাশ্চাত্যের চিকিৎসকরা চিন্তিত হলেন। তাঁরা

স্কার্ভিরোগে আক্রান্তদের নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। কিন্তু সে সময় চিকিৎসাশাস্ত্র আদৌ উন্নত ছিল না, ছিলনা আজকের মত এমন সুক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। তাই বহুদিন ধরে বহু চিকিৎসক আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন।

অতঃপর জেমস ল্যাঙ্কাস্টার নামে একজন ইংরাজ চিকিৎসক কী ভেবে নাবিকদের খাদ্য নিয়েই শুরু করলেন গবেষণা। তাঁর যেন মনে হলো, নাবিকেরা মাসের পর মাস সমুদ্রে ভেসে থাকেন, নির্দিষ্ট খাদ্য ছাড়া অন্য খাদ্য গ্রহণ করার সুযোগ পান না, অনেক সময় একটি বা দুটি খাদ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। এই কারণে খাদ্যের কোন কোন উপাদানে ক্রমাগত ঘাটতি ঘটে। কোন একটি বিশেষ উপাদানের ঘাটতির জন্য রোগটা হয়না তো?

বেশ কিছুদিন ধরে নাবিকদের খাদ্যকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করলেন নাবিকদের এবং তাঁদের চিরাচরিত খাদ্যাভ্যাসের কথাও জানলেন। অপরদিকে স্কার্ভি রোগাক্রান্তদের খাদ্য তালিকাটাও পরীক্ষা করলেন। অবশেষে কী ভেবে স্কার্ভি রোগাক্রান্ত নাবিকদের খুব বেশী করে লেবু খেতে দিলেন।

অদ্ভুত ফল পেলেন জেমস ল্যাঙ্কাস্টার। নাবিকদের রোগটা ধীরে ধীরে আরোগ্যের দিকে গেল, মরতে হলো না কাউকে। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর পরীক্ষার কথা এবং সব নাবিককে প্রচুর পরিমাণে লেবু খেতে বললেন। তিনি আরও জানালেন, নাবিকরা যদি প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় লেবুকে অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহলে তাঁদের স্কার্ভি রোগ হবে না।

জেমস ল্যাঙ্কাস্টারের গবেষণা অনেককে উৎসাহিত করলো। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এবার রোগীর পরিবর্তে রোগের প্রতিষেধক লেবুকে নিয়ে গবেষণা জোরদার করলেন। কিন্তু কোন হদিস পেলেন না কেউ। শুধু ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ক্র্যমার নামে অস্ট্রিয়ার একজন সামরিক চিকিৎসক জানালেন, যে কোন ধরণের লেবু স্কার্ভি রোগের প্রতিষেধক। অর্থাৎ জেমস ল্যাঙ্কাস্টারকে সমর্থন করলেন তিনি।

এরপরে আর গবেষণা বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। প্রতিষেধক হিসেবে পেয়ে একরকম তৃপ্ত ছিলেন সবাই। আর চিকিৎসকরাও এন্তার ব্যবস্থাপত্র দিয়ে চললেন লেবুর। এরকম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত চলে এসেছিল সেই একই ব্যবস্থা।

১৮৯০ সালে বিজ্ঞানী আইখম্যান নতুন করে শুরু করলেন স্কার্ভি রোগ সম্বন্ধে গবেষণা। গবেষণা চালালেন বেশ কতকগুলো মুরগীর উপর। মুরগীগুলোকে কয়েকটা দলে ভাগ করে এক একটা দলকে বিশেষ এক এক ধরণের খাদ্য খাওয়াতে লাগলেন। কিছুদিন পরে দেখলেন, একটি দল বেশ দুর্বল। কয়েকটি দল মোটামুটি ভাল অবস্থায় আছে, মাত্র একটি দলের মুরগীরা বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু মুরগীদের মধ্যে স্কার্ভি রোগ সৃষ্টি করতে পারলেন না।

রোগ সৃষ্টি করতে না পারায় রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয়েও ব্যর্থ হলেন। তবে তিনি জানালেন, এক বিশেষ ধরণের খাদ্য মুরগীকে খাওয়ালে মুরগী দ্রুত বেড়ে উঠে এবং রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতাও লাভ করে। তিনি খাদ্যের নাম জানালেন বটে, তবে সেই খাদ্যের উপাদান যে প্রকৃতপক্ষে কী, তা বার করতে পারলেন না।

আইখম্যানের পরীক্ষা প্রভাবিত করলো ডঃ ক্যাসিনির ফ্রাঙ্ক নামে একজন বিজ্ঞানীকে। তিনিও মুরগীদের উপর চালালেন পরীক্ষা। রোগের কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না বটে, তবে একটা মহৎ উপকার সাধিত হলো তাঁর দ্বারা। খাদ্যের মধ্যে প্রাণশক্তির উপাদান তথা ভাইটাল অংশ নিয়ে গবেষণা করতে করতে একদিন আবিষ্কার করলেন অ্যামাইন। এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ এবং এই প্রথম প্রমানিত হলো, খাদ্যের মধ্যে একটা বিশেষ ভাইটাল দিক আছে—যা শরীরকে সুস্থ রাখে এবং বৃদ্ধির সহায়ক। ডঃ ম্যাক্স নিরেনস্টেন নামে এক বিজ্ঞানী ঐ ভাইটাল অ্যামাইনের একটা সংক্ষিপ্ত নামকরণ করলেন। নাম দিলেন ভিটামিন। প্রকৃতপক্ষে সেই থেকে ভিটামিন কথাটার উৎপত্তি। বাংলায় বলা হয় খাদ্য প্রাণ।

এত কান্ড ঘটলো, তবু স্কার্ভি রোগ সমস্যাটা সমস্যাই থেকে গেল। শেষে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সমস্যার সমাধান করলেন হোস্ট এবং ফ্রলিক নামে দুজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী। এঁরা দুজনে একই সঙ্গে একপাল গিনিপিগের উপর পরীক্ষা চালিয়েছিলেন এবং সামর্থ হয়েছিলেন গিনিপিগদের মধ্যে স্কার্ভি রোগ আনাতে।

স্কার্ভি-রোগাক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য তাঁরাও অবলম্বন করলেন প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতি—লেবুর রস। ওতেই আরোগ্য লাভ করলো গিনিপিগরা। তখনই শুরু হলো লেবুকে নিয়ে পরীক্ষা—ওর খাদ্যগুণ যাচাই করা।

এবার আর বিলম্ব হলোনা। অল্পকালের ভেতরেই ধরা পড়লো, লেবুতে থাকে ভিটামিন সি। ঐ ভিটামিন সি-ই হচ্ছে স্কার্ভির প্রতিষেধক এবং খাদ্যে ভিটামিন সি-র ক্রমাগত ঘাটতি ঘটলে স্কার্ভি রোগ দেখা দেয়।

এখন স্কার্ভিকে আর কেউ ভয় করে না। ভিটামিন সি-কেও সংশ্লেষনী পদ্ধতিতে তৈরি করা যাচ্ছে।

সেফটিরেজার

বোস্টন শহরে বাস করতেন এক ভদ্রলোক। নাম তাঁর জিলেট। ভদ্রলোক ব্যবসার মাধ্যমে অর্থবান হতে চাইলেন। কিন্তু কী ব্যবসা করবেন!

যেমন তেমন ব্যবসা জিলেটের পছন্দ নয়। ভাবলেন, এমন নতুন কিছু একটা তৈরি করবেন, যার কোন প্রতিযোগী থাকবে না এবং সব জায়গায় বাজার পাবেন।

কিন্তু কী তৈরি করবেন তিনি?

অনেক ভাবনাচিন্তার পর দাড়ি কামানোর ক্ষুরের দিকে নজর পড়লো তাঁর। হ্যাঁ, তাইতো! দাড়ি কামানোর ঝামেলা অনেক। সবাই নিজ হাতে নিজের দাড়ি কামাতে পারে না, নাপিতের তোষামদ করতে হয়, নয়ত হাতের কাজ ফেলে সেলুনে ধর্না দিতে হয়। নিরাপদ কোন ক্ষুর তৈরি করা যায় না কি? যা সবাই ব্যবহার করতে পারবে, আনাড়ি হাতেও দাড়ি কেটে ফ্যালা ফ্যালা হয়ে যাবে না এবং দাড়ি কামানোতে ক্ষুরের চেয়ে আরাম বোধ হবে! আর এমন একটা সরঞ্জাম আবিষ্কার করতে পারলে নির্ঘাৎ দু-পয়সার মুখ দেখা যাবে।

খুব করে ভাবলেন জিলেট সাহেব। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। শেষে খাড়া করলেন তেমন ক্ষুরের একটা মডেল।

জিলেট সাহেব কিন্তু প্রযুক্তিবিদ ছিলেন না। তাই মডেল একটা তৈরি করলেও পারলেন না মডেলটাকে বাস্তবে রূপ দিতে। তাহলে কী করা যাবে? জিলেট সাহেবের মনে হলো, যোগ্য একজন কারিগর যদি পাওয়া যায় তাহলে ব্যাপারটার সুরাহা হতে পারে।

জিলেট সাহেব এবার মনে মনে খোঁজ করতে শুরু করলেন এক যোগ্য প্রযুক্তিবিদকে।

ঠিক সেই সময় বোস্টন শহরে এক বিজ্ঞান সম্মেলনের আহ্বান জানানো হলো। সম্মেলনে যোগদান করতে আমন্ত্রণ জানানো হলো বহু বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদকে। নতুন কোনকিছুর মডেল এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রদর্শনেরও সুযোগ দেওয়া হলো।

জিলেট সাহেব সুযোগটা হাতছাড়া করলেন না। হাজির হলেন বিজ্ঞান সভায় এবং প্রদর্শন করলেন তার মডেলটি, কিন্তু মডেলটির প্রতি তেমন উৎসাহ দেখা গেলনা কারও।

সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন এক তরুণ প্রযুক্তিবিদ। নাম তাঁর নিকারসন—মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। জিলেটের মত তিনিও স্বপ্ন দেখতেন হাতে নাতে কিছু করার জন্য এবং একচেটিয়া ব্যবসার দিকে ছিল ভয়ানক আগ্রহ। জিলেট প্রদর্শিত মডেলটির প্রতি একমাত্র তিনিই আকর্ষণ বোধ করলেন।

সভার কাজ শেষ হলো। জিলেট সাহেব ভগ্নোৎসাহে বেরিয়ে এলেন হল থেকে। আর তখনই তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন নিকারসন। বললেন—আপনার মডেলটি আমার খুবই পছন্দ। আপনার অসুবিধার কথাও জেনেছি আপনার বক্তব্য থেকে। আমি এই মডেলটাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেষ্টা করবো

—যদি আপনি আমার উপর আস্থা রাখেন।

প্রস্তাবটি জিলেট সাহেবকে খুবই খুশি করলো। জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কী বিজ্ঞানী?

নিকারসন বললেন—না, একজন প্রযুক্তিবিদ—মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়র। জিলেট সাহেব আরও খুশি হলেন এবং অম্লান বদনে মডেলটি তুলে দিলেন নিকারসনের হাতে।

নিকারসন মডেল অনুযায়ী নতুন যন্ত্র বানাতে মন প্রাণ উজাড় করে দিলেন। তৈরি করতে গিয়ে এক আধটু অসুবিধারও সম্মুখীন হলেন এবং জিলেটের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যাগুলোর সমাধানও করলেন। তারপর একদিন সত্য সত্যই বানিয়ে ফেললেন মডেল অনুযায়ী যন্ত্র এবং তীক্ষ্ণ ধার ব্লেড। ঝকঝকে সুন্দর যন্ত্র এবং ব্লেড দেখে খুব খুশি হলেন জিলেট। দাড়ি কামাতে গিয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যও অনুভব করলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উভয়ে ব্যবসায় নেমে পড়লেন।

ব্যবসা করতে গিয়ে বেশ অসুবিধায় পড়লেন তাঁরা। ট্যাঁক থেকে পয়সা খরচ করে যন্ত্র বানালেন, কিন্তু ক্রেতা বড় একটা পাওয়া গেল না। পুরাতন ক্ষুরকে ছেড়ে সহসা সেপটিরেজার কিনতে এলেন না কেউ। তখন তাঁরা ভাবলেন, যদি কিছু সংখ্যক যন্ত্র জনসাধরণের মধ্যে বিলি করা যায় তাহলে সবাই এর সুবিধেটুকু বুঝতে পারবে এবং তাদের দেখাদেখি অনেক লোক উৎসাহী হয়ে কিনতে এগিয়ে আসবে। আর হুহু করে বিক্রি হবে।

তাই-ই হলো। বেশ কিছু সেফটিরেজার তৈরি করে বিলিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। দীর্ঘকালের ক্ষুরের অভ্যাস পরিত্যাগ করলো না কেউ। মাথায় হাত দিলেন দুজনে।

ট্যাঁকের পয়সা শেষ; ব্যবসাও ভরাডুবি। দুজনে যখন চোখে সরষের ফুল দেখছিলেন, তখনই এক মস্তবড় ব্যবসায়ী লাভের গন্ধ পেয়ে এগিয়ে এলেন। অঢেল টাকা খরচ করে সেফটিরেজার তৈরির একটা বড় কারখানা খুলে দিলেন এবং অংশীদার রূপে গ্রহণ করলেন জিলেট সাহেব ও নিকারসনকে।

কথিত আছে, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি কারখানা চালু করেন এবং প্রথম তৈরি করেছিলেন মাত্র ৫০টি রেজার এবং ১৫৩টি ব্লেড। এই কয়েকটিকে বিক্রি করতে তাঁদের এক বছর সময় লেগেছিল।

ব্যবসায়ীটি কিন্তু হাল ছাড়লেন না। একই সঙ্গে প্রচার ও বিক্রি দুইই চালিয়ে যেতে লাগলেন।

চার বছর পরে লাভের মুখ দেখলেন সবাই। ব্যবসা একেবারে তুঙ্গে উঠলো। সে বছর এক লক্ষ রেজার এবং দেড় লক্ষ ব্লেড বিক্রি হয়ে গেল।

চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়েই চললো। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের দিকে সেফটি-রেজার এবং ব্লেডের চাহিদা এত বেড়ে উঠলো যে, একটি মাত্র ব্যবসায়ী

প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যোগান দেওয়া সম্ভব হলোনা। ততদিনে নানা দেশ থেকে এসে গেল প্রচুর চাহিদা। তাই অন্যান্য দেশও শুরু করলো সেফটিরেজার উৎপাদন। আর সেই থেকে আবিষ্কারক হিসেবে জিলেট সাহেবের নামও সাধারণের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো। এখনও জিলেট সেফটিরেজার এবং ব্লেড পাওয়া যায়।

গ্যাসমুখোস

আজকের যুদ্ধক্ষেত্রে হামেশাই গ্যাসমুখোস ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া যেসব কারখানায় বিষাক্ত গ্যাস ও ধুলোবালির মধ্যে কাজ করতে হয়—সেই-সব কারখানার শ্রমিকরা, খনির শ্রমিকরা, দমকলের কর্মীরা এবং কোন কোন সময় পুলিশও ব্যবহার করেন গ্যাস মুখোস। গ্যাসমুখোস মুখে পরে নিলে বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে মৃত্যু ঘটতে পারে না।

গ্যাসমুখোস আবিষ্কারের পেছনে আছে জার্মানদের অবদান এবং আবিষ্কার করা হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের দিকে রসায়ন বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। একদিকে যেমন আবিষ্কৃত হয় নানা মৌলিক ও যৌগিক জনহিতকর পদার্থ, অপরদিকে তেমনই বিজ্ঞানীদের হাতে আসে হরেকরকমের বিষাক্ত পদার্থ। মানুষ ক্ষমতাকে জাহির করতে এবং অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চিরকাল বিজ্ঞানকে নিয়োগ করে আসছে। এবার মারাত্মক গ্যাস ইত্যাদির পরিচয় পেয়ে অতি অল্পে শত্রু সৈন্যদের ঘায়েল করতে বিষাক্ত গ্যাসগুলোকেই ব্যবহার শুরু করলো। গোপনে যুদ্ধক্ষেত্রে নানা ধরণের বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে যেতো, শত্রু পক্ষের সৈন্যরা সেখানে পা দিলেই গ্যাসের ক্রিয়ায় অল্পেই মারা যেতো। তাই বিষাক্ত গ্যাস, ধোঁয়া ইত্যাদি থেকে সৈন্যদের রক্ষা করতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ই পরিকল্পনা করা হয়েছিল গ্যাস মুখোসের।

কথিত আছে, গ্যাস মুখোসের পরিকল্পনা করেছিলেন ফ্রিটজ হাবার—সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সংশ্লেষণী পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া তৈরি করেছিলেন এবং ঐ কারণে জগৎজোড়া সুনামও অর্জন করেছিলেন। ঐ জন্য তিনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে লাভ করেছিলেন নোবেল পুরস্কার।

হাবার পরিকল্পনা করেছিলেন বটে, কিন্তু পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেননি। বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁর এক বন্ধুকে অনুরোধ করেন। বন্ধুটির নাম রিচার্ড উইলস্টেটর।

রিচার্ড উইলস্টেটরও ছিলেন সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসায়ন বিজ্ঞানী। ইনি সেই উইলস্টেটর—যিনি ক্লোরোফিল সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য আবিষ্কারের জন্য ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। বন্ধুর পরিকল্পনাকে সমর্থন করলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গবেষণা শুরু করেছিলেন।

আবিষ্কার করতে উইলস্টেটরের মত এক প্রখ্যাত রসায়নবিদের খুব বেশী বেগ পেতে হয়নি। অচিরেই বানিয়ে ফেললেন মুখ ঢেকে রাখার জন্য এক ধরণের আবরণ, তথা মুখোস। বিষাক্ত গ্যাস শোষণ করতে যার জুড়ি নেই —সেই কাঠ কয়লার গুড়োকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন অন্যান্য কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ।

গুঁড়োকে তো আর নাক মুখে চাপালে হবে না। তাই একটা বিশেষ ধরণের পুরু পর্দা তৈরি করেছিলেন। সেই পর্দাটা এমন ছিল যে, পর্দা ভেদ করে গুঁড়োগুলো বার হতে পারতো না। অথচ বাতাসটাকে ছাঁকনির মত ছেঁকে নিয়ে নাকের সামনে হাজির করা তো।

যুদ্ধ এমন এক বীভৎস প্রতিযোগিতা—সেখানে এক মারণাস্ত্রকে টেক্কা দিতে আর এক জোরালো মারণাস্ত্র সব সময় প্রস্তুত হয়েই আছে। এই প্রতিযোগিতার শেষ নেই। সম্ভবতঃ মানবসভ্যতার ইতিহাসে চিরকালই অব্যাহত থাকবে এই প্রতিযোগিতা। গ্যাস মুখোসের ক্ষেত্রেও তাই শুরু হয়ে গেল প্রতিযোগিতা। এমন সব বিষাক্ত জিনিস ছড়ানো হতে লাগলো— যা কাঠ-কয়লার গুঁড়োর দ্বারা শুদ্ধ হয় না। তখন অন্য ধরণের গ্যাস মুখোস তৈরির দিকে যত্নবান হতে হলো। এমনি করে বিষাক্ত গ্যাসের চরিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের গ্যাস মুখোস আবিষ্কৃত হলো একে একে।

শুধু যুদ্ধ ক্ষেত্রে নয়, বিভিন্ন কারখানা ইত্যাদিতে নিরাপত্তার জন্যও আবিষ্কৃত হয়েছে গ্যাস মুখোস। তাই আজ সর্বক্ষেত্রে গ্যাস মুখোস মানুষের নিরাপত্তার সহায়ক। বহুল ব্যবহৃত গ্যাসমুখোসগুলোর উপাদান (১) সেলুলোজ কিংবা অ্যাসবেটাস তন্তুর পর্দা। বাতাসে ধূলাবালি এবং প্রলম্বিত কোন বিষাক্ত কণা থাকলে ব্যবহার করা হয়। (২) কাঠকয়লা গুঁড়োর তৈরি পর্দা। বায়ুতে অবাঞ্ছিত কোন জৈব গ্যাস উপস্থিত থাকলে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। (৩) ক্ষার জাতীয় পর্দা। বাতাসে যদি কোন অ্যাসিড বাষ্প মিশে থাকে তাহলে পর্দার ভেতরে ক্ষারকে রাখা হয় এবং ক্ষারের সংস্পর্শে এসে অ্যাসিড প্রশমিত হয়ে যায়। (৪) বাতাসে কারবন মন অক্সাইডের উপস্থিতি ধরা পড়লে পর্দার মধ্যে ব্যবহার করা হয় ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড ও ফেরিক অক্সাইডের মিশ্রণ (৫) যদি পরিবেশে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তাহলে তামার লবণ ভর্তি পর্দা।

এই ধরণের আরও অনেক রাসায়নিক পদার্থকে মুখোসে ব্যবহার করা হয়। তবে গ্যাস মুখোস দীর্ঘস্থায়ী নয়। কয়েকবার ব্যবহার করার পর রাসায়নিক

পদার্থগুলোর পর্দাটা অকেজো হয়ে পড়ে। ফলে নতুন করে পর্দাকে যুক্ত করতে হয় মুখোসের ভেতরে। এই মুখোসটা এমনভাবে তৈরি করা হয়—যাতে নাক, চোখ ও মুখ সব সময় মুখোসের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় এবং এটিকে বায়ু নিরুদ্ধ করা হয়। বাইরের বাতাস ছাঁকনির ভেতর দিয়ে ছেঁকেই প্রবেশ করে নাকে। অন্য কোন প্রকার বাতাস প্রবেশ করতে পারে না।

মাসরুমের খাদ্যগুণ

ঐ যে বড় বড় চাকতির মত এক জাতীয় ব্যাঙের ছাতা—যারা বর্ষাকালে এখানে ওখানে খড়ের গাদায়-বাঁশ বা কাঠের গায়ে ও উইঢিপির উপরে সহসা দল বেঁধে গজিয়ে উঠে, যাদের গালভরা বৈজ্ঞানিক নাম ভলভারিয়েল্লা ভলভেসিয়া অ্যাগারিকাস বাইশ পোরাস, প্লিয়োরোটাস প্রভৃতি তাদের মধ্যে পাওয়া গেছে প্রচুর খাদ্যগুণের পরিচয়। ঐ ছাতা ক্লোরোফিল বিহীন মৃতজীবী উদ্ভিদ। চলতি কথায় ওদের ব্যাঙের ছাতা বলি, বিজ্ঞানের কথায় মাসরুম।

সব রকমের মাসরুম খাদ্যের উপযোগী নয়। কাঠ বা বাঁশের ছাতা বিষাক্ত। খড়ের ছাতা বা পোয়াল ছাতাকে মানুষে খায়, আর খায় উইঢিবির গায়ে গোল গোল টাকার মত যেসব ছাতা জন্মায়। ওদের কৃত্রিমভাবে চাষও করা যায় এবং খাদ্যগুণে এত সমৃদ্ধ যে, মাছ-মাংসের মত প্রাণীজ প্রোটিনও ওর কাছে লজ্জা পায়।

তবু মাসরুমের প্রতি এখনও অনেকের বিস্তর অবহেলা। এখনও বিত্তবানরা মাসরুমের নাম শুনলে নাসিকা কুঞ্চন করেন, নিকৃষ্ট বলে দূরে সরিয়ে রাখেন বা হাতে করতে তাঁদের আভিজাত্যে আঘাত লাগে। তাঁদের মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ কেবল মাছ-মাংসের প্রতি। কিন্তু তাঁরা কী জানেন, তাঁদের মতে ঐ নিকৃষ্ট ও অনভিজাত খাদ্যটা এককালে পৃথিবীর সমূহ সভ্য দেশে দেব দুর্লভ খাদ্য রূপে পরিচিত ছিল?

সে এক ইতিহাস। মাসরুমের খাদ্যগুণ আজকের আবিষ্কার নয়। আজ থেকে অনেক—অনেকদিন আগে, প্রায় চার পাঁচ হাজার বছর আগে তৎকালীন পৃথিবীর একমাত্র বিলাসী ও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী মিশরীয় সম্রাট বা ফ্যারাওরা মাসরুমকে গ্রহণ করতেন মূল্যবান খাদ্য হিসেবে। অথচ সেকালে খাদ্যের গুণাগুণ নির্ণয়ের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ছিল না, প্রোটিন ও অ্যামিনো অ্যাসিড সম্বন্ধে কারও ধারণা ছিল না, ধারণা ছিল না পুষ্টি

বিষয়ে। তথাপি কেন যে মাসরুমকে অভিজাত খাদ্যের তালিকায় ফেলেছিল সে কথা বলা দুষ্কর।

মাসরুমকে সেকালে কৃত্রিমভাবে চাষ করা যেতোনা। প্রকৃতিতে যে স্বল্প পরিমাণ জন্মাতো তাকেই রাজভোগের জন্য সংগ্রহ করে আনা হতো। সেদিনের ধারণা ছিল, রাজা হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি। প্রজারা দেবতাকে যেমন পুজো করতো, তেমনই রাজাকেও পুজো করতো, পুজো করতো দেবতা ও রাজার খাদ্য বলে পরিচিত মাসরুমকে। দেবার্চনায় হয়ত নৈবেদ্য হিসেবে মাসরুমকে নিবেদন করা হতো কিন্তু তাকে গ্রহণ করার রীতি সাধারণের ছিল না। সে নৈবেদ্য কেবল গ্রহণ করতে পারতেন রাজা এবং পুরোহিত বর্গ।

মিশরীয় সভ্যতার পরে গ্রীক সভ্যতার যুগেও মাসরুমের আভিজাত্য কমেনি। গ্রীকরা ছিলেন ভারি পণ্ডিত। ঐ সুখাদ্যটি তাঁরা আদৌ অবহেলা করেন নি, সম্ভবতঃ সাধারণকেও স্বাদ গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। খাদ্য হিসেবে যে মাসরুমকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে সেই অ্যাগারিকাস শব্দটি এসেছে গ্রীক অ্যাগ্রিকম শব্দ থেকে।

গ্রীকদের পরে শুরু হয় রোমানদের যুগ। পুনরায় মাসরুমের উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। রোম সম্রাটগণ এবং রোমের অভিজাত সম্প্রদায় মাসরুম খাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন। রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছিলেন একমাত্র রাজা এবং সৈন্যাধ্যক্ষরাই মাসরুম খাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি, অপর কেউ নয়। সম্রাটের আদেশ পালিতও হয়েছিল।

মিশরীয় আমল থেকে রোমান আমল পর্যন্ত মাসরুমের উপর আরোপিত নানা বিধিনিষেধকে অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত নানা সংস্কার এসে ভর করেছিল সাধারণের মনে। সেই সংস্কারগুলো আরও বদ্ধমূল হয়েছিল ইউরোপে ধর্মান্ধতার যুগে। এর জন্য সম্ভবতঃ সেদিনের পুরোহিত সম্প্রদায়ই দায়ী। সুখাদ্যটাকে কেবলমাত্র নিজেদের ভোগে রাখার জন্য চাপিয়ে দিয়েছিলেন ধর্মের নামে বিধিনিষেধ। যে বিধিনিষেধ চলে এসেছিল সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত। মাসরুমকে খাওয়া হতো না, অর্পন করা হতো গীর্জায়।

ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে প্রথম মাসরুমকে মুক্ত করেছিল ফ্রান্স। কথিত আছে, মাসরুমের পুষ্টিগুণ লক্ষ্য করে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্স ওকে রীতি-মত চাষ করেছিল। যদিও আজকের মত মাসরুমের বীজ বা মূল সংগ্রহ করে এবং তাকে ছড়িয়ে কৃত্রিমভাবে চাষ করতোনা। বর্ষাকালে এখানে ওখানে খড়-পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করে পচিয়ে ফেলতো, তাতেই আপনা হতে গজিয়ে উঠতো মাসরুম। চীন দেশীয় পণ্ডিত সু টিং চ্যাং এর মতে একই উপায়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে চীন প্রচুর পরিমাণে মাসরুম উৎপাদন করতো।

এও সত্য যে, মাসরুম চাষের প্রতি প্রথম উৎসাহিত হয়েছিল পাশ্চাত্যের দেশগুলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর খাদ্যের ঘাটতি ঘটায় ইওরোপীয় দেশগুলোর পুষ্টি বিজ্ঞানীরা একযোগে মাসরুম চাষের সুপারিশ করেছিলেন। চাষও শুরু হয় এবং মাংসের বিকল্প হিসেবে ধনী দরিদ্র সবাই গ্রহণ করতে শুরু করেন। তারপর ইওরোপ থেকে আমেরিকা ও প্রাচ্যের জাপানে ছড়িয়ে পড়ে মাসরুম চাষ।

ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বর্ষাকালে এখানে ওখানে পচা খড়ের গাদায় গজিয়ে উঠে মাসরুম। তাদের অবহেলা ভরে অনেকেই পরিত্যাগ করতেন, গ্রামের দরিদ্র মানুষের খাদ্য বলে উপহাস করতেন, হয়ত অপকারী বলেও মনে করতেন কেউ কেউ। এই ধারণাকে নস্যাৎ করেন প্রখ্যাত ভারতীয় ছত্রাক বিজ্ঞানী ডঃ সহায়রাম বসু। তিনি দীর্ঘকাল ধরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জাত ছত্রাককে নিয়ে গবেষণা করেন। এমনকি উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদের কাছে উইঢিবিতে জাত ছত্রাককে নিয়েও দীর্ঘ-গবেষণা করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঘোষণা করেন, ভারতে পুষ্টিকর খাদ্যের বিকল্প হিসেবে উইঢিবির ছাতা, পোয়াল ছাতা ইত্যাদিকে ব্যবহার করা যায়। মাসরুমের চাষ করলে ভাল ফসলও যে পাওয়া যাবে—এমন তথ্যও তিনি প্রদান করেছিলেন।

দুঃখের বিষয়, সহায়রামের গবেষণা চতুর্দিকে স্বীকৃতি লাভ করলেও ভারতীয় জনগণ মাসরুম চাষের প্রতি কোন আগ্রহ প্রদর্শন করেন নি। ভারতে প্রথম মাসরুম চাষের প্রবর্তন করেন এক বিদেশী থমাস এট অল। তিনি কোয়েম্বাটোরে চাষ করেছিলেন এবং প্রচুর ফলনও পেয়েছিলেন।

পুষ্টিকর খাদ্য ঐ মাসরুমের প্রতি অবহেলা এখনও ভারতের অনেকের। অভিজাতদের খাবার টেবিলে এখনও স্থান করে নিতে পারেনি মাসরুম। অথচ আজকে আমাদের জাতীয় সরকার থেকে বিজ্ঞানী পর্যন্ত সবাই মাসরুমকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে বলছেন, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে, বিনামূল্যে বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে, তবু আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বাজারে ওকে কালেভদ্রে দেখা যায় এবং ক্রেতার সংখ্যাও নিতান্ত কম।

যাঁরা এখনও মাসরুমকে অবহেলা করে দূরে সরিয়ে রেখেছেন, আভিজাত্যে আঘাত লাগবে বলে যাঁরা ইচ্ছে থাকলেও কিনতে পারেন না, যাঁরা মাসরুমের খাদ্যগুণ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত নন, তাঁদের প্রথমেই মনে করা উচিত এটি একটি অতি বিশুদ্ধ খাবার। এতে ভেজাল এতটুকু নেই।

আজকের বাজারের কোন সব্জি, মাছ, ডিম, মাংস দুধ প্রভৃতির কোনটিই ত্রুটি মুক্ত নয়। সব্জিতে আছে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অবশেষ। ডিম ও মুরগীর মাংসে ডি. ডি. টি বা গ্যামাক্সিনের কণা, গোয়ালারা ইনজেকশন দিয়ে গাভী দোহন করে এবং অধিক দুধ আদায় করতে নানা ধরণের কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ায় ও ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

অথচ মাসরুমকে চাষ করতে হলে কোন রাসায়নিক সারের দরকার হয়না,

দরকার হয়না কীটনাশক ছড়াবার। বীজ ছড়ালে আপনি আপনি বিকশিত হয়। যে কোন খড়, পাতা ইত্যাদি পচে উঠলেই হলো। কয়েকদিনের ভেতরেই গড়ে তোলে কলোনী। খরচও নেই বললে চলে—একটু পরিচর্যা—এইমাত্র। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সাত মাস ধরে ওর চাষ করা যায়। ফসল উঠতে সময় লাগে এক মাসেরও কম। তাই একই জায়গা থেকে সাতবার ফসল তোলা সম্ভব হয়।

মাসরুমের খাদ্যগুণের পরিচয় দু-এক কথায় দেওয়া যায় না। একে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এতে ফ্যাটের পরিমাণ নিতান্ত—0°2—এর মত। শর্করা জাতীয় উপাদান নামে মাত্র। তাই মেদ বহুল শরীর যাঁদের তাঁরা নির্ভয়ে খেতে পারেন। ওকে খেলে দেহের চর্বির পরিমাণ কমে অথচ পুষ্টি গুণ বজায় থাকে। অপর পক্ষে শর্করার ভাগ অল্প বলে ব্লাড সুগারের রোগীরা গ্রহণ করলে কোন ক্ষতির সম্ভানা থাকে না।

মাসরুম প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজ উপাদানে সমৃদ্ধ। আরও মজার কথা, মাসরুমের প্রোটিনের শতকরা ৯০ ভাগ আমাদের শরীর কাজে লাগাতে পারে। মাছ-মাংসের প্রোটিনের এতটা আমরা হজম করতে পারি না। অনেকখানি অপাচ্য হিসেবে থেকে যায় এবং বর্জ্য পদার্থের আকারে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

মাসরুমের প্রোটিনকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ওতে ২০টির মত অ্যামিনোঅ্যাসিড বিদ্যমান। প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোর সবই অল্প বিস্তর আছে। বিজ্ঞানীরা তুলনা করে দেখেছেন, এর পুষ্টি মূল্য দুগ্ধ-জাত পনিরের দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশী।

মাসরুমে ক্যারোটিন না থাকায় ভিটামিন এ. আদৌ নেই। বি শ্রেণীর ভিটামিন, ভিটামিন সি ও ভিটামিন ডিতে একেবারে সমৃদ্ধ যাকে বলে। বি শ্রেণীর ভিটামিনগুলোর মধ্যে থিয়ামিন বা ভিটামিন বি১, রাইবো ফ্লেভিন বা ভিটামিন বি২ এবং নিয়াসিন বা ভিটামিন বি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। আর আছে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড বা ভিটামিন সি। দামী দামী মরসুমী ফলেও এতটা ভিটামিন সি থাকে না।

সবচেয়ে বড় কথা মাসরুমের টোকোফেরল বা ভিটামিন ই.। ভিটামিন ই. শরীরের পক্ষে এক অপরিহার্য উপাদান। এটিকে মাংস বা ঘি-র মত এত উচ্চমূল্যের খাবার থেকেও লাভ করা যায় না। অথচ ভিটামিন ই-র অভাবে আমাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং নানা ধরণের রোগও আক্রমণ করে। তাইতো পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে মাসরুমকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে স্কার্ভি, পেলেগ্রা ও দাঁতের ক্ষয় রোগ হয় না। অপরদিকে ঐ সব রোগে আক্রান্তরা যদি নিয়মিত মাসরুম গ্রহণ করেন, তাহলে রোগ মুক্তি ঘটে।

এত গুণ থাকা সত্তেও মাসরুম তার পূর্বের কৌলিন্য ফিরে পায়নি।

বিশেষ করে আমাদের কাছে। বাজারের নিকৃষ্ট খাদ্য গুঁড়ো দুধ, কৌটায় ভরা মাখন, শুকনো খাবার প্রভৃতির কতই না রমরমা। চোখ ঝলসানো বিজ্ঞাপনে আমরা অন্ধ। কিন্তু সবার অলক্ষ্যে, সবার অবহেলাকে বুকে নিয়ে ঐ যে মাসরুমগুলো এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে তাদের দিকে ফিরেও তাকাই না আমরা। অথচ আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশ—যেখানে সাধারণ মানুষের খাদ্যের পুষ্টিমূল্য নিতান্ত কম, যাঁদের খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ একেবারে নগণ্য, মাছ-মাংস-দুধ যাঁদের কাছে স্বপ্ন তারা অতি অল্প খরচে মাসরুম উৎপাদন ও ক্রয় করতে পারেন। একমাত্র মাসরুমই পারে, ঘরে ঘরে অপুষ্টিকে হটিয়ে পুষ্টিকে বয়ে আনতে।

যার যেমন সুবিধা, তিনি তেমন একফালি অতি ছোট জমিতে এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এন্তার মাসরুম তুলতে পারেন। অভিজাতরা এবং শহরের বাসিন্দারা এ বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলে আরও ভাল হয়। ঘরের ছাদে বা উঠোনেও চাষ করা যায় মাসরুমকে। রান্না করে খেয়ে দেখুন, খারাপ লাগবে না। একে দিয়ে স্টু, ফ্রাই, রোস্ট, চপ, পুরি, পরটা ইত্যাদি অনেকিছু অভিজাত খাবার তৈরি করা যায়। অপরদিকে সরষে, জিরে ও লংকাবাটা দিয়ে রান্না করা সাধারণ তরকারিও বেশ মুখরোচক।

তথাকথিত পুষ্টিকর খাদ্য আজ ধীরে ধীরে অধিকাংশের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। যাও পাচ্ছি, তাও কীটনাশক বিষে জর্জরিত। এমনকি বাঙ্গালীর একমাত্র খাদ্য চালেও আছে বিষ। আজ তাই ঘরে ঘরে অপুষ্টি, ঘরে ঘরে দুরারোগ্য ব্যাধি, প্রতি পরিবার চিকিৎসককে অর্থ দিতে দিতে হায়রান। এর একমাত্র কারণ যে, বাজারের তথাকথিত মুখরোচক ও রাসায়নিক পদ্ধতিতে উৎপন্ন খাদ্য বা মুখরোচক করতে রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগ হচ্ছে,—একথা কেউ একটি বারও ভেবে দেখছেন না। যতই দাম বাড়ছে ততই যেন কৌটায় ভরা গুঁড়ো দুধের প্রতি, পটল-বেগুন-উচ্ছের প্রতি, পোলট্রীর ডিম ও মাংসের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে চলেছে। অথচ আশ্চর্য যার পুষ্টি মূল্য, তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছি না। একবিংশ শতাব্দীর দ্বার দেশে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান সভ্যতার ধ্বজাকে উঁচিয়ে রেখে নতুন বিপ্লবের জয়গান গেয়ে কীটনাশক বিজ্ঞাপন হাতে নিয়ে, এ কোন বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় প্রদান করছি? অপুষ্টিকে দূর করতে এ কী সর্বনাশা মরণযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে চলেছি?

অস্থিসন্ধির পুনর্গঠন

আমাদের শরীরের অস্থির সংখ্যাতো কম নয়—২০৬ খানা। সেই অস্থিগুলো একটার সঙ্গে আর একটা বিশেষভাবে সংযুক্ত। সংযুক্ত স্থানগুলোকে

বলা হয় অস্থিসন্ধি। এই অস্থি সন্ধিগুলো থাকার জন্য আমাদের কাজকর্মের সুবিধে হয়, ওঠানামা করতে পারি, হাঁটাচলা করতে পারি।

আশ্চর্য সেই অস্থিসন্ধিগুলো। অস্থির উপর যে মাংসপেশীর আস্তরণ—সেই আস্তরণ সংকোচনের ফলে অস্থিসন্ধিগুলো নড়াচড়া করতে পারে। ওতে কাজ করা সহজ হয়। অনেকটা যন্ত্রের কলকব্জার মত। কলকব্জাও জোড়া লাগানো। যেখানে জোড়া দেওয়া—সেখানে উভয় যন্ত্রাংশের ঘর্ষণ লাগে। ঘর্ষণের ফলে ক্ষয়কে রোধ করতে দেওয়া হয় তেল। ঐ তেলই ঘর্ষণজনিত ক্ষয়কে রোধ করে। তবু অল্প হলেও ক্ষয় হয় এবং ক্ষয় হয়ে গেলে পরিবর্তন করতে হয় যন্ত্রাংশকে।

আমাদের অস্থিসন্ধিগুলোও অনেকটা সেই রকম। অনেকগুলো কব্জার মত একদিকেই খোলে এবং বন্ধ হয়। কাজকর্ম করতে হয় বলে নড়াচড়া করে অস্থিসন্ধি, ফলে ক্ষয় হওয়ারই সম্ভাবনা। কিন্তু ক্ষয় রোধ করতে যন্ত্রের ভেতরে যেমন তেল দেওয়া হয়, এতেও তেমন আপনিই নিঃসৃত হয় তেলের মত পদার্থ। ঐ তেলগুলোই অস্থিসন্ধির ক্ষয় রোধ করে থাকে। তবু যন্ত্রাংশের মতই অস্থিসন্ধির ক্ষয় হয়। অনেকের বয়স বাড়ার সাথে সাথে নানারকম রোগে, বিশেষকরে বাত রোগে আক্রান্ত হলে অস্থিসন্ধির ক্ষয় ঘটে। এতে মানুষের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়, নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়, ব্যাথা বেদনাও অনুভব করে। অনেকসময় এর প্রভাবে মানুষ পঙ্গুও হয়ে যায় এবং জীবন্মৃত অবস্থায় কালযাপন করে।

শল্যচিকিৎসার দ্বারা অস্থিসন্ধির এই ধরণের ত্রুটি দূর করার প্রয়াস বহুদিনের। শল্যচিকিৎসা যখন এত উন্নত ছিল না, তখন চিকিৎসকরা অস্থিসন্ধির ত্রুটি দূর করতে একটা বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। অস্থিসন্ধিটিকে কেটে বাদ দিয়ে দিতেন এবং দুপাশের হাড় দুখানাকে জুড়ে দিতেন। এতে রোগী সাময়িকভাবে কিছুটা আরামবোধ করলেও সেই অস্থি-সন্ধিটার কাজগুলো সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হতো। একরকম অচল হয়ে যেত অঙ্গটি।

শল্যচিকিৎসার উন্নতি হলে শল্যচিকিৎসকরা এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে থাকেন। মানুষ যদি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত না হয়, তার অঙ্গ যদি সচল না থাকে, কাজকর্ম যদি ব্যাহত হয়, তাহলে কিসের চিকিৎসা! একটা অঙ্গকে পঙ্গু করে দেওয়াকে তো সুচিকিৎসা বলা যাবে না! তবে এটাও বুঝতে পারলেন, অস্থিসন্ধির মেরামত করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিন্তু কেমন করে মেরামত করা যাবে।

অস্থিসন্ধির মেরামত নিয়ে এবার চিন্তাশীলরা সবাই মাথা ঘামালেন। কেউ কেউ স্থির করলেন, অস্থি সন্ধি অন্য দেহ থেকে সংগ্রহ করে প্রতিস্থাপিত করা যাবে। অর্থাৎ একের অস্থি সন্ধিতে যদি অপর দেহ থেকে অস্থিসন্ধি এনে জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে সচল থাকবে অস্থিসন্ধি।

কিন্তু তেমন অস্থিসন্ধি কার দেহ থেকে সংগ্রহ করবেন ? মানুষ ছাড়া আর কোন জীবের অস্থিসন্ধি খাপ খাবে না। আবার কোন সুস্থ মানুষ স্বেচ্ছায় পঙ্গুত্ব বরণ করে অপরকে দান করতে চাইবেন না। তাহলে কি করা যাবে ?

অনেক ভাবনা চিন্তার পর সদ্য মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে অস্থিসন্ধি সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন শল্যচিকিৎসকরা। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত শরীরের কোন কোন যন্ত্রাংশ সচল থাকে। তেমনই একটি যন্ত্র চক্ষু। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুকে তুলে চক্ষু-ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয়, তারপর কোন চক্ষুহীনকে চক্ষু দান করা হয়। অস্থিসন্ধির ব্যপোরে ঠিক এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলেন কেউ কেউ। কিন্তু এতেও সমস্যা বিস্তর। একের দেহাংশ অপরের দেহ ঠিকমত গ্রহণ করতে চায় না। যেমন কিডনী নামক যন্ত্রটি। একমাত্র সমকোষী জমজের কিডনী ছাড়া অন্যের কিডনী অনেক সময় প্রত্যাখান করে শরীর। জোর করে চাপিয়ে রাখলে বিপরীত ফলও হয়। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

সবদিক চিন্তা ভাবনা করে জনৈক ভারতীয় শল্যচিকিৎসক সি. ব্যাঘ্রেশ্বরুডু এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করলেন। তিনি মৃতের অস্থিসন্ধি সংগ্রহ করলেন, অস্থিসন্ধিটিকে নিষ্প্রাণ ও জীবানুশূন্য করিয়ে জুড়ে দিলেন পঙ্গু অস্থিসন্ধিতে। বিশেষকরে উরু সন্ধিতে এইভাবে জুড়ে দেওয়ার ফল ভালই পেলেন এবং একাধিক্রমে অনেকের দেহেই অনুরূপভাবে অস্ত্রোপাচার করলেন।

এই পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নানান অসুবিধা। কে কোথায় মরছে তার সংবাদ গ্রহণ করবে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হাড়কে খুলে নাওরে, মৃতের আত্মীয়স্বজনের মতামত গ্রহণ করার, কত ঝক্কি—কত ঝামেলা। অধিকাংশই চান না আত্মীয়ের মৃতদেহকে বিকলাঙ্গ করতে।

এর বিকল্প ব্যবস্থা না হলে নয়। কিন্তু কি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন চিকিৎসকরা! নানা চিন্তাভাবনার পর কেউ কেউ স্থির করলেন, বিকল্প ব্যবস্থা একটিই হতে পারে—কৃত্রিমভাবে অস্থিসন্ধির প্রস্তুতি এবং তার সংযোজন।

উক্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রথমে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন ফ্রান্সের জনৈক শল্যচিকিৎসক ডঃ জুডে। তিনি করলেন কী? ক্ষয়ে যাওয়া অস্থিসন্ধিটার মাথায় পরিয়ে দিলেন একটা প্লাস্টিকের ঢাকনা বা টুপি।

জুডের এই চিকিৎসাও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারলো না। কিছুদিন পরেই প্লাস্টিকের ঢাকনার ক্ষয় হয়ে গেল এবং রোগীর অবস্থাও সেই পূর্বের মতই হয়ে পড়লো। মাত্র সামান্য কয়েকটা দিনই রোগ থেকে মুক্তি ঘটে।

জুডের এই পদ্ধতির প্রতি কিন্তু অনেকে আকর্ষণবোধ করেছিলেন। তাঁরা গবেষণা শুরু করলেন প্লাস্টিকের পরিবর্তে দীর্ঘস্থায়ী ঢাকনা তৈরি

করতে। অনেকে অনেক ধরণের ঢাকনা তৈরি করলেন এবং প্লাস্টিকের বদলে গ্রহণ করলেন ধাতুকে। ধাতব ঢাকনা প্লাস্টিকের চেয়ে কিছুটা ভাল হলেও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারলো না। তার উপর এক আধ বছরের ভেতরেই রোগীরা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলেন। কারও হাড় আলগা হয়ে গেল, কারও হাড়ের অপর জায়গায় ক্ষয় হতে শুরু করলো, ইত্যাদি। তাই এই পদ্ধতিও অচিরে জনপ্রিয়তা হারালো।

আবার শুরু হল গবেষণা। কিন্তু কিছুকাল ধরে পূর্বোক্ত পদ্ধতি ছাড়া নতুন কোন কিছুর উদ্ভাবন কেউ করতে পারেননি। ফলে অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও সাময়িকভাবে রোগমুক্তির জন্য যন্ত্রণাকাতর রোগীরা বাধ্য হয়ে সেই ধাতব ঢাকনা ব্যবহার করে আসছিলেন। অবশেষে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জন চার্নলি নামে একজন ইংরেজ শল্যচিকিৎসক ঢাকনার পরিবর্তে পুরো অস্থিসন্ধিটাকে কৃত্রিমভাবে তৈরি করতে মনস্থ করেন। ক্ষয়ে যাওয়া অস্থিসন্ধির জায়গায় যান্ত্রিক সন্ধি স্থাপনের পরিকল্পনা।

জন চার্নলি এই উদ্দেশ্যে কলঙ্কহীন ইস্পাত নির্মিত কৃত্রিম সন্ধি তৈরি করেন। সন্ধির দুদিকের মাথায় স্থাপন করেন টেফলনের তৈরি কাপ। তারপর তিনি এই কৃত্রিম যান্ত্রিক সন্ধিটিকে স্থাপন করেন একজন রোগীর উরুদেশের অস্থিসন্ধিতে।

জন চার্নলি আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করলেন। কৃত্রিম যন্ত্র ধারণ করে রোগীর অঙ্গ সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক হয়ে গেল। উৎসাহিত চার্নলি এবার তৈরি করলেন শত শত কৃত্রিম সন্ধি এবং কিছুকালের মধ্যে তিনি তিনশ'র মত রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করলেন।

কিন্তু এই পদ্ধতিরও ত্রুটি ধরা পড়লো পরে। যাঁরাই কৃত্রিম সন্ধি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকে পুনরায় আক্রান্ত হলেন। এবার যন্ত্রণা আরও বাড়লো এবং পঙ্গুও হয়ে গেলেন কেউ কেউ।

ডাঃ চার্নলি মাথায় হাত দিলেন। এ কী করলেন তিনি? দুঃখে ও অনুশোচনায় ভেঙ্গে পড়লেন একেবারে এবং যতগুলি যান্ত্রিক সরঞ্জাম ছিল, সবগুলিকে নষ্ট করে ফেলার জন্য সহকারীদের আদেশ দিলেন।

ডঃ চার্নলি তাই বলে হাল ছাড়লেন না। হতাশ হওয়া সত্ত্বেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গবেষণা শুরু করলেন এবং ব্যর্থ হওয়ার কারণ অনুসন্ধানে যত্নবান হলেন।

কারণ একদিন খুঁজে পেলেন তিনি। বুঝতে পারলেন, যত অসুবিধার মূলে আছে টেফলনের কাপটি। দৈহিক তাপ ও পীড়নের ফলেই সেটি সহজে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে যায়। যার ফলে রোগীর অবস্থা ঠিক আগের মতই হয়।

ডঃ চার্নলি পদ্ধতিটিকে পরিত্যাগ না করে এমন এক জিনিস খুঁজতে শুরু করলেন—যা দেহের তাপ ও পীড়নের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না। একরকম আকস্মিকভাবে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধান পেলেন উচ্চ ঘনত্বের পলি ইথিলিন।

ভাবলেন, টেফলনের পরিবর্তে একে গ্রহণ করলে কেমন হয়? কিন্তু কৃত্রিম সন্ধিগুলো কোথায়? সবতো নষ্ট করে ফেলেছেন!

না, তাঁর সহকারীরা সেগুলোকে নষ্ট না করে সরিয়ে রেখেছিলেন। ডাঃ চার্নলিকে পুনরায় নতুন করে অস্থিসন্ধি তৈরি করতে হল না। তাদেরই একটিকে গ্রহণ করে পুনরায় পরীক্ষামূলকভাবে অসহ্য যন্ত্রণাকাতর এক রোগীর উরুসন্ধিতে স্থাপন করলেন।

সম্ভাব্য সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তবু রোগী কোন অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলেন না। ডাঃ চার্নলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বুকে বল পেয়ে তিনি পুনরায় শুরু করলেন অস্ত্রোপাচার। আর অতি অল্প সময়ের ভেতরেই তাঁর সেই পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়লো বিদেশে। সেই থেকে জন্ম হলো উরুর অস্থিসন্ধি পুনর্গঠনের এক নতুন শল্যচিকিৎসা। নাম দেওয়া হলো "লো-ফ্রিকশন অর্থোপ্লাস্টি"।

বর্তমানে এর আরও উন্নতি হয়েছে এবং যেকোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম অস্থি সংস্থাপনের জন্য ঐ পদ্ধতিই অবলম্বন করা হচ্ছে।

নেপোলিয়ানের মৃত্যু রহস্য

১৮২১ খৃীষ্টাব্দের ৫ই মে। পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন প্রবল পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী বীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মহাপ্রয়ান ঘটে। তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে একটা সন্দেহ ধূমায়িত হয়—বুঝিবা নেপোলিয়ানের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। তাঁকে যেকোন উপায়ে হত্যা করা হয়েছে।

সন্দেহ হওয়ার কথা। সুঠাম চেহারা। বয়সও মাত্র একান্ন বছর হয়েছিল। নির্বাসিত অবস্থায় মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর শরীর এতখানি ভেঙ্গে পড়ারতো কথা নয়!

নেপোলিয়ানের মৃত্যুর কারণ বলা হয়েছিল পাকস্থলীর ক্যানসার। কিছুদিন ধরে পাকস্থলীর যন্ত্রণায় অস্থিরও হয়েছিলেন। তারপর বরণ করেন মৃত্যু। ক্যানসার ঘোষণাও করেছিলেন নেপোলিয়ানের ব্যক্তিগত এক চিকিৎসক।

তথাপি সন্দেহ হয়েছিল। সন্দেহের কারণ নেপোলিয়ান নিজেই ব্যক্ত করেছিলেন। একদিন বলেছিলেন "ইংরেজরা আমায় হত্যা করবে।"

নেপোলিয়ানের সন্দেহ অমূলক ছিল না, অমূলক ছিল না সাধারণ

মানুষেরও। বলদর্পী নেপোলিয়ানের বিজয় অভিযানে একে একে পদানত হয়েছিল ইউরোপের অধিকাংশ দেশ! চার বছর পরে পরাজয় বরণ করেছিলেন, নির্বাসিত হয়েছিলেন এলবা দ্বীপে।

নেপোলিয়ান কৌশলে ফিরে এসেছিলেন এবং ফ্রান্সের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে পুনরায় সম্রাট হিসাবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পুনরায় চালিয়েছিলেন তাঁর বিজয় অভিযান।

এবারও তাঁর পতন হলো। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন ওয়াটালুর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটনের হাতে পরাজিত ও বন্দী হলেন। নির্বাসিত করা হলো আটলাণ্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ দিকে হেলেনা দ্বীপে। এবার কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল, যাতে পূর্বের মত নেপোলিয়ান ফিরে আসতে না পারেন।

তবু আশঙ্কা ছিল, নেপোলিয়ানের মত এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষের পক্ষে যে কোন কঠিন দুর্গ প্রাচীর ভেদ করা অসম্ভব নয়। বয়সও পঞ্চাশ অতিক্রম করেনি। তার নজির পূর্বে তিনি রেখেছেনও। সুস্থ থাকলে যে কোন মুহূর্তে ইউরোপে পদার্পন করতে পারেন এবং সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারেন। অতএব সুকৌশলে তাঁকে হত্যা করারই সম্ভাবনা ছিল। আর এই কারণে সাধারণের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছিল।

সবাই সন্দেহ করেছিল, বিষ প্রয়োগের দ্বারা নেপোলিয়ানকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু কোন নথিপত্র পাওয়া যায়নি, বা এ ব্যাপারে পরের দিকে কোন কথা ফাঁসও হয়ে পড়েনি। প্রচলিত বিষ দিয়ে যদি হত্যা করা হতো তাহলে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা একদিন না একদিন প্রকাশ পেতই। তাও হলো না। নেপোলিয়ানের ব্যক্তিগত চিকিৎসকরাও নিরব থাকলেন। তবু মেনে নিতে পারলে না ক্যানসারকে।

নেপোলিয়ানের মৃত্যুর পর একশ চল্লিশ বছর ধরে সেই সন্দেহটা ছিল। শেষ পর্যন্ত সেই সন্দেহের নিরসন ঘটাতে এগিয়ে এলেন স্কটল্যাণ্ডের দুজন চিকিৎসক ডাঃ স্মিথ এবং ডাঃ ফর সার্ফউডস। এরা দুজনেই সেই একই সন্দেহের বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন। কী এমন বিষ সেদিন ছিল—যা তিলে তিলে নেপোলিয়ানকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিয়েছে? কার মাধ্যমে বিষ গিয়েছিল সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে? কেমন করেই বা প্রয়োগ করা হয়েছিল সেই বিষকে? নেপোলিয়ানের পরিচর্যায় যারা নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের কেউ সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারলেন না কেন? ওঁদের সবাইকে কী বশ করা হয়েছিল? যদি হয়েছিল, তাহলে পরের দিকে একজন না একজন ফাঁস করে দিতই।

নানা চিন্তাভাবনার পর তাঁরা স্থির করেন, প্রচলিত কোন বিষ নেপোলিয়ানকে প্রয়োগ করা হয়নি। সবার অলক্ষে অত্যন্ত কৌশলে বিষক্রিয়া ঘটানো হয়েছে। যা চিকিৎসকের চোখকেও ফাঁকি দিয়েছে—এমন কী ধরণের বিষ হতে পারে?

শেষে তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন, একমাত্র আর্সেনিকই এমন ঘটনা ঘটাতে পারে। যে কোন প্রকারে হোক, তাঁর দেহে অল্পে অল্পে প্রয়োগ করা হয়েছে আর্সেনিককে। মৃদু বিষক্রিয়া হতে হতে শেষ পর্যন্ত পাকস্থলীতে প্রচণ্ড ক্রিয়া করেছে এবং তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

এবার অনুমানের সত্যতা যাচাইয়ের পালা। কিন্তু কেমন করে প্রমাণ করবেন? একশ' চল্লিশ বছর আগে তাঁকে কবরে পাঠানো হয়েছে। কবর খুঁড়লে ক'খানা হাড়ই পাওয়া যাবে। হাড়ের মধ্যে আর্সেনিকের অস্তিত্ব ধরা পড়বে না। প্রত্যেকটি মানুষের রক্তে, মাথার চুলে, দেহের কলা কোষে প্রভৃতি কয়েকটা জায়গায় অতি অল্প পরিমাণে ট্রেস এলিমেণ্ট হিসেবে যৌগের আকারে আর্সেনিক থাকে। যদি বাহির থেকে কারও দেহে আর্সেনিক প্রবেশ করে তাহলে সেগুলো সঞ্চিত হয় লিভার, কিডনী, ফুসফুস, মাথার চুল প্রভৃতিতে। এবং এইগুলোর যে কোন একটিকে পরীক্ষা করলে বোঝা যায় আর্সেনিকের প্রভাবে মৃত্যু হয়েছে কিনা?

লিভার, কিডনী প্রভৃতি সংরক্ষিত হয়নি, হতেও পারে না। একমাত্র যদি পাওয়া যায় তাহলে মাথার চুল। কোথাও কী সংরক্ষিত হয়েছে নেপোলিয়ানের মাথার চুল?

ডাঃ স্মিথ এবং ফরসার্ফউডস্ খোঁজখবর শুরু করলেন, এবং ইউরোপের প্রধান প্রধান যাদুঘরে চিঠি লিখলেন। কেউ যদি নেপোলিয়ানের কেশগুচ্ছ সংরক্ষণ করে থাকেন, তাহলে তার থেকে যেন দু'চার গাছা পাঠিয়ে দেন।

উত্তর এল একটিমাত্র যাদুঘর থেকে। সঙ্গে একটা প্যাকেট। প্যাকেটের উপর লেখা আছে, মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে নেপোলিয়ানের মাথা থেকে এই কেশ নেওয়া হয়েছে।

এবার কেশ পরীক্ষার ব্যাপার। কিন্তু কে পরীক্ষা করবেন কেশ? বিশেষজ্ঞ খোঁজা হলো। শেষ পর্যন্ত কেশ পরীক্ষার ভার অর্পন করা হলো বিজ্ঞানী ডঃ ওয়াসসেনের উপর।

ডঃ ওয়াসসেন প্রথমে সনাক্ত করলেন কেশগুচ্ছকে। নিঃসন্দেহ হওয়ার পর আর্সেনিকের পরিমাণ নির্ণয় করতে নিউট্রন অ্যাকটিভেশন পদ্ধতি অবলম্বন করলেন।

আর্সেনিক ভারী মৌলগুলোর মধ্যে একটি। ওর পারমাণবিক ওজন ৭৫। নিউক্লিয়াসে থাকে ৩৩টি প্রোটন এবং ৪২টি নিউট্রন। এর আইসোটোপও পাওয়া যায়। নিউক্লিয়াসে যদি একটি মাত্র নিউট্রনকে যুক্ত করা যায় তাহলে ৭৬ পারমাণবিক ওজন বিশিষ্ট আর্সেনিকের তেজস্ক্রিয় মৌলে রূপান্তরিত হয়।

ডঃ ওয়াসসেন চুলগুলোকে নিউট্রন স্রোতের মুখে ধরলেন, এবং নিউট্রনের পরিবেশে চুলে তেজস্ক্রিয় আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করলেন। কী আশ্চর্য! সত্য সত্যই তিনি লাভ করলেন তেজস্ক্রিয়

আর্সেনিক। তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপও করলেন। সেখান থেকে চুলে সঞ্চিত আর্সেনিকের পরিমাণও পাওয়া গেল। দেখা গেল, সাধারণ কেশে যে পরিমাণ আর্সেনিক থাকে তার চেয়ে প্রায় তেরগুণ বেশী আর্সেনিক পাওয়া গেল নেপোলিয়ানের চুল থেকে।

সন্দেহ সত্যে পরিণত হলো। বোঝা গেল, নেপোলিয়ানকে আর্সেনিক প্রয়োগ করেই হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু কেমন করে আর্সেনিক প্রয়োগ করা হয়েছিল? তাঁর খাদ্যের সঙ্গে কী আর্সেনিক মিশিয়ে দেওয়া হতো?

জিজ্ঞাসাটার কিন্তু সমাধান হয় নি। এ ক্ষেত্রেও অনুমান খাড়া করতে হয়েছে। যদিও এই অনুমানটার সত্য যাচাই করার কোন উপায় নেই। বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, নেপোলিয়ানকে প্রত্যক্ষভাবে আর্সেনিক প্রয়োগ করা হয় নি। ব্যবহারের জন্য তাকে যে ঘর, যে বিছানাপত্র এবং যে সব পোশাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয়েছিল, তাদের সঙ্গে সুকৌশলে আর্সেনিকের বিষাক্ত যৌগগুলোকে অল্প অল্প করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। হয়ত ঘরের দেওয়ালেও পাতলা প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল বিষাক্ত কোন আর্সেনিক যৌগের। দিনের পর দিন আর্সেনিকের সান্নিধ্যে থেকে থেকে নেপোলিয়ানের দেহে দেখা দিয়েছিল বিষক্রিয়া। যাতে শেষের দিকে তিনি পাকস্থলীর যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠেন এবং পাকস্থলীর ক্যানসার বলে সন্দেহ করা হয়।

সংখ্যার প্রতীক

সংখ্যার প্রতীক আবিস্কার বিজ্ঞান তথা মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ—এক অবিস্মরণীয় অবদান। এর পেছনে রয়েছে সহস্র সহস্র বছরের সাধনা এবং সহস্র সহস্র জ্ঞানী-গুণীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। আজকের বিজ্ঞানসম্মত সুশৃঙ্খল সংখ্যা পাতনের মাধ্যমে বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশের ব্যবস্থা এক দিনে গড়ে উঠেনি। বনস্পতির পেছনে বীজের মত সংখ্যা প্রকাশের চিন্তাধারা নিহিত হয়েছিল সেই কোন কালে—মানব সভ্যতার একেবারে উষালগ্নে। গুহাবাসের আগে যেদিন তার প্রয়োজন ছিল অতি সামান্য, যেদিন খাদ্য ছিল কাঁচামাংস, সম্পদ ছিল পাথরের হাতিয়ার, সেদিনও সে হিসেব রাখতো সম্ভবত হাতের আঙ্গুলের দ্বারা। বনের একাধিক পশু এক জায়গায় থাকলে সংখ্যাটা বুঝতে পারতো কিন্তু প্রকাশ করার কোন ক্ষমতা ছিল না। মুখে ভাষাই আসেনি তখন।

মানুষ একদিন গুহাবাসী হলো। চাহিদাও বাড়লো। পশু চর্মের হিসেব, দলের লোকসংখ্যার হিসেব, শিকার করা পশুর হিসেব, সংগ্রহ করা ফলপাকুড়ের

হিসেব, কত হিসেব! তার উপর তাদের ব্যবহৃত হাতিয়ারের হিসেব তো আগে থেকে ছিল।

প্রাকৃতিক ঘটনাবলীও তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে বাধ্য করিয়েছিল। মানুষের দুটি হাত, দুটি পা, পশুর চারটে পা, পালে পালে বিচরণরত পশু, বনের ফলবান বৃক্ষ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সেদিন যোগ বিয়োগেরও ধারণা করতে হয়েছিল তাদের। নতুন শিশুর জন্ম হয়, দলের কেউ কেউ মারাও যায়। নতুন নতুন হাতিয়ার বানাতে হয়, পুরাতনগুলো হারিয়ে যায় বা অকেজো হয়ে পড়ে। এ সব ক্ষেত্রে যোগ-বিয়োগের মাধ্যমে সংখ্যা নির্ণয় ছাড়া উপায় কী?

সেদিন ঐ সংখ্যাগুলোর জন্য তারা কোন প্রতীক বা চিহ্ন আবিস্কার করতে সক্ষম হয়নি। হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুল ছাড়া কোন কিছুর হিসেব রাখতে তারা সমসংখ্যক পাথরের নুড়ি, গাছের পাতা, ইত্যাদি জড় করতো অথবা লতার গায়ে গিঁট দিয়ে রাখতো। এরপরে মানুষ যখন পশু-পালন করতে শিখলো তখন সংখ্যা নির্ণয় করার সমস্যাটা আরও জটিল হয়ে উঠলো। সম্ভবত পশুর হিসেব মেলাবার জন্য ওরা ঐ লতার গায়ে গিঁট দেওয়াটাকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। অপরদিকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিসের সংখ্যা ঠিক করতো বিভিন্ন জিনিসকে মাধ্যম করে। কেননা, পাথরের নুড়ি বা এই জাতীয় পদার্থকে জমা করে অনেকগুলোকে নির্দেশ করতে গেলে গোল-মাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। সংখ্যার প্রতীক বলতে তখন তাই কিছুই ছিল না।

মানুষ সংখ্যার প্রতীকের জন্য মাথা ঘামিয়েছিল বর্ণমালা আবিস্কারের পরে। আদি নগর সভ্যতার যুগে-পৃথিবীর যেখানে যেখানে সভ্যতার সূচনা হয়েছিল, সেই—ব্যাবিলন, মিশর ও ভারতে পৃথক পৃথক ভাবে এক এক ধরণের প্রতীক গ্রহণ করেছিল। মিশরীয়দের ছিল চিত্রলিপি। ঐ চিত্রলিপির এক একটি বিভিন্ন সংখ্যার নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং এরই মাধ্যমে তারা বেশ বড় বড় সংখ্যা প্রকাশ করতে পারতো!

ব্যাবিলনীয়রা প্রবর্তন করেছিল কীলকলিপি। কীলক বলা হয়—লিপি-গুলো এক বা একাধিক খিল বা পেরেকের মত দেখতে বলে। তারা সেই কীলকের মত লিপিকে এদিকে ওদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখে এবং একাধিক কীলক যুক্ত করে বহু সংখ্যাকে নির্দেশ করতো। তবে তারা এক থেকে একশ তথা শতক পদ্ধতিতে হিসেব করতো না, করতো ষষ্ঠিক হিসেব। অর্থাৎ এক থেকে ষাট পর্যন্ত। এই হিসেব এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে টিকে আছে। যেমন ষাট সেকেণ্ডে এক মিনিট, ষাট মিনিটে এক ঘণ্টা। কোণের হিসেবেও সেই ষষ্ঠিক পদ্ধতি।

গ্রীকরা বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কিন্তু সংখ্যার প্রতীক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আদৌ কৃতিত্ব

প্রদর্শন করতে পারেননি। তবে তারাও তাদের বর্ণমালাকে সংখ্যার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। যেমন "আলফা" ১, "বিটা" ২, "গামা ৩" ইত্যাদি। দশকের নির্দেশ করতে ধরতেন "আয়োটা" এবং শতককে "রো" দিয়ে সূচিত করতেন। এগুলি প্রত্যেকটি গ্রীক বর্ণমালার এক একটি অক্ষরের নাম।

গ্রীকদের সংখ্যা প্রকাশের রীতিটি কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। দশকের প্রতীকের ডান পাশে এককের প্রতীক বসিয়ে দু অংকের সংখ্যা নির্দেশ করতেন। আলফা ও বিটাকে বসালে ১২ হতো না, ১২ নির্দেশ করতো আয়োটার পাশে বিটা বসালে। তেমনি ২০ ধরতো "কাপ্পা" নামক অক্ষরটিকে। ২১ সংখ্যা বিটা ও আলফা নয়, কাপ্পা ও আলফা। তেমনই ১২৩ সংখ্যাটি নির্দেশ করতো রো, কাপ্পা ও গামা। ধরা হতো ১০০-এর প্রতীকের পর ২০-র প্রতীক, শেষে ৩-র প্রতীক।

তেমনি ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, হাজার, দশহাজার প্রভৃতি প্রত্যেকটির জন্য নির্বাচিত হয়েছিল এক একটি অক্ষর। এইভাবে খুব বড় বড় সংখ্যাকে নির্দেশ করতে গিয়ে গ্রীক বর্ণমালার ২৪টি অক্ষরের দ্বারা সম্ভব হয়নি। অপরাপর লিপি থেকে অক্ষর চয়ন করে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাই সংখ্যা প্রকাশটা কেবলমাত্র পণ্ডিতদের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ।

রোমানরা এ ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাতন্ত্রের পরিচয় প্রদান করেছিলেন। তবে জটিলতা ছিল যথেষ্ট। শুধু প্রতীকের সংখ্যা কমিয়েছিল তারা। গ্রহণ করেছিল মাত্র সাতটি প্রতীক। প্রতীকগুলো যথাক্রমে I, V, X, L, C, D ও M। এককের সংখ্যাগুলোর জন্য ধরা হত I ও V কে, দশকের সংখ্যাগুলোর জন্য ধরা হতো X ও L কে, শতকের জন্য C ও D কে এবং হাজারের জন্য M কে। দশক পদ্ধতিতে তারা গণনা করতো এবং একই প্রতীককে বার বার ব্যবহার না করে মাঝে অন্য প্রতীক আনতো। যেমন V=৫, X=১০, L=৫০, C=১০০, D=৫০০, M=১০০০।

সংখ্যা সাজানো হত যোগ-বিয়োগ পদ্ধতিতে। ১, ২ এবং ৩ এর জন্য যথাক্রমে I, II এবং III। কিন্তু ৪ প্রকাশ করলে IV এবং ৬ এর বেলায় VI। তেমনই ৯ সংখ্যাটি IX এবং ১১ সংখ্যাটি XI। এইভাবে ১৪=XIV, ১৯=XIX, ২৯=XXIX, ১৬=XVI, ২১=XXI, ৩১=XXXI, ১৫=XV, ৩০=XXX, ইত্যাদি। জটিলতা এসেছে পরের দিকে। যেমন L=৫০, XL=৪০ (৫০−১০), XLV=৪৫ (৪০+৫) কিন্তু VL=৪৫ (৫০−৫) নয়। শতকের ক্ষেত্রে, সহস্রের ক্ষেত্রেও অনুরূপ জটিলতা। তবু কোন কোন ক্ষেত্রে আজও রোমান প্রতীকের প্রচলন আছে। যেমন স্কুলের শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকে নির্দেশ করতে গিয়ে রোমান প্রতীক ব্যবহার করে।

সংখ্যার প্রতীক নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভারতের দানই গুরুত্বপূর্ণ এবং এক্ষেত্রে তার আরও গুরুত্বপূর্ণ আবিস্কার ০। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০-এই মোট দশটি প্রতীক দিয়ে সর্বপ্রথম যে কোন সংখ্যাকে নির্দেশ করেছিল ভারত।

আজকের পৃথিবীর সবাই এই ০ ও সংখ্যা পাতন প্রণালীতে গণনা করে এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রথমে আয়ত্ব করতে হয় এই পদ্ধতিকে। একেবারে সহজ সরল ও সর্বপ্রকারের জটিলতা বর্জিত। এর চেয়ে অপর কোন সরল পদ্ধতি আবিস্কৃত না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে পৃথিবীর সর্বত্র।

ভারত পদ্ধতিটি সম্ভবত বৈদিক যুগের পরেই আবিস্কার করেছিল। হয়ত খ্রীষ্টজন্মের কিছু পূর্বে। যদি গ্রীকদের পূর্বে হতো তাহলে সে সময় যে সব গ্রীক পণ্ডিত জ্ঞানলাভের স্পৃহায় ভারতে এসেছিলেন, তাঁরা এমন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি হাতের কাছে পেলে নিশ্চয়ই স্বদেশে অনুকরণ করতেন। কিন্তু গ্রীকরা তা করেননি। গ্রীক বিজ্ঞানের অবনতির পর ভারতে বিজ্ঞান চর্চার যে জোয়ার এসেছিল, বিশেষ করে অঙ্ক ও জোতির্বিদ্যায় এতখানি যে সাফল্য এসেছিল তা ঐ সুষ্ঠু অঙ্ক পাতন প্রণালী আবিস্কারের জন্যই। এই পদ্ধতি যদি গ্রীক পণ্ডিতরা লাভ করতেন তাহলে তাঁরা আরও এগিয়ে দিতে পারতেন বিজ্ঞানের অপরাপর শাখাকে।

ভারতে এই পদ্ধতি কবে আবিস্কৃত হয়েছিল—তা জানা না গেলেও খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দিকে ভারতের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন আরবীয় পণ্ডিতেরা। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে আরবের কাছ থেকে লাভ করে স্পেন। তারপর শ'তিনেক বছরের ভিতরেই পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে।

০ ছাড়া অন্যান্য প্রতীকগুলো ভারত নিয়েছিল বর্ণমালা থেকেই। তবে সরাসরি নয় রূপান্তরের মাধ্যমে। বর্ণগুলো আবার পরপর নেওয়া হয়নি। সংখ্যাকে যে নামে অভিহিত করা হতো তারই আদ্যাক্ষর। যেমন সংস্কৃত "পঞ্চ" শব্দের আদ্যাক্ষর 'প' এর রূপান্তর সংস্কৃতের পাঁচ প্রতীকটি।

সম্ভবত ঐ সংস্কৃত অক্ষরের রূপান্তর হচ্ছে ১ থেকে ৯ সংখ্যার প্রতীক। পাশ্চাত্য সরাসরি ঐ প্রতীকগুলোই গ্রহণ করেছিল। সরলীকরণ করতে গিয়ে কিছুটা পরিবর্তন করে নিয়েছে। এটি যে সত্য—তা সংস্কৃত ও ইংরেজী কয়েকটি সংখ্যাকে পরীক্ষা করলেই বোঝা যায়। যেমন ইংরেজী 1, 2, 3, 6, এবং 8। সংস্কৃতে ৭ ২ ३ ६ ८।

অন্ততঃ এই একটি ব্যাপারে আমরা ভারতীয়রা এখনও গর্ববোধ করতে পারি।

ডাইনোসোরদের অবলুপ্তির কারণ

জীবজগতের অতি ধীর ও মন্থর পথ বেয়ে কালে কালে পৃথিবীর বুকে এসেছে নানা ধরণের জীব। আপন বৈশিষ্ট্যকে পুরোপুরি বজায় রেখে এ

পর্যন্ত টিকে আছে—এমন জীবের সংখ্যা পৃথিবীতে খুবই কম। অধিকাংশের বংশধারার মধ্যে কালে কালে সূচিত হয়েছে নানা রূপান্তর এবং হারিয়ে যাওয়াদের সংখ্যাও বড় কম নয়।

হারিয়ে গেছে অনেক। হারিয়ে গেছে ট্রাইলোবাইট, হারিয়ে গেছে অ্যামোনাইট, হারিয়ে গেছে আরও কত খোলকধারী জীব। এরা সবাই সামুদ্রিক জীব। ডাঙ্গায় হারিয়ে যাওয়া জীবদের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশী। কত সরীসৃপ আর কত স্তন্যপায়ী! তবু সবার আগে যাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তারা সর্বকালের এক একটা মূর্তিমান বিস্ময় —ডাইনোসোর।

বাপরে বাপ, কী চেহারা ছিল তাদের – আর কী শক্তি! দৈর্ঘ্যে কোন কোনটি ছিল ৩০ মিটারের মত আর ওজনে ৩০ থেকে ৩৫ টন। ওদের জীবাশ্ম আজকে পাওয়া যাচ্ছে এখানে ওখানে। পাওয়া যাচ্ছে ডিমও। পুরো কঙ্কালও পাওয়া গেছে অনেক। অনেক যাদুঘরে সে কঙ্কাল রক্ষিত হয়েছে। সেই কঙ্কালের দিকে তাকালে মনে আপনিই আসে এক জিজ্ঞাসা—এমন অতিকায় দৈত্য সদৃশ এবং এমন পরাক্রমশালী জীব কেন হারিয়ে গেল? কেন ওদের বংশে বাতি দিতে থাকলো না কেউ? কেন বিবর্তনের বঙ্কিম পথ বেয়ে কোন একটি প্রজাতির বংশধারা টিকে থাকলো না!

ঐ একই প্রশ্ন জীববিজ্ঞানীদেরও। যারা প্রায় ১৬ কোটি বছর ধরে আপন বংশধারাকে টিকিয়ে রেখেছিল, যারা অন্তত পাঁচ কোটি বছর জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে দোর্দণ্ডপ্রতাপে শাসন চালিয়েছিল, যাদের সমকক্ষ একটিও শত্রু ছিল না তারা কোন্ যাদুমন্ত্র বলে সহসা লুপ্ত হয়ে গেল?

ডাইনোসোরদের ভাগ্যলিপি উদ্ধার করে মানুষের ভাগ্যলিপিটাকেও পাঠ করতে চান অনেকে। প্রশ্ন আসে, মানুষ কী পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত তার শক্তিকে কায়েম রাখতে পারবে? তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী কী কোন কালে আবির্ভূত হবে না পৃথিবীর বুকে? ডাইনোসোরদের মত তাকেও কি হারিয়ে যেতে হবে না?

জবাব খোঁজার জন্য শুধু ডাইনোসোর নয়, অতীতে লুপ্ত হয়ে যাওয়া সব জীবের প্রতি জীববিজ্ঞানীদের সমান আগ্রহ। সবারই লুপ্ত কোষ্ঠী উদ্ধার করতে চান। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, সামুদ্রিক জীবের ক্ষেত্রে হারিয়ে যাওয়ার সংখ্যাটা কম। তুলনায় অনেক-অনেক বেশী ডাঙার জীবের বেলায়। ডাঙার প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিপর্যয় এসেছে বারে বারে এবং এখানে বিবর্তনের ধারাটিও যেন প্রবল। সেই কবে প্রায় ৩৬ কোটি বছর আগে সিলাকান্থরা এসেছিল সাগরে —তারা এখনও টিকে আছে তাদের আদিম চেহারাটাকে নিয়ে। ডাঙায় বোধহয় একমাত্র আরশোলা ছাড়া কেউ তার আদিম রূপটাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারেনি। তাছাড়া একমাত্র পতঙ্গ বংশ ছাড়া কারও বংশ এতকাল টিকে থাকতে পারেনি। উন্নত জীব বারে বারে এসেছে, লুপ্তও হয়ে গেছে। তাদেরই কবরের উপর সৌধ রচনা করেছে নতুন আগন্তুক। কারও শাসন চিরস্থায়ী হতে পারেনি।

কিন্তু কেন ? সে কী প্রকৃতির খেয়াল।

হ্যাঁ প্রকৃতির খেয়ালীপনাও বটে। সে যেন কারও আধিপত্যকে চিরকাল বরদাস্ত করতে পারে না। যখন যারা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে, তখনই সৃষ্টি করেছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী। রচিত হয়েছে কবর। ভূগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে তারা।

তাই ডাইনোসোরদের আগেও হারিয়েছে অনেকে। পরের দিকে স্থলভাগ সংগঠিত হওয়ার পরে যেন আরও বেশী হয়েছে। গেছে কত স্তন্য-পায়ী প্রাণী, কত স্তন্যপায়ী। মানুষের ভাগ্যেও কী কম বিপর্যয় ঘটেছে? লুপ্ত হয়ে গেছে জাভা মানব, অস্ট্রালোপিথেকাস, রামাপিথেকাসরা। শেষে হারিয়ে গেছে বেঁটে নিয়ান ডার্থালরা। তারপর আজ থেকে মাত্র পঁচিশ হাজার বছর আগে ক্ষত্রিয় পরশুরামের মত পাথরের কুঠার কাঁধে অরণ্য থেকে যে দীর্ঘাকৃতি ক্রোম্যাগনন মানুষ দৃপ্ত তেজে বেরিয়ে এসেছিল, আমরাই তাদের বংশধর। বর্তমানে শাসনকাল আমাদেরই।

যারাই লুপ্ত হয়ে গেছে, তাদের লুপ্ত হয়ে যাওয়ার মূলে অনেক কারণ আছে। তবে এও সত্য যে অনেকে টিকে আছে তাদের বংশধারার মধ্যে। পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে—এই মাত্র। কিন্তু ডাইনোসোর ?

না, ডাইনোসোরদের বংশধারা টিকে নেই। তাদের প্রতি প্রকৃতির কেন যে এমন নিষ্ঠুর আচরণ—সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের অনেকে অনেক মত খাড়া করেছেন। সেই মতবাদগুলোকে একত্রিত করা হলো এখানে।

(১) ডাইনোসোরদের লুপ্ত হওয়ার একটা বড় কারণ, তাদের বিশাল চেহারা। খাদ্যের চাহিদা ছিল তাদের প্রচুর। আদিতে তারা ছোট ছিল। ভুঁড়িটা যখন অত্যন্ত বাড়িয়ে ফেললো, শত্রু না থাকায় যখন এন্তার বংশবিস্তার করে চললো, তখন পরিবেশে খাদ্যের ঘাটতি ঘটলো। চিরকালের অভ্যাস পরিত্যাগ করা সম্ভব ছিল না, ছিল না কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার এবং সংগ্রামের ভেতর দিয়ে নিজের রুটিকে সংগ্রহ করার মানসিকতা। তাই অচিরেই খাদ্যের ঘাটতি ঘটেছিল। এটি একটি কারণ হলেও প্রধান কারণ নয়।

(২) পরিবেশের পরিবর্তন ঃ

কোন জীবের বংশধারা যদি একইভাবে এবং একই পরিবেশে সুখে লালিত পালিত হয়, কঠোর জীবন সংগ্রামে যদি অবতীর্ণ হতে না হয়, তাহলে ধীরে ধীরে রক্ষণশীল হয়ে ওঠে। তখন দ্রুত হারে বংশবিস্তার ঘটে এবং পরিবেশের সামান্যতম পরিবর্তন এলেও সেই পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। অপরদিকে অতি রক্ষণশীল হয়ে পড়লে জনন ক্ষমতার হ্রাসও ঘটে।

আজ থেকে সাত আট কোটি বছর আগে ডাইনোসোরদের দ্বারা যখন ডাঙা একেবারে ছেয়ে গিয়েছিল, জলে এবং আকাশেও ঘুরে বেড়াতো তাদের কেউ না কেউ, তখনই পৃথিবীতে সূচনা হয়েছিল তুষার যুগের। তুষার

যুগ মানেই ভয়ঙ্কর বিপর্যয় এবং এই বিপর্যয় চলেছিল লক্ষ লক্ষ বছর। তার পরে পরেই আবার সূচিত হয়েছিল উষ্ণ পরিবেশের। পরিবর্তিত পরিবেশগুলোকে তারা মানিয়ে নিতে পারেনি।

(৩) উদ্ভিদ রাজ্যের পরিবর্তন ঃ

পরিবেশের পরিবর্তন এসেছিল, এটা ঠিক। সেই পরিবর্তন প্রভাবিত করেছিল সেকালের উদ্ভিদরাজ্যকে। আগে ছিল সাইকাস, কনিফার প্রভৃতি ব্যক্ত বীজী উদ্ভিদের অরণ্য। সারা বছর তাদের পাতা থাকতো। সহসা কোথায় যেন তারা হারিয়ে গেল। পরিবর্তে এলো সপুষ্পক, কাষ্ঠল ও ফলবান বৃক্ষ। ওদের অনেকের আবার শীতকালে পাতা ঝরে যেতো। এই সব গাছের পাতা খেতে তারা অভ্যস্ত ছিল না। ধনীর দুলালের মত মোটা মোটা খসখসে পাতা মুখে বাধলো। খাদ্যাভাবে ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে গেল তৃণভোজী ডাইনোসোররা। আর তৃণভোজীদের উপর নির্ভর করতো যেসব মাংসাশী ডাইনোসোর তাদের মধ্যে দেখা দিল চরম খাদ্যাভাব।

(৪) কীটপতঙ্গ, ভাইরাস ইত্যাদির আক্রমণ ঃ

উদ্ভিদরাজ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কীটপতঙ্গের বাড় বাড়ন্ত হয়। ওদেরও বিশেষ কোন বড় শত্রু না থাকায় এন্তার বংশবিস্তার করে চলেছিল। ওদের শূক পোকারা খেয়ে ফেলতো গাছের পাতা। ক্ষতিকর পোকামাকড়, ভাইরাস ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্তও হয়েছিল। অপরদিকে ফুলের পরাগও তাদের নানা রকমের রোগকে ডেকে এনেছিল।

(৫) ডিমের নিরাপত্তার অভাব ঃ

স্ত্রী ডাইনোসোররা নিজেদের ডিমের রক্ষণাবেক্ষণ করতো না। অর্থাৎ সন্তান পালন তাদের ধাতে ছিল না। স্বর্গের অপ্সরাদের মত যেখানে সেখানে ডিম পেড়ে এবং ডিমকে ফেলে দিয়ে চলে যেতো। কোন খোঁজখবর রাখতো না।

সে সময় স্তন্যপায়ী মাংসাশী প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল। ওরা আকারে ছিল ছোট। ডাইনোসোরদের ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কাল কাটাতো, এবং কঠোরভাবে সংগ্রাম করে আহার্য সংগ্রহ করতো। সাধারণত রাতে ওরা বার হতো—যখন মজা করে ঘুমতো ডাইনোসোররা। তাদের ডিমগুলো ছিল ইয়া বড় বড়—ফুটবলের চেয়েও বড়। সহজে চোখেও পড়তো এবং এই উপাদেয় ডিমকে তারা খেয়ে ফেলতো। তাই অধিকাংশ ডিম হারিয়ে যেতো।

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে ডাইনোসোররা যখন অতিকায় হয়ে উঠেছিল, অর্থাৎ ওদের রাজত্বের শেষের দিকে স্ত্রী ডাইনোসোররা যে ডিম পাড়তো—তার খোলকটা ভয়ানক পুরু হতো। পুরু সেই আস্তরণটাকে ভেদ করে অধিকাংশ শিশু ডাইনোসোর পৃথিবীর আলো দেখতে পেত না। অপরদিকে ডিমের খোলকের উপাদান ক্যালসিয়াম কার্বনেট। ডিম পাড়লে স্ত্রী ডাইনো-

সোরদের দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম খরচ হতো বলে তাদের রক্তে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি ঘটতো। তাতে নানা ধরণের রোগে আক্রান্ত হতো স্ত্রী ডাইনোসোররা।

(৫) উল্কাপাত :

অনেক বিজ্ঞানীর মতে সে সময় পৃথিবীর বুকে দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল প্রচণ্ড উল্কা বর্ষণ। উল্কা বর্ষণের কারণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করতে চাইছেন, আমাদের সূর্য নাকি যুগল নক্ষত্র। কিন্তু তার সঙ্গীটি মারা গেছে— কবে কোন সদূর অতীতে। দূরত্বও বড় কম নয়। প্রায় আড়াই কোটি বছর অন্তর অন্তর ঐ মৃত নক্ষত্রটি সূর্যের কাছাকাছি আসে। তার প্রভাবে সৌর-জগতে ঘটে প্রচুর উল্কাবর্ষণ। উল্কাপাতের ফলে সেই সব সুবৃহৎ ডাইনো-সোররা মারা গেছে।

(৭) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত :

একদল বিজ্ঞানী মনে করেন, সাত কোটি বছর আগে বেশ কিছু আগ্নেয়-গিরি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং জন্মও নিয়েছিল। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বিষাক্ত ধাতু সেলেনিয়াম ভূ-পৃষ্ঠে এসে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেগুলো সঞ্চিত হয়েছিল উদ্ভিদ দেহে। সেই উদ্ভিদদের খেয়ে ওদের দেহে সূচিত হয়েছিল বিষক্রিয়া।

(৮) মহী সঞ্চরণ ও আবহাওয়ার পরিবর্তন :

ডাইনোসোররা যখন আবির্ভূত হয়েছিল তখন পৃথিবীর স্থলভাগ ছিল অখণ্ড। ওদের রাজত্বের শেষের দিকে সেই স্থলভাগের ভাঙ্গন শুরু হয়। শুধু তাই নয়, ভাঙ্গনের ফলে বিচ্ছিন্ন স্থলভাগসমূহ ক্রমশ দূরে দূরে সরতে থাকে। অর্থাৎ সঞ্চরণশীল হয়ে ওঠে স্থলভাগ (সঞ্চরণ এখনও অব্যাহত আছে)।

মহী সঞ্চরণের দরুন, সাগর গর্ভে আগ্নেয়গিরির জন্ম হয়। প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎ-পাতের ফলে নতুন নতুন স্থলভাগ জেগে ওঠে। সাগরের জলতল বেড়ে যায়। অন্যান্য আরও কয়েকটি কারণে সাগরের জলরাশি উপকূলভাগের অধিকাংশ গ্রাস করে ফেলে। আবহাওয়ারও আসে পরিবর্তন। বিশেষ করে কোন কোন স্থলভাগ কখনও কখনও মেরুর দিকে সরে গেছে, আবার কোনটি নিরক্ষ-প্রদেশের কাছাকাছি হয়েছে। এই সব পরিবর্তনে আবহাওয়ায় এসেছিল নানা রূপান্তর। উষ্ণযুগের সূচনাও হয়। পরিবর্তনগুলো মানিয়ে নিতে পারেনি ডাইনোসোররা।

(৯) পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন :

নানা ভূ-তাত্ত্বিক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর বার বার পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তনকালে পৃথিবীর ঊর্ধ্বে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত চৌম্বক ক্ষেত্রেরও পরিবর্তন ঘটে। ক্রমশ ক্ষেত্রটা দুর্বল হতে হতে একসময় শূন্যে পরিণত হয়। উক্ত সময়কালে মহাকাশ থেকে বহু ক্ষতিকর রশ্মি ও

কণা সহজে নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। জীবদেহে ওদের প্রতিক্রিয়া হয় মারাত্মক। অর্থাৎ জীবজগতের অধিকাংশকে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যেতে হয়।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, প্রতি আট থেকে নয় কোটি বছরের মধ্যে এই পরিবর্তনের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ডাইনোসোরদের অবলুপ্তির পর থেকে প্রায় সাত কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তেমন দুর্ঘটনা আসতে হয়তো কোটি বছর লেগে যাবে। তবে তার আগেও আসতে পারে। কাল যেখানে বিপুলা, সেখানে কোন ভবিষ্যদ্বাণী খাটে না। অবশ্য পরিবর্তন ধীরে ধীরে সূচিত হয়। পূর্ণ পরিবর্তন আসতে আসতে লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রান্তও হয়ে যায়।

যাই হোক না কেন, উপরোক্ত মতবাদগুলোর পেছনে যেমন বলিষ্ঠ যুক্তি আছে, তেমনই বিরুদ্ধ মতবাদও বড় কম নেই। তাই জিজ্ঞাসার প্রকৃত সমাধান এখনও হয়নি। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত যুক্তি তর্কের অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত কারণ নির্ণয় করবে বিজ্ঞান। সেই সঙ্গে মানুষ তার নিজের ভাগ্য-লিপিটাও পাঠ করতে পারবে। আরও সত্য, জীবজগতের অবলুপ্তির মূলে আছে পরিবেশের পরিবর্তন। এই পরিবর্তন কিন্তু অহরহ চলছে। তবে এত কম যে, কয়েক শত বছরেও মানুষ টের পায় না।

চলমান মহাদেশ

আমরা জানি, অনন্ত মহাশূন্যে নির্দিষ্ট কক্ষপথে থেকে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্ররা অহরহ পরিভ্রমণ করতে থাকে। ঘুরছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, ঘুরছে নক্ষত্র জগৎ বা গ্যালাক্সী, ঘুরছে আমাদের জননী পৃথিবীও। আর আমরা—পৃথিবীর সমূহ জীবরা ঘুরে মরছি আপন আপন প্রয়োজনে। কিন্তু আমরা—এই পৃথিবীর জীব জগৎ যাদের বুকে দাঁড়িয়ে আছে—সেই স্থলভাগ এবং জলভাগগুলো?

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, পৃথিবীর স্থলভাগগুলো—সেই এক একটি বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ, যা আমাদের কাছে মহাদেশ নামে পরিচিত—তারাও ঘুরতে আছে। আর মহাসাগরগুলোও প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হতে আছে।

হ্যাঁ স্থলভাগগুলো পথ পরিক্রমা করতে আছে। তাই বলে আকাশের জ্যোতিষ্কদের মত নিজ অক্ষের চারদিকে পাক খেতে খেতে এত তীব্র

গতিতে অগ্রসর হচ্ছে না। পাকও খাচ্ছে না। অগ্রসর হচ্ছে একটু একটু করে। এত সামান্য তাদের গতি যে. সহসা কারও সন্দেহ হয়না, হাজার পুরুষে ধরতেও পারি না আমরা। তবু চলছে, চলছে, আর চলছে। চির-কালই চলতে আছে, চলার তার বিরাম নেই।

কী পরিমাণে বা কেমন গতিতে স্থলভাগ এগিয়ে চলেছে ?

বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই গতি বছরে মাত্র কয়েক মিলিমিটার থেকে কয়েক সেণ্টিমিটার। হাজার বছরে কয়েক মিটার থেকে কয়েক ডেকামিটার। এত সূক্ষ্ম যার গতি, তাকে ধরবো কেমন করে ?

কিন্তু পৃথিবীর স্থলভাগটা তো আজকের নয়, প্রায় চারশ কোটি বছর আগে গড়ে উঠেছিল। এমন অল্প গতিকে যদি কোটি বছরের হিসেবে ধরা হয়, তাহলে পরিমাণটা কত দাঁড়াবে—তা সহজে অনুমান করা যেতে পারে। তখন ব্যবধান দাঁড়াবে কয়েকশ কিলোমিটার এবং ঠিক সেই রকমই হয়েছে। অর্থাৎ অতি তুচ্ছ ও নগণ্য হলেও মহাকালের দরবারে তাকে কিছুতেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা যায় না।

চলমান মহাদেশের কথা ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রথম জার্মান বিজ্ঞানী ওয়েগনার দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করলেও আগে এ বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে প্রখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক রোজার বেকন পৃথিবীর মানচিত্রে আটলাণ্টিক মহাসাগরের দুই তীরের স্থলভাগগুলো তটরেখা লক্ষ্য করে একটা প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাতে উল্লেখ করেছিলেন সম্ভবত আটলাণ্টিক সহাসাগরের দুপাশের স্থলভাগ এককালে যুক্ত অবস্থায় ছিল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফন হামবোল্টও ঠিক একই মনোভাব পোষণ করেছিলেন। তবে তিনি একটা কারণও উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন, আটলাণ্টিকের দু পাশের স্থলভাগ এককালে যুক্ত ছিল। পরে সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাত খেয়ে খেয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে গেছে।

হামবোল্টের পরে আরও কোন কোন বিজ্ঞানী অনুরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মার্কিন বিজ্ঞানী টেলর এবং ফরাসী বিজ্ঞানী স্পাইডার অন্যতম। এঁদের অভিমত ছিল, সুদূর অতীতে আটলাণ্টিক মহাদেশ ছিল না। দুপারের দুটি স্থলভাগ অখণ্ডই ছিল। পরে কোন কারণে স্থলভাগটা ভেঙ্গে গিরে দূরে সরে গেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহুজনে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন সত্য কিন্তু তাঁদের সন্দেহের প্রতি কেউ তেমন গুরুত্ব আরোপ করেননি, বা বিজ্ঞানও স্বীকার করে নেয়নি তাঁদের মতবাদকে। অবশেষে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী ওয়েগনার স্থলভাগের ভাঙ্গনের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন এবং তত্ত্বগুলোর মাধ্যমে আপন বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ওয়েগনারের তত্ত্বগুলোকে অবলম্বন করে সেদিন বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট সাড়া পড়ে যায় এবং তত্ত্বগুলোকে যাচাই করতে সচেষ্ট হন অনেকে। তাঁর তত্ত্বের মধ্যে অবশ্য কিছু ভুলভ্রান্তি ছিল। সেই তত্ত্বগুলোকে কিছু সংশোধন ও রদবদল করেন বিজ্ঞানী ডু-টয়েট। সেই সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়া হয় চলমান মহাদেশের কথা।

তারপরও কেটে যায় অনেক কাল। অবশেষে বিজ্ঞানীরা প্লেট-টেক্টনিস মতবাদের পরিকল্পনা করলে চলমান মহাদেশের কল্পনাকে পুরোপুরিভাবে মেনে নেওয়া হয়। এখন চলমান মহাদেশ সম্বন্ধে আর কারও মনে কোন সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানও পুরোপুরিভাবে মেনে নিয়েছে ওয়েগনারের তত্ত্বটিকে।

তত্ত্বটিকে মেনে নেওয়ার পেছনে বেশ কয়েকটা যুক্তি খাড়া করা হয়েছে। প্রথম যুক্তি হলো সাদৃশ্যগত মিল। পৃথিবীর মানচিত্রে মহাদেশগুলোর কোন কোন উপকূল ভাগের সীমারেখার মধ্যে আশ্চর্য ধরণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব-উপকূলভাগের সঙ্গে ইউরোপের পশ্চিম উপকূল যেন খাপে খাপে জোড়া লেগে যায়। তেমনই জোড়া লেগে যায় উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলভাগের সঙ্গে ইওরোপের পশ্চিম উপকূল-ভাগ।

তবে বিজ্ঞানীরা একমাত্র সাদৃশ্যগত মিলকে গুরুত্ব দিয়ে চলমান মহা-দেশের কল্পনাকে মেনে নেননি। আরও কতকগুলো তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি মতবাদের কথা উল্লেখ না করলে নয়। সেই মতবাদটি আদিম স্থলভাগ সম্বন্ধীয়। বলা হয়েছে, আদিম স্থলভাগ একটিই ছিল। বিশাল সে স্থলভাগ। অর্থাৎ আজকের মহাদেশ তথা এশিয়া, ইওরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্টেলিয়া ও আন্টার্কটিকা মিলে মিশে একেবারে একাকার হয়ে অবস্থান করছিল। সেই আদিম স্থলভাগটাকে ঘিরে ছিল বিশাল মহাসমুদ্র। বিজ্ঞানীরা সেই আদিম স্থলভাগ এবং জলভাগের নামকরণও করেছেন। স্থলভাগটির নাম রেখেছেন প্যানজিয়া এবং মহাসমুদ্রের নাম প্যানথালসা।

আজ থেকে প্রায় কুড়ি কোটি বছর আগে স্থলভাগটিতে ফাটলের সৃষ্টি হয় এবং ভাঙ্গতে শুরু করে। প্রথমে মূল ভূখণ্ডটি একরকম মাঝ বরাবর ফাটল ধরে, তারপর খণ্ড খণ্ড হয়ে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। এই ফাটলটা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল। উত্তরের অংশটির নাম রাখা হয়েছে লরেসিয়া এবং দক্ষিণের অংশটির নাম গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। লরেসিয়ার অন্তর্ভুক্ত যারা ছিল তারা আজকের-ইওরোপ, উত্তর আমেরিকা, এশিয়া ও গ্রীণল্যাণ্ড। বাদবাকী ভূখণ্ডগুলো তথা ভারত, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, মাদাগাস্কার আণ্টার্কটিকা এবং অস্ট্রেলিয়া ছিল গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

ভাঙ্গন শুরু হওয়ার পর এরা দূরে সরতে থাকে। ফলে মাঝখান বরাবর

গড়ে ওঠে জলের ব্যবধান। সেই জলভাগটার নাম টেথিস সাগর। অপর-দিকে বিচ্ছিন্ন অংশগুলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে মহাসমুদ্রের বুকে। ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠতে থাকে এবং প্রায় ন'কোটি বছর আগে দূরত্ব হয় সর্বাধিক। সেদিনও টেথিস সাগর ছিল। ছিল না ইওরোপের আল্পস, ছিল না ভারতের উত্তরে হিমালয়। প্রায় ছয় কোটি বছর আগে স্থলভাগগুলো বিচরণ করতে করতে কিছু কিছু একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। মুছে যায় টেথিস সাগর এবং ঐ-সময়ই আজকের মহাদেশগুলো মোটামুটি একটা রূপ লাভ করেছিল। এটি সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করেছে আজ থেকে মাত্র দশ লক্ষ বছর আগে।

খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত স্থলভাগগুলো চলতে গিয়ে কেউ কেউ দূর থেকে দূরান্তরে সরে গেছে, কেউ কেউ বা বিপরীতমুখী গতি লাভ করেছে। যেমন দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক দূরে চলে গেছে, অপর দিকে ভারত প্রভৃতি কয়েকটি ভূখণ্ড এশিয়া ও ইওরোপের সঙ্গে এসে জুড়ে গেছে। ঐ বিপরীতমুখী গতির জন্য টেথিস সাগর মুছে গেছে। টেথিসের তলায় যে পলি ছিল, তা দুটি ভূখণ্ডের ধাক্কায় ভাঁজ পড়ে কালক্রমে রূপ নিয়েছে ভঙ্গিল পর্বতে। হিমালয় ও আল্পস এই জাতের। গণ্ডোয়ানা অন্তর্গত ভারতবর্ষ ছিল শুধু দক্ষিণ ভারতটাই। বিপরীতমুখী গতিতে এগিয়ে যাওয়ার ফলে মাঝে উৎপন্ন হয়েছে হিমালয় এবং উত্তর ভারত গড়ে উঠেছে নদী বাহিত পলি দিয়ে।

কিছু নিদর্শনের উপর গুরুত্ব দিয়ে ঐ বিভাজন এবং তাদের এগিয়ে চলাকেও বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন। তাঁরা নানা ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, বিচ্ছিন্ন মহাদেশগুলোর আবহাওয়া বারে বারে পরিবর্তিত হয়েছে। চিরকালই একই জায়গায় যদি অবস্থান করতো তাহলে বিভিন্ন যুগে গঠিত সেখানকার পাললিক শিলাস্তরগুলোকে পরীক্ষা করলে একই ফল পাওয়া যেতো। কিন্তু তা পাওয়া যায় নি। ভারতের কথাই ধরা যেতে পারে। শিলাস্তরগুলো পরীক্ষা করতে গিয়ে ধরা পড়েছে; ত্রিশ কোটি বছর আগে দক্ষিণ ভারতটা ছিল একেবারে হিমশীতল জায়গা। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি চিরকাল অবস্থান করলে কিছুতেই শীতলস্থান হতে পারতো না। তাই এটি তখন ছিল দক্ষিণমেরুর কাছাকাছি।

চলমান মহাদেশ সম্বন্ধে মতবাদকে সমর্থন করতে বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগের নানা নিদর্শনকেও পরীক্ষা করা হয়েছে। সেই নিদর্শনগুলোর মধ্যে জীবাশ্ম অন্যতম। আজকের দিনে যাদের বিচ্ছিন্ন মহাদেশ বলে মনে করা হচ্ছে তাদের জীবাশ্মগুলোর মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত মিল। বর্তমান জীব-জগতের বেলায়ও এটি প্রকট। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার-জীবজন্তুর মধ্যে বেশ একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাই নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন চলমান মহাদেশের কথা।

এখন প্রশ্ন আসে, স্থলভাগ ভাঙ্গলো কেন ? কেনইবা দূরে গেল ?

এই নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক জল্পনা কল্পনা করেছেন। এককালে বিভিন্ন মতবাদও রেখেছিলেন। তবে সেগুলোর সবটাকে মেনে নেওয়া হয়নি। প্রথম প্রথম উল্লেখ করা হয়েছিল, স্থলভাগের ভাঙ্গন ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মূলে পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ শক্তি এবং নিয়মিত জোয়ার ভাটা। আর ঐ একই কারণে স্থলভাগগুলো দূরে দূরে সরে গেছে। স্থলভাগগুলো পশ্চিমমুখী গতিও লাভ করেছে জোয়ার ভাটার জন্যই।

এই মতকে মেনে নেওয়া হয়নি। ভূবিজ্ঞানী ভ্যালি এই-মতের বিরোধিতা করেছিলেন এবং তাঁর মতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই ভাঙ্গন ও বিচ্ছিন্নতার মূলে দায়ী।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহাদেশের ভাঙ্গনের মূলে প্লেটটেকটানিকস মতবাদকে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই মত অনুযায়ী ভূ-স্তর অনেকগুলোর ছোট-বড় প্লেট নিয়ে গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে ৬টি প্রধান। এগুলোর এক একটি প্রায় ১০০ কিলোমিটারের মত চওড়া এবং অবস্থান করছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে ম্যানটেলের উপর। ঐ প্লেটগুলোর উপরেই মহাদেশ ও মহাসমুদ্র সবাই অবস্থান করছে।

প্লেটগুলো অচল ও অনড় নয়। সব সময় নড়াচড়া করছে। স্থিতিশীলও নয়—গতিশীল। ওদের পরস্পরের গতি এবং প্রক্রিয়ার ফলেই ভূ-পৃষ্ঠের অনুরূপ গড়ন গড়ে উঠেছে।

আরও বলা হয়েছে, যে কোন দুটো প্লেটের পার্শ্বিকগতির ফলে বিচ্ছিন্ন অংশের সৃষ্টি হয়। যখন একটা প্লেট আর একটা প্লেটের তলায় আসে তখন ফাটল বা খাতের সৃষ্টি হয়। আবার দুটো প্লেট পরস্পরের কাছ থেকে যখন দূরে সরে যায় তখন সৃষ্টি হয় নতুন ত্বকের। গতিশীল এই প্লেটগুলোর জন্যই মহাদেশ সচল আছে এবং সমুদ্রের অবস্থান ও পরিবর্তন হচ্ছে। প্রমাণ করা হয়েছে, ভারত মহাসাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগর ক্রমশঃ বাড়ছে এবং প্রশান্ত মহাসাগর সঙ্কুচিত হচ্ছে। এককালে গণ্ডোয়ানা-ল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ভারত ছিল দক্ষিণ গোলার্ধে। সেটি দশ কোটি বছর আগে ক্রমশঃ উত্তর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। তারপর ৬ কোটি বছর আগে আরও সরে এসে এশিয়ার সঙ্গে ধাক্কা খায়। টেথিস সাগরকে মুছে ফেলে জন্ম দিয়েছে হিমালয়কে। এখনও সে গতি অব্যাহত আছে। যার ফলে এখনও এখানকার ভূত্বকের গঠন সম্পূর্ণ হয়নি এবং এই কারণে এখানে ভূমিকম্পের এত প্রকোপ। হিমালয় যে টেথিস সাগরের তলায় ছিল, তার প্রমাণ হিমালয়ে সামুদ্রিক শঙ্খ, আদিকালে অ্যামোনাইটের জীবাশ্ম ইত্যাদি।

অ্যাণ্টার্কটিকা পৃথক হয়ে সরে গেছে দক্ষিণের দিকে। তারও প্রমাণ সেখানকার প্রাপ্ত জীবাশ্ম। এই দুটি স্থলভাগ পরস্পর বিপরীত দিকে সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে জলের ব্যবধান—ভারত মহাসাগর। এমনটি

অন্যান্য স্থলভাগের ক্ষেত্রেও হয়েছে।

যাই হোক, বিজ্ঞানীদের প্রদত্ত তত্ত্ব অনুযায়ী মহাদেশ চলছে, সাগর চলছে, তথা আমাদের পায়ের তলার মাটি স্থির নয়। অনাগত ভবিষ্যতে এর চেহারাটা কেমন হবে, তা কে বলতে পারে।

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র

পৃথিবী জীববাসের উপযোগী হয়ে উঠেছে নানা কারণে। তাদের মধ্যে একটি পৃথিবীর সুবিশাল চৌম্বক ক্ষেত্র। যার জন্য মহাকাশ থেকে ছুটে আসা মারাত্মক কণিকা সমূহ পৃথিবীপৃষ্ঠে সরাসরি নেমে আসতে পারে না। সেগুলো পৃথিবীর শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে আটকে যাচ্ছে, নয়ত পুনরায় মহাকাশে ফিরে যাচ্ছে।

পৃথিবী নিজেই যে একটা চুম্বক এই সত্য ধরা পড়ে চুম্বক আবিস্কারের পরে। পৃথিবীপৃষ্ঠে স্বাভাবিক চুম্বক লাভ করার ফলে, দীর্ঘকাল ধরে পড়ে থাকা লোহার মধ্যে চুম্বকের গুণ লক্ষ্য করার ফলে এবং ঝুলন্ত চুম্বকের একটি মেরু সব সময় উত্তর দিকে মুখ করে থাকার ব্যাপার লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীরা সেদিন রায় দিয়েছিলেন, পৃথিবী নিজেই একটি চুম্বক।

সেই সঙ্গে একটা প্রশ্নও আসে বিজ্ঞানীদের মধ্যে—পৃথিবী কেমন করে লাভ করলো চুম্বকত্ব?

এর উত্তরে সেদিন অনেকে অনেক ব্যাখ্যাই প্রদান করেছিলেন। কেউ কেউ মন্তব্য করেছিলেন, পৃথিবীর কেন্দ্র ভেদ করে উভয় দিকে মেরু পর্যন্ত বিরাট এক চুম্বক অবস্থান করছে। অপর আর একদল অনুমান করেছিলেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরে চুম্বক তৈরির কাজ চলছে। অবশ্য ভূপৃষ্ঠে স্বাভাবিক চুম্বক পাথর "লোড ষ্টোন" লাভ করেই বিজ্ঞানীরা অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

যে সময় উপরোক্ত ধারণাগুলো বিজ্ঞানীদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল সে সময় পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা ছিল না বিজ্ঞানীদের। পরে ধরা পড়ে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে এত প্রচণ্ড তাপমাত্রা যে সেখানে কোন কিছু কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে না বা এত তাপমাত্রায় কোন পদার্থে চৌম্বকত্বও বজায় থাকত পারে না। অপরদিকে ভূপৃষ্ঠের অল্প গভীরে এত চৌম্বক পদার্থ নেই যার দ্বারা পৃথিবীর একটা বিশাল চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি হতে পারে।

তদ্‌পরি নানা আবিস্কার থেকে প্রমাণিত হলো, পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রটা ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে থাকে! আদিতে ছিল অতি দুর্বল।

উপরোক্ত মতবাদগুলো বাতিল হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা নতুন করে ভাবনা চিন্তা শুরু করলেন। এক সময় বিদ্যুতের কলাকৌশল সম্বন্ধে জ্ঞাত হলেন বিজ্ঞানীরা। আর তখনই তাঁরা এক নতুন মতবাদ আনয়ন করলেন।

সেই মতবাদ অনুযায়ী—পৃথিবীপৃষ্ঠে কিছু কিছু স্থির তড়িৎ বিদ্যমান (পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে)। পৃথিবীর আছে আহ্নিকগতি—আপন মেরুদণ্ডের উপর ক্রমাগত ২৪ ঘণ্টায় একবার করে পাক খাচ্ছে। তাই অনেকের বিশ্বাস, পৃথিবীর আহ্নিকগতি এবং চৌম্বক ক্ষেত্র পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থিত যত ভারী ভারী পদার্থ না তরল না কঠিন—এমন এক অবস্থায় আছে। আহ্নিকগতির ফলে সেই অর্ধেক তরল পদার্থের মধ্যে সব সময় সৃষ্টি হচ্ছে আলোড়ন। এবং সেই আলোড়নের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে তড়িৎচুম্বকীয় আবেশ। তার ঐ আবেশের ফলে উৎপন্ন হচ্ছে বিদ্যুৎ তরঙ্গ। অনুরূপভাবে উৎপন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহ পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রটাকে সৃষ্টি করেছে। এবং যত দিন যাচ্ছে ততই প্রসারিত হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্র। ভবিষ্যতে আরও প্রসারিত হবে।

বর্তমানে আবার নতুন কথাও শোনা যাচ্ছে, কেউ কেউ বলছেন পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের সংকোচন ও প্রসারণ হয়। সংকুচিত হতে শুরু করলে এক সময় শূন্যে এসে যায়। তারপর আবার শুরু করে প্রসারিত হতে।

চাঁদের পৃষ্ঠদেশ

আদিযুগে অসহায় মানুষের কাছে চাঁদ ছিল দেবতা—মিষ্ট মধুর হাসিতে রাত্রির নিশ্ছিদ্র অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করে দিত বলে। দার্শনিকের যুগে চাঁদ ছিল স্বর্গের একটি লোক—যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, সেখানে দুঃখ নেই, শোক নেই, জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, নিরবচ্ছিন্ন এক সুখের স্থান—চন্দ্রলোক। সশরীরে মানুষ যেতে পারে না সেখানে। সহস্র সহস্র সুকৃতির বলে মৃত্যুর পরে মানুষের পরমাত্মাই সেখানে যেতে পারে। দার্শনিকরা আরও মনে করতেন চন্দ্রপৃষ্ঠ পৃথিবী অপেক্ষাও মনোরম স্থান—অমরাবতীর অংশ। সেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান। গাছে গাছে পুষ্পসম্ভার, নদী ও সাগরে অমৃত, মাটিতে মণিমাণিক্যের ছড়াছড়ি।

চন্দ্রপৃষ্ঠকে প্রথম দূরবীনের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মহামতি

গ্যালিলিও। হ্যাঁ, সে দূরবীন তাঁর নিজেরই আবিষ্কার। যদিও আজকের মানমন্দিরে স্থাপিত দূরবীনের তুলনায় সে ছিল একটি খেলনা।

তথাপি গ্যালিলিও প্রত্যক্ষ করেছিলেন কালো কালো—ছায়া ছায়া কতকগুলো অংশকে। গ্যালিলিও ভেবেছিলেন, এগুলো সাগর। বুঝিবা দার্শনিক তত্ত্বে তিনিও কিছুটা বিশ্বাসী ছিলেন। তাই নাম রেখেছিলেন "মেয়ার" বা অমৃত সাগর এবং "মারিয়া" বা শান্তি সাগর।

গ্যালিলিও আরও ভেবেছিলেন, সেখানে জল আছে, গাছ-গাছড়া আছে, জীবজন্তুর আবাস আছে, হয়ত বা মানুষের মত জীবও আছে। তাদের সঙ্গে মিতালি করতে বুঝিবা সাধ হয়েছিল তাঁর। কিন্তু সাধ্য ছিল না। চাঁদ যে অনেক অনেক দূরে, দূর মহাকাশে। যাওয়া যাবে কেমন করে? শুধু সম্ভব অসম্ভব নানা কাহিনীই লোক মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল।

গ্যালিলিওর পরে পরে আরও শক্তিশালী দূরবীন তৈরি হলো। যেহেতু পৃথিবীর নিকটতম ঐ জ্যোতিষ্কটির প্রতি চিরকাল মানুষের আকর্ষণ, তাই প্রথমে চাঁদের রহস্য উদ্ঘাটনে সবাই প্রয়াসী হয়েছিলেন।

এত দিনে ধরা পড়লো, না—জল টল কিছু নেই। পাহাড় পর্বতের উচ্চতা নির্ণয় করতে গিয়েও অবাক হলেন তাঁরা। এ কী! এক একটা পর্বত শৃঙ্গ পৃথিবীর সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট থেকেও যে উঁচু। ৩০,০০০ ফুট! চাট্টিখানি কথা! তাদের নামকরণও করা হলো। তবে নতুন কোন নামে নয়, পৃথিবীর পর্বতগুলোর নাম অনুসারে আল্পস্, কার্পেথিয়ান ইত্যাদি।

আর খাতগুলো! তাদেরও গভীরতা নির্ণয় করা হলো। এমন গভীর সে সব খাত যে, সূর্যরশ্মিও প্রবেশ করতে পারেনা। পৃথিবী থেকে তাই কালো কালো ছায়ার মত দেখা যায়। চাঁদের কলঙ্ক। তবে হ্যাঁ, প্রথম প্রথম ঐ খাতগুলোকে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ বলে ভাবা হয়েছিল। তাদের নামকরণ করা হয়েছিল পৃথিবীর বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের নামে। যেমন প্লেটো, কোপারনিকাস, কেপলা ইত্যাদি। সব চেয়ে বড় যে গহ্বরটিকে তাঁরা দেখেছিলেন তার নামকরণ করেছিলেন ক্লেভিয়াস।

আরও পরের ঘটনা। দূরবীনের হল অভাবনীয় উন্নতি। নানা জায়গায় আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য স্থাপিত হলো মানমন্দির। অতি শক্তিশালী সেই সব দূরবীনের সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের ছবিও সংগ্রহ করা হলো। এবার প্রমাণিত হলো, খাতগুলো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ নয়। চাঁদের আবহমণ্ডল না থাকায় আকাশ থেকে উল্কারা সরাসরি চাঁদের পিঠে নেমে আসে। অঙ্কন করে দিয়ে যায় সুগভীর ক্ষতচিহ্ন। জলপ্রবাহ এবং বায়ুপ্রবাহ না থাকায় সেই খাতগুলো চিরকাল একই অবস্থায় বিরাজ করছে।

চাঁদের উৎপত্তি সম্বন্ধেও আগের মনোভাবের পরিবর্তন হলো। আগে ধারণা ছিল, চাঁদ এককালে পৃথিবীর অংশ ছিল। জর্জ ডারউইনের মতবাদ অনুসারে পৃথিবীর জন্মের কিছু পরে যখন তার দেহখানা অত্যন্ত তপ্ত ও

অর্ধতরল ছিল এবং আবর্তন বেগ ছিল অতি প্রবল, তখন তার বিষুব অঞ্চল থেকে এক বিশাল বস্তুপিণ্ড ছিটকে বেরিয়ে আসে। সেই বিচ্ছিন্ন অংশটি মহাকাশে হারিয়ে না গিয়ে পৃথিবীর আবর্তনের আওতায় থেকে যায়।

সেদিন চাঁদের আয়তনটাও নির্ণয় করেছিলেন। মোটামুটি একটি হিসেব। তাতে দেখা গিয়েছিল, পৃথিবীর প্রশান্ত মহাসাগরের যে আয়তন, চাঁদের আয়তনও তাই। অতএব চাঁদ যে এককালে পৃথিবীর অংশ ছিল সে বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ ছিলেন। পৃথিবী থেকে চাঁদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পেছনে আরও অনেকে অনেক যুক্তি দেখিয়েছিলেন। কেউ বলেছিলেন, স্বেচ্ছাচারী এক অতিকায় নক্ষত্র পৃথিবীর পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় চাঁদকে বিচ্ছিন্ন করেছিল; আবার কেউ বলেছিলেন, এক বিশাল উল্কাপিণ্ডের আঘাতে চাঁদ বিচ্ছিন্ন হয়েছে পৃথিবী থেকে। অর্থাৎ সেদিনের বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর এই একটি মাত্র উপগ্রহ চাঁদ—পৃথিবীর আত্মজ।

সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান হয়েছে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের দিকে কৃত্তিম উপগ্রহকে মহাকাশে উৎক্ষেপন করতে গিয়ে। অপরাপর বহু উদ্দেশ্য থাকলেও পৃথিবীর নিকট প্রতিবেশীগুলোর রহস্য ভেদ করা ছিল অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। মহাকাশবিজ্ঞানও মহাকাশযানের দ্রুত উন্নতির ফলে একদিন মানুষ অবতরণ করলো চাঁদে। না, মাত্র একবার নয়—ছয় ছয় বার। চাঁদের যে অংশটিকে পৃথিবী থেকে দেখা যায় না তারও ছবি তুলে এনেছিল লুনা ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে।

চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষ প্রথম অবতরণ করে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই। চন্দ্র যানটির নাম ছিল অ্যাপলো-১১। অভিযাত্রী ছিলেন নীল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স এবং এডুইন অলড্রিন। পৃথিবী থেকে তাঁরা যাত্রা করেছিলেন চার দিন আগে ১৬ই জুলাই তারিখে। লুনাখোদ-১ নামে একটি গাড়ীতে আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন চন্দ্র পৃষ্ঠে বিচরণও করেছিলেন। সেই প্রথম সঠিক তথ্য তাঁরাই সংগ্রহ করে ফিরে এলেন পৃথিবীর বুকে।

চাঁদে জল নেই, বায়ুমণ্ডল নেই, নেই জীব ও উদ্ভিদের কোন পরিবেশ। (১৯৭২ সালে মহাকাশচারীরা অবশ্য চাঁদে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও আর্গন গ্যাসের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন)। চারদিকে শুধু ধুলাবালি, কাঁকর ও পাথরে ভর্তি এবং অসংখ্য খাত। উল্কা পতন হামেশাই ঘটছে। বাপরে বাপ, সে কী বিশাল—যেন এক একটা পাহাড়ের আধখানা। ১৯৭২ সালে সেখানে এমন একটা উল্কার পতন হয়েছিল, যার ওজন ছিল ২২০০ পাউণ্ড। চাঁদে আবহমণ্ডল নেই কিনা! পৃথিবীর মত ওরা আকাশে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারেনা।

আবহমণ্ডল না থাকায় চন্দ্র-পৃষ্ঠের কোন ক্ষয় বা কোন পরিবর্তন হয়নি। আবহমান কাল ধরে একই ধরণের রয়েছে তার পৃষ্ঠদেশ। সূর্যের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটেনা বলে চাঁদের আকাশ কালো। পৃথিবীর মানুষেরা

যে পায়ের দাগ এঁকে দিয়ে এসেছেন পুনরায় কেউ গিয়ে সে দাগ মুছিয়ে দিয়ে না এলে চিরকাল অটুটই থাকবে।

চন্দ্রপৃষ্ঠ বড় ভয়ঙ্কর জায়গা। পৃথিবীর মত জল নেই, বাতাস নেই, নেই কোন পরিবেশ। মরুভূমির বরং একটা শোভা আছে, চাঁদের তাও নেই। বিশেষ পোষাক পরে এবং পৃথিবীর পরিবেশকে বহন না করে নিয়ে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। তাপমাত্রাও বড় ভয়ঙ্কর। খাতে ভরা বন্ধুর চন্দ্রপৃষ্ঠে পায়ে হাঁটাও কষ্টকর। সামনাসামনি কথাবার্তা বললেও কেউ শুনতে পায় না। পাবে কেমন করে? বায়ু তো নেই। শব্দ কোন মাধ্যম ছাড়া অগ্রসর হতে পারে না কিনা! মহাকাশচারীরা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করেছিলেন বেতার ব্যবস্থার মাধ্যমে।

আজকের দিনে গবেষকরা মনে করছেন, চাঁদ কোনকালে পৃথিবীর অংশ ছিল না। চাঁদের অভ্যন্তরভাগও পৃথিবীর মত নয়। নিরেট পাথর দিয়ে গড়া। যে আগ্নেয়গিরিগুলো আছে, সেগুলো সবই মৃত। সূর্য থেকেই সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি। এক কথায় পৃথিবীর আত্মজ নয় সহোদর।

এবার মানুষ আরও যাবে। চন্দ্র পৃষ্ঠ থেকে বয়ে আনবে টাইটেনিয়াম প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর আকরিক। কলকারখানাও গড়তে পারে। বিজ্ঞানের কৃপায় মানুষের যাতওয়াতেরও সুবিধা হবে।

মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য

পৃথিবীর উপরিভাগে ঐ যে নীল নীল মহাকাশ—ওর প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালের। মানুষ যেদিনই ভাবনা চিন্তা শুরু করেছিল সেই দিনই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ওর দিকে। সেদিন নক্ষত্রগুলোর বিশালত্ব সম্বন্ধে তার কোন ধারণা ছিল না, ধারণা ছিল না মহাকাশের ব্যাপ্তি সম্বন্ধেও। ভাবতো পৃথিবীটাই সব কিছু। আর পৃথিবীর জন্যই নীল আকাশ, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, ইত্যাদি সব কিছু। তাই বিশ্ব বলতে তাঁরা পৃথিবীকেই বোঝাতেন। মহাবিশ্বের দরবারে পৃথিবীটা নিতান্তই যে নগন্য, মহাসাগরের বুকে ক্ষুদ্রাতিতম ক্ষুদ্র আণুবিক্ষনিক জীবাণুর চেয়েও যে ক্ষুদ্র এমন ধারণা একেবারে হালফিল আমলের। পৃথিবী একটি সৌরজগতের

বাসিন্দা। এমন কোটি কোটি সূর্য ও সৌরজগত নিয়ে একটি নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সি। কয়েকশ গ্যালাক্সি মিলে গ্যালাক্সিগুচ্ছ বা ক্লাস্টার, এমনই শত শত ক্লাস্টার নিয়ে সুপার ক্লাস্টার—বৃহত্তম জগৎ বা বিশ্ব। তেমনই শত শত এমনকি সহস্র সহস্র সুপার ক্লাস্টার মিলে অকল্পনীয় মহাবিশ্ব।

মহাবিশ্বের ধারণা আজকের—বিংশ শতাব্দীর। তবে আগেকার জ্যোতির্বিদদের ধারণাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে নয়। তাঁরাও সেদিন বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনে যত্নবান হয়েছিলেন কিনা!

প্রথম কল্পনা ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের। খ্রীস্টপূর্ব প্রায় তিন হাজার বছর আগে তাঁরা কল্পনা করেছিলেন, পারস্য উপসাগরের কালো জলই সৃষ্টির উৎস। এর গহ্বর থেকে প্রথমে উঠে এসেছে পৃথিবী, তারপর পৃথিবীকে বেষ্টন করার জন্য "খুবুর" নামে সামুদ্রিক স্রোত। সবশেষে অগণিত নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ। সেখানকার দেবতা সূর্য এবং সূর্যদেবতাই ইচ্ছানুযায়ী নক্ষত্রদের ঘোরাচ্ছেন আকাশ পথে।

মিশরীয়রা মনে করতেন, ঘন তমসাবৃত "নু" নামে আদিম মহাসমুদ্র থেকে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। বাইবেলে উল্লেখ আছে, ঈশ্বরের আদেশে আদিম মহাসমুদ্রের মাঝখান থেকে উঠে এসেছে নীল আকাশটা এবং ওর বাসিন্দা সূর্য, চন্দ্র ও তারা।

বেদে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে যে কল্পনা, তা বেশ উচ্চ স্তরের। বলা হয়েছে আদিতে কোথাও কোন কিছু ছিল না। তারপর স্রষ্টার নির্দেশে আদিম মহা-অন্ধকার এবং মহাশূন্যতার মাঝখানে একদিন নিহিত হয় সৃষ্টির বীজ। কোথায় এবং কেমন করে যে নিহিত হয়েছিল, তা কেউ জানে না। এমনকি দেবতারাও নন। কেন না, দেবতাদেরও আবির্ভাব সৃষ্টির পরে।

বেদে গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা আদিম জলরাশির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আদিতে তা-ও ছিল নিরাকার। তখন আকাশ ছিল না, আলো ছিল না, বায়ু ছিল না, জন্ম-মৃত্যু কিছুই ছিল না। শুধু অন্ধকার কালো জলে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল।

যাই হোকনা কেন, আজকের দিনে বিজ্ঞানের অনেক-অনেক উন্নতি হয়েছে। বিজ্ঞানের কৃপায় বহু অজানাকে জানা গেছে, বহু প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনও হয়েছে। তবু বলতে হয় বিশ্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানটা প্রাথমিক স্তরের।

এ বিষয়ে মানুষের প্রচেষ্টার অবশ্য অন্ত নেই। সহস্র সহস্র বিজ্ঞানী আজ মাথা ঘামাচ্ছেন এ বিষয়ে! বহু হাতিয়ারও তাঁদের হাতে এসেছে। সবচেয়ে বড় হাতিয়ার মহাকাশের নেপথ্য বিকিরণ। একদিন দূরাগত নক্ষত্র বা নক্ষত্রমণ্ডলীর আলোই ছিল তাদের কাছে সব। মহাকাশযানের ও রকেট ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মহাকাশে ধরতে সমর্থ হয়েছেন অতি দূরবর্তী গ্যালাক্সী সমূহ থেকে আগত এক্স রশ্মি, গামা রশ্মি এবং অণু তরঙ্গদের। সেগুলোকে

বিশ্লেষণ করার ফলে বিশ্বসৃষ্টি রহস্যের কুয়াশাটা ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে উঠেছে !

বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে কালে কালে বহু তথ্যের আমদানি হলেও প্রকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্বটি প্রদান করেছেন জর্জ গ্যামো, উইৎসেকার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। তত্ত্বটির নাম বিগ ব্যাং থিওরি বা মহাবিস্ফোরণবাদ। এই মতবাদটিকে বর্তমানে সবাই মেনে নিয়েছেন। এবং যাচাই করতে গিয়ে ভাল ফলই পাওয়া গেছে।

জন্ম হলে মৃত্যু যেমন অবসম্ভাবী পরিণতি, তেমনি সৃষ্টির মধ্যেও রয়েছে ধ্বংসের বীজ। অর্থাৎ মহাবিশ্বেরও সৃষ্টি-ধ্বংস আছে, তথা জন্ম মৃত্যু। জন্ম মৃত্যুর অধীন কিনা! অতএব মহাকাশে অবস্থানকারী কোটি কোটি নক্ষত্রজগৎ ধ্বংস হয়ে যায় এবং নতুন করে সৃষ্টি হয় পুনরায়। উপাদান মহাকাশেই থেকে যায়। কিন্তু একেবারে আদিতে যখন চারদিক ছিল মহাশূন্য, বস্তুকণা-গ্যাসকণা কোন কিছু ছিল না তখন বিশ্ব সৃষ্টির উপাদান এসেছিল কোথা থেকে ?

বিজ্ঞানীদের ধারণা, আদিম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এত বড় ছিল না। হিন্দু পুরাণে বলা হয়েছে, আদিতে বিশ্বটা ছিল প্রজাপতি ব্রহ্মার অণ্ড সদৃশ। তাই ব্রহ্মাণ্ড নাম। প্রসারিত হতে হতে আজকের এই অকল্পনীয় বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। সে প্রসারণ এখনও অব্যাহত আছে।

বিজ্ঞানীদের আরও বিশ্বাস, আদিম নিরাকার বিশ্বে যে কোন কিছুই ছিল না এমন নয়। অর্থাৎ মহাশূন্য বলতে যা বোঝায় তা নয়। অতি বিরলভাবে অবস্থান করছিল এক ধরণের আদিম কণিকা। আর ব্রহ্মাণ্ডটার ব্যাপ্তিও নেহাৎ কম ছিল না, যদিও আজকের তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ ছিল।

আদিম কণিকাগুলো প্রকৃতপক্ষে কী যে ছিল, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একমত নন। তবে কোন না কোন সময়ে আভ্যন্তরীন কণিকাগুলোর মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। কয়েক আলোকবর্ষ ব্যাপী ব্যাপ্তির মধ্যে অস্থিরতা যে কোন কারণে আসতে পারে এবং এই অস্থিরতার দরুণ আদিম কণিকাগুলো এক বিশাল আয়তনের মধ্যে জড় হওয়ার সুযোগ পায়। পরে এটি আবর্তন করতে শুরু করলে সেগুলো জমাট বাঁধতে শুরু করে এবং প্রকাশ পায় আকর্ষণ বল। পরে আবর্তন বল প্রবল থেকে প্রবলতর হলে ব্রহ্মাণ্ডের বিশেষ এক জায়গায় জমাট বাঁধা পিণ্ডের আকারে অবস্থান করে। এক সময় তার ঘনত্ব দাঁড়ায় জলের ১০ গুণের মত। এবং সেই পিণ্ডটি যে অংশে সীমাবদ্ধ ছিল তার ব্যাস ছিল কম করে ৩০ কোটি মাইলের মত।

আবর্তন করতে করতে আরও সে নিবিড় ঘনত্বের দিকে এগিয়ে যায় এবং তাপমাত্রাও বেড়ে উঠে অকল্পনীয়ভাবে। পরিশেষে তাপ ও ঘনত্ব এতখানি বেড়ে ওঠে যে, তাতে পিণ্ডটা নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। ঘটেছিল প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ। সেই বিস্ফোরণের ফলে মূল পিণ্ডটি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে অজস্র

খণ্ডে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল মহাকাশের চতুর্দিকে। সেই বিস্ফোরণ থেকেই ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হতে শুরু করেছে। বিজ্ঞানীদের মতে সেই প্রসারণ অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে না। প্রসারণের নির্দিষ্ট একটা সীমা থাকা সম্ভব। সেই সীমায় এসে পড়লে পুনরায় শুরু করে সংকুচিত হতে। সংকোচনের ফলে ধ্বংস হয়ে যায় বিশ্বের প্রতিটি বাসিন্দা। তারপর সেই সঙ্কোচনও একদিন শেষ সীমায় পেঁছায়। বস্তু কণাগুলো একজায়গায় জড় হয়। আবার সেই জমাট বাঁধা পিণ্ড, আবার বিস্ফোরণ, আবার নতুন করে সৃষ্টি।

আদিম সেই বিস্ফোরণের কথায় ফিরে আসা যাক। প্রথম যখন বিস্ফোরণ ঘটেছিল তখন সেই আদিম কণিকা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এবং তাদের কিছু কিছু বিপরীত কণা। পরে সেই কণাগুলো থেকেই উৎপন্ন হয়েছিল বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুরা। যেহেতু বিশ্বের প্রসারণ অব্যাহত ছিল, তাই ওরা অতি বিরলভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল মহাকাশের সর্বত্র। পরে সেগুলো ঘণীভূত হয়েছে, জমাট বেঁধেছে এক একটা পিণ্ডের আকারে, বিস্ফোরণ ঘটেছে তাদের মধ্যেও। তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছে মহাকাশের সহস্র সহস্র কোটি নক্ষত্র জগৎ বা গ্যালাক্সী।

নক্ষত্রের জন্ম ও মৃত্যু

ঘন মেঘের আড়ালে নক্ষত্ররা যে কেমন করে জন্মলাভ করে, তা বিজ্ঞানীরা যন্ত্রের সাহায্য নিয়েও প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি। তবে মাঝেমাঝে একসঙ্গে অনেকগুলো নক্ষত্রকে দপদপ করে জ্বলে উঠতে দেখেছেন। তেমনই প্রত্যক্ষ করেছেন নক্ষত্রকে লাল হয়ে উঠতে এবং নিভে যেতেও। শুধু আজকের দিনে নয়, এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন প্রাচীন জ্যোতির্বিদরাও। চৌন দশের পুঁথিপত্রগুলিতে এমন ঘটনার উল্লেখও আছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতা থেকে মনে করা হয়, এক কালে কেবল একটি মাত্র নক্ষত্রের জন্ম হয় না। অনেকগুলো নক্ষত্র একই সঙ্গে জন্ম গ্রহণ করে, যেন আকাশে নক্ষত্রের বর্ষণ ঘটে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, আগে নক্ষত্রের বর্ষণ প্রচুর পরিমাণে হতো। বর্তমানে বহুলাংশে কমে গেছে। কালেভদ্রে দেখা যায় এবং সংখ্যায়ও কম। তবে প্রতিবছর বেশ দু-চারটে নক্ষত্রকে নিভে যেতে

দেখেছেন তাঁরা।

নক্ষত্ররা তাদের উপাদান লাভ করেছে আদিতে বিস্ফোরণের ফলে যে ঘন মেঘের টুকরোগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল—তাদেরই কাছ থেকে। বিশ্ব প্রসারিত হতে শুরু করলে মেঘে অবস্থিত গ্যাসীয় কণাগুলো বিরলভাবে ছড়িয়ে পড়ে মহাকাশের সর্বত্র। সেই বিরল পদার্থগুলো কালক্রমে ঘনীভূত হয়েই সৃষ্টি করেছে এক একটা নক্ষত্র-জগৎকে।

বিজ্ঞানীদের মতে একক নক্ষত্রের জন্ম সম্ভব নয় এই কারণে যে, একক নক্ষত্রের ভরের সমান বিরল গ্যাসকণা মহাকাশের যে বিশাল পরিসরের মধ্যে অবস্থান করে—সেগুলো একত্রিত ও ঘনীভুত হতে পারে না। ঘনীভূত হতে শুরু করলে সেই সময় যে ক্ষীণ আকর্ষণ বল প্রকাশ পায় তাকে অক্লেশে হাইড্রোজেন প্রভৃতির পরমাণুরা উপেক্ষা করে দূর মহাকাশে পালিয়ে যেতে পারে। পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না তখনই—যখন কোটি কোটি আলোক-বর্ষ ব্যাপি বিশাল আয়তনের মধ্যে অবস্থানকারী গ্যাসীয় কণাগুলোর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় প্রস্থান বেগ যার যত বেশী হোক না কেন তাদের ছুটে পালিয়ে যাওয়ার উপায় থাকে না। এত বিশাল আয়তন যে, ছুটে পালাবেই বা কোথায়? কিংবা কত দূরেই বা যাবে? কোটি কোটি আলোকবর্ষ অতিক্রম করে যাওয়া তো সহজ কথা নয়।

হ্যাঁ, মহাকাশের ব্যাপ্তি অকল্পনীয় বৈকি! কয়েক কোটি আলোকবর্ষ ব্যাসের এক বর্তুলকে যদি কল্পনা করা যায়, তাহলে যত বিরলভাবে হোক না কেন গ্যাসকণা ও ধূলিকণার পরিমাণ নগন্য হবে না এবং এর অভ্যন্তরের কোথাও না কোথাও চঞ্চলতা কিংবা ঘূর্ণি সৃষ্টি হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। আর চঞ্চলতা সৃষ্টি হলেই গ্যাসকণা ও ধূলিকণা প্রভৃতি আবর্তন করতে শুরু করে। অপরদিকে আবর্তন শুরু হওয়া মাত্রই বিরল কণাগুলো নিক্ষিপ্ত হয় কেন্দ্রের দিকে।

ঘূর্ণী সৃষ্টি হলে সে ঘূর্ণী সহজে বিলীন হয়ে যেতে পারে না। এলাকাটা সুবিশাল। আর ঐ কারণেই ঘূর্ণীর বেগ মন্দীভূত না হয়ে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বেগ যত বৃদ্ধি পায় ততই অধিক গ্যাসকণা ঘণীভূত হয়। ঘণীভূত হলেই তার মধ্যে প্রকাশ পায় আকর্ষণ বল।

ঘূর্ণির সৃষ্টি, অল্পে অল্পে ঘনীভূত হওয়া, পরিশেষে আকর্ষণবল লাভ এই করতে করতেই সহস্র সহস্র বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু আকর্ষণবল লাভ করলেই ঘনীভবনের মাত্রা চরম হয়ে ওঠে। একদিকে যেমন অতি দূর থেকে বস্তুকণাগুলোকে শোষণ করতে শুরু করে, অপরদিকে বেড়ে ওঠে তার আবর্তন বেগ। ঘনত্ব ও তাপমাত্রা দুইই বাড়তে শুরু করে। স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে বস্তুকণাগুলো।

অবশ্য তাপমাত্রা বেড়ে ওঠার ফলে স্তূপটির আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। এক্ষেত্রে সে সুযোগও আসে না। প্রাথমিক অবস্থায় উৎপন্ন কিছু কিছু তাপ

পাতলা গ্যাসীয় স্তর ভেদ করে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে বলে সংকোচনের মাত্রা ঠিকমত বজায় থাকে। পরের দিকে সংকোচনের মাত্রা আরও প্রবল হয় তখন হাইড্রোজেন পরমাণুগুলোর অস্থিরতা বেড়ে যায়। সংঘর্ষ ঘটে গ্যাসীয় স্তূপে অবস্থানকারী ধূলিকণার সঙ্গে। গঠিত হয় হাইড্রোজেন অণু। তখনই তাপমাত্রার হ্রাস পায়। স্তূপটির সংকোচনের ক্ষেত্রে বাধা দূর হয়। পরিশেষে ঘনত্বটা যখন ভয়ানকভাবে বেড়ে ওঠে তখন তাপমাত্রা বাড়তে থাকলেও সে তাপমাত্রা সংকোচনকে বাধা দিতে পারে না। ঘনত্ব ও তাপমাত্রা দুইই প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। অবশেষে ঘনত্বটা এত প্রবল হয় যে মাত্র এক ঘন সেণ্টি-মিটার জায়গায় অবস্হানকারী বস্তুসমূহের ভর দাঁড়ায় কয়েক কোটি টনের মত। অপরদিকে তাপমাত্রা এত বৃদ্ধি পায় যে, ধূলিকণাগুলোও গ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

এমন ভয়ংকর ঘনত্বে এবং তাপমাত্রায় স্তূপটি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। এক সময় ঘটে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। সেই বিস্ফোরণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে স্তূপটি। বিভক্ত হয় সহস্র সহস্র খন্ডে। ছিটকেও পড়ে দূর দূরান্তরে। সেই খণ্ডগুলো আর পূর্বের মত ঘনীভূত হয়ে জন্ম দেয় এক একটি নক্ষত্রের। যেহেতু পূর্বের মত এগুলো এত বিশাল নয়, তাই বিস্ফোরণ আর ঘটে না। প্রচণ্ড তাপমাত্রায় সেগুলো দপ দপ করে জ্বলে ওঠে।

মহাকাশের অমিত তেজসম্পন্ন ঐ নক্ষত্ররাও অমর নয়। বিচ্ছিন্ন স্তূপ-গুলোর আকার সবার সমান নয় বলে, যারা যেমন যেমন স্তূপ লাভ করে তারা তেমন তেমন আকার লাভ করে। তাই কেউ ছোট, কেউ মাঝারি কেউবা বড় সড়। আমাদের সূর্য একটা মাঝারি ধরণের নক্ষত্র। এর থেকে শত, এমনকি সহস্র গুণে বড় নক্ষত্রও এক একটা গ্যালাক্সীতে থাকে। বড় নক্ষত্রদের বলা হয় মহাদানব বা সুপার জায়েণ্ট। ওদের প্রত্যেকেরই তেজের ভাণ্ডার জন্ম সময়ে প্রাপ্ত হাইড্রোজেন। জন্ম মুহূর্তে লাভ করা হাইড্রোজেন ছাড়াও আকর্ষণ বল প্রয়োগ করে পাশাপাশি বহুদূর থেকে হাইড্রোজেনকে শোষণ করে নিয়ে নিজ কলেবরখানাকে স্ফীত করে ফেলে।

হাইড্রোজেন ভাণ্ডারকে সবাই একই হারে খরচ করে না। অর্থাৎ নক্ষত্র-দের মধ্যেও কেউ মিতব্যয়ী কেউবা অমিতব্যয়ী। ছোট ও মাঝারি নক্ষত্ররাই সাধরণতঃ মিতব্যয়ী হয়ে থাকে। হাইড্রোজেনকে খরচ করে ধীরে সুস্হে। তাই তাদের পরমায়ু বেশী—সহস্র কোটি বছর।

কিন্তু বড়রা। ধনী এবং অভিজাত। আপন আভিজাত্যকে জাহির করতে, পাশাপাশি নক্ষত্রদের উপর টেক্কা দিতে, প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি টন হাইড্রোজেনকে খরচ করে বিশ্বমাঝে নিজের অস্তিত্বকে জাহির করে। কিন্তু হায়! তারা জানে না, সীমাহীন বিশ্বে তাদের তেজ সূর্যের কাছে খদ্যোতের মত। সহস্র সহস্র কোটি নক্ষত্রদের মধ্যে কে কার খবর নেয়। ফল হয় এই—

অসার দম্ভ প্রকাশ করতে গিয়ে মাত্র কোটি খানেক বছরেই মৃত্যুকে বরণ করে। অধিক সম্পদের অধিকারীদের চিরন্তন পরিণামের মত অথবা বলদর্পী ও অহঙ্কারীর সাজার মত ওরাও সাজা পায় মৃত্যুকে বরণ করে।

নক্ষত্রদের মৃত্যু বড় ভয়ঙ্কর। বিশেষ করে ঐ সব মহাদানব নক্ষত্রদের। হাইড্রোজেন ভান্ডার নিঃশেষের দিকে এগিয়ে গেলেই আয়তন ক্রমান্বয়ে বাড়তে শুরু করে। তখনই নামে জরা। এক সময় হাইড্রোজেনটা যখন প্রায় নিঃশেষের দিকে এগিয়ে যায় তখন তার বর্ণ হয়ে ওঠে লাল। এই অবস্থায় তার আয়তন বেড়ে ওঠে অথচ ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা দুই-ই কমে যায়। আয়তনে বিশাল এবং লাল রঙের এমন নক্ষত্রকে তাই বলা হয় লাল দানব বা রেড জায়েন্ট।

অতঃপর ওদের পৃষ্ঠে ধস নামতে শুরু করে। ধস নামার ফলে অভ্যন্তরভাগটা উন্মোচিত হয়ে পড়ে। তখন পুনরায় উজ্জ্বল দেখায়। এই অবস্থা নক্ষত্রের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার দ্বিতীয় ধাপ। আর অনুরূপ অবস্থাকে বলে নবতারা বা নোভা।

সব তারা অবশ্য নবতারায় পরিণত হয় না। অনেকের ক্ষেত্রে বিশেষ করে মহাদানব নক্ষত্রদের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন ফুরিয়ে গেলে প্রচণ্ড রকমের বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের ফলে বিরাট বিরাট বস্তুপিণ্ড ছিটকে বেরিয়ে যায়। তাদের কোন কোন টুকরার আয়তন এক একটা পৃথিবীর মতও হতে পারে।

বিস্ফোরণ যত ভয়ঙ্কর হোক না কেন, শেষ অবধি একটা বড় বস্তুপিণ্ড থেকে যায়। এই অবস্থায় সে তেজও বিকিরণ করতে থাকে। কিন্তু হাইড্রোজেনের অভাব হেতু নানা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে শেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। প্রথমে বর্ণ হয় নীল ও পরে সাদা। আকারে ছোট এবং সাদা রঙের বলে ওর নাম সাদা বামন বা হোয়াইট ডোয়ার্ফ। এর পরে নিভে যায় চিরতরে।

নবতারা—অতি নবতারা

নক্ষত্রের মৃত্যুর কথা প্রসঙ্গে নব তারার উল্লেখ করা হয়েছে। নব তারা। নামটি ভারি সুন্দর, কিন্তু কোন নতুন তারা নয়। আবার অতি নব তারা

বলতে হাল আমলের সৃষ্ট কোন তারাও নয়। ইংরেজীতে নবতারাকে নোভা এবং অতিনবতারাকে সুপার নোভা বলে।

বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, সূর্যের মত মাঝারি বা তার চেয়েও ছোট তারা নবতারায় পরিণত হয় না। বড় বড় নক্ষত্র তথা অমিতব্যয়ী সুপার জায়েণ্টরা যেন পূর্বের আভিজাত্যকে বজায় রাখতে তথা ঔজ্জ্বল্যকে ঠিক রাখতে কেন্দ্রের দিকে ধস নামাতে শুরু করে। এমন অবস্থায় আয়তনে সঙ্কুচিত হয় এবং আকর্ষণ বল প্রবল হয়ে ওঠে। কেন্দ্র অনাবৃত হওয়ায় ও ঔজ্জ্বল্য বেড়ে ওঠে অনেক গুণে। যেন অকস্মাৎ আকাশে এক নতুন উজ্জ্বল তারার আবির্ভাব ঘটে।

আরও আরও যারা বড় তারা, অর্থাৎ সুপার-সুপার জায়েণ্ট যারা, তাদের জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে পূর্বের ঠাট বজায় রাখতে এক অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করে। মনুষ্য চরিত্রের মত নতিস্বীকার করতে চায় না, তথা ম্লান হয়ে নক্ষত্রদের সামনে কালযাপন করতে চায় না যেন। ক্রুদ্ধ আক্রোশে যেন ফেটে পড়ে। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় শরীর। অর্থাৎ বিস্ফোরণ ঘটে। অবশিষ্ট যে বৃহৎ পিণ্ডটি থেকে যায় তার ঘনত্ব আগের মত থাকলে কী হবে আকর্ষণ বেগ ভয়ানকভাবে বেড়ে ওঠে। এই অবস্থায় তার দেহ থেকে বিকীর্ণ হয় ভয়ঙ্কর রঞ্জন রশ্মি। তাকে তখন আরও আরও উজ্বল দেখায়। নিভে যাওয়ার আগে প্রদীপ শিখার মত শেষ বারের মত বিতরণ করে যায় আরও উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি। এমন অবস্থাকে বলা হয় সুপার নোভা।

এমন বিস্ফোরণ কিন্তু সচরাচর হয় না। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, কালেভদ্রে এমন ঘটনা ঘটে অতি বৃহৎ এক একটি নক্ষত্রের বেলায়। যখন তারাটি অতি নোভায় পরিণত হয় তখন হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং লক্ষ লক্ষ গুণে শক্তি বিকিরণ করে। উজ্জ্বলতা স্থায়ী হয় কয়েকদিন থেকে কয়েক মাস। তারপর আর দেখা যায় না।

খালি চোখেই সেই ঔজ্জ্বল্য ধরা পড়ে এবং আকাশ পর্যবেক্ষনকারীরা দৈবাৎ দেখতে পান। তবে তার জন্য হয়ত সময় লাগে কয়েক বছর থেকে কয়েক শ বছর। অতি প্রাচীন কালেও আকাশ পর্যবেক্ষকরা লক্ষ্য করেছিলেন এমন তারাকে। হঠাৎ আবির্ভূত হতো বলে সেকালে সুপার নোভা সম্বন্ধে নানা সংস্কারের প্রচলন হয়েছিল। অতি নব তারার প্রকাশ ঘটলে যাঁরা পণ্ডিত তাঁরাও মনে করতেন পৃথিবীতে হয় কোন দুর্যোগ আসবে, নয়ত, কোন মহাযুদ্ধের জন্ম হবে।

ভগবান বুদ্ধের জন্মের কয়েক দিন আগে হিমালয়ের দু-একজন ঋষি নাকি আকাশে দেখেছিলেন এমনই এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে। যীশু খৃষ্টের জন্মের সময়ে ন্যাজারেথের আকাশেও দেখা গিয়েছিল একটি উজ্জ্বল তারাকে। সেটি তিন মাসের মত আকাশে ছিল।

পণ্ডিতদের প্রদেয় তত্ব থেকে আরও জানা যায়, শার্লমেনের রাজত্বের সময়,

সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের সময়, মহারানী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বের সময়, আকবরের গুজরাট বিজয়ের বছর এবং আকবরের মৃত্যুর বছর আকাশে অত্যুজ্জ্বল এক একটি তারার হঠাৎ আবির্ভাব হয়েছিল এবং মাত্র কয়েক দিন স্থায়ী হয়েছিল।

বলাবাহুল্য, এ তারাগুলোর সবগুলিই ছিল সুপার নোভা। সেকালে ওদের মনে করা হতো আকাশের আগন্তুক। হয় কোন সু-সংবাদ নয়ত কোন দুঃসংবাদ বহন করে আনে। প্রকৃত তথ্য সেকালে আবিষ্কৃত হয়নি।

প্রাচীন পণ্ডিদের বর্ণনানুযায়ী সেগুলোর সবাই যে সুপার নোভা ছিল তার একটি প্রমাণ আজকের দিনের জোতির্বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। চীনা পণ্ডিতদের কথা অনুযায়ী ১০৫৪ সালে হঠাৎ একটি তারা আকাশে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল। সেটি আকাশে স্থায়ী হয়েছিল একবছর কাল। তাঁদের দেওয়া তথ্যকে অনুসরণ করে পাওয়া গেছে নক্ষত্রটির অবশেষ এবং সেটি অবস্থান করছে কর্কট নীহারিকায়।

তবে জানা গেছে, অতি নোভার পরিবর্তন পর্যায়েও তারাটি পরোপুরিভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে না। প্রায় হাজার বছর ধরে চলে তার শক্তিশালী বিকিরণ। সে বিকিরণ এক্স রশ্মির ও বেতার রশ্মির। ওর শক্তি অনেক সময় জীবন্ত এক নক্ষত্রপৃষ্ঠ থেকে আগত শক্তি অপেক্ষাও তীব্র। বর্তমানে অনেক অতি নোভার সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। তবে তাঁদের মতে অতি নোভা সম্বন্ধে সমূহ তথ্য এখনও লাভ করা যায়নি। এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। তাই অতি নোভা সম্বন্ধে গবেষণা এখনও অব্যাহত আছে।

পালসার নিউট্রন নক্ষত্র

পালসার মহাকাশের এক আশ্চর্য ধরণের জ্যোতিষ্ক। বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কল্যাণেই উক্ত জ্যোতিষ্কটির সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এটি অতি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা।

কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বেতার দূরবীক্ষণের মাধ্যমে মহাকাশ থেকে আগত বেতার সংকেতগুলোকে বিশ্লেষণ করতেন। প্রায় এক বছর কাল তাঁরা এক অতি বিচিত্র ধরণের সংকেত লাভ করে আসছিলেন তাতে

প্রথমে তাঁদের মনে হয়েছিল, এই বেতার সংকেত মহাকাশের কোন জ্যোতিষ্কের নাও হতে পারে। হয়ত তাঁদের কিছু কিছু ত্রুটির ফলে নতুবা কাছাকাছি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি থেকে অতি অল্পসময়ের জন্য এমন অদ্ভুত এক সংকেত ভেসে আসে। মহাকাশের কোন জ্যোতিষ্ক থেকে এলে এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে হারিয়ে যাবে কেন ?

বেশ কিছুকাল কেটে গেল। কিন্তু বারে বারে ঐ সংকেত লাভ করতে থাকায় বিজ্ঞানীরা একটু খতিয়ে দেখতে শুরু করলেন এবং ত্রুটিগুলো সম্বন্ধে আরও সতর্ক হলেন। কিন্তু না, সেই একই ধরণের সংকেত পুনরায় লাভ করলেন। এবার রীতিমত চিন্তিত হলেন তাঁরা। শেষে সিদ্ধান্তে এলেন, এ সংকেত তাঁদের অসাবধানতার জন্য নয়। বা মহাকাশের কোন সুদূরতম জ্যোতিষ্কেরও নয়। এর উৎস কাছাকাছি কোন জ্যোতিষ্কের।

সেদিন তাঁদের আর একটা কথাও মনে এসেছিল। এমন অদ্ভুত বেতার সংকেত কোন জ্যোতিষ্কের পৃষ্ঠদেশ থেকে স্বতঃ উৎসারিত হতে পারে না। মানুষ অথবা মানুষের চেয়েও কোন উন্নত জীব ঝলকে ঝলকে এই ধরণের বেতার সংকেত প্রেরণ করছে অচেনা কোন গ্রহ থেকে।

ব্যস! জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক এই ধারণাকে নিয়ে চারদিকে শুরু হয়ে গেল হৈ চৈ। নানা পত্র পত্র পত্রিকায় নানা ধরণের মন গড়া প্রবন্ধ ছাপা হলো, কল্পবিজ্ঞানের কাহিনীকাররা আপন কল্পনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়ে লিখলেন হরেক রকমের গল্প, আর বিজ্ঞানীরা অচেনা গ্রহটিকে সনাক্ত করতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ভাবখানা এই, কে আগে গ্রহটি আবিষ্কার করতে পারেন এবং সেখানকার উন্নত জীবের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। ফ্লাইং সংসারের কল্পনা সেই থেকেই।

না, সে আশা পূর্ণ হলোনা। পরন্তু গবেষকদের গবেষণা তাঁদের নিরাশ করলো। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুলার্ড মানমন্দির থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যান্টনি হিউইশ এবং তাঁর সহকর্মীরা ১৯৬৮ সালে ঘোষণা করলেন, এই বেতার সংকেত ছুটে আসছে আমাদের সৌরজগতের বাহির থেকে। ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন,এই সংকেত পৃথিবীপৃষ্ঠে ছুটে আসছে পর্যায়ক্রমে। পর্যায়কাল মাত্র ¼ সেকেণ্ড থেকে ১ সেকেণ্ড অবধি। অর্থাৎ বেতার সংকেত অবিচ্ছিন্ন ও অবিরামভাবে আসছে না। এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে ছুটে আসছে ঝলকে ঝলকে, তারপর বন্ধ। তারপর আবার আসছে এবং আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যতক্ষণ ধরা পড়ে, ঠিক ততক্ষণই যেন বন্ধ থাকে।

বিজ্ঞানীরা এবার এই আশ্চর্য জ্যোতিষ্কের নামকরণও করলেন। নাম রাখলেন পালসেটিং রেডিও সোরসেস বা সংক্ষেপে পালসার।

পালসার আবিস্কারের মূলে জনৈকা ছাত্রীর কৃতিত্ব বড় কম নয়। তখন সদ্য কোয়াসার নামক জ্যোতিষ্কটি আবিষ্কৃত হয়েছে। মহাকাশে নতুন

নতুন কোয়াসার আবিষ্কারের জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন অনেকে। কাজটা যাতে সহজ হয় তার জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদরা দূরাগত নক্ষত্র জগৎ থেকে এবং কোয়াসারগুলো থেকে ভেসে আসা বেতার তরঙ্গদের বিশ্লেষণ করার জন্য একটি লেখচিত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন। গ্রহণ করা লেখচিত্রগুলোকে পরীক্ষার জন্য তাঁরা জোসিলিনের উপর ভার দিয়েছিলেন। লেখচিত্রগুলো বিশ্লেষণ করতে গিয়েই জোসিলিন আবিষ্কার করেছিলেন এই অদ্ভুত ধরণের বেতার সংকেতকে।

পালসার সম্বন্ধে গবেষণার এখনও শেষ হয়নি। এখনও উদ্ঘাটিত হয়নি ওর বহু রহস্য। তবে বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, এই ধরণের জ্যোতিষ্কের ব্যাস কয়েক হাজার কিলোমিটারের বেশী নয়। আজ পর্যন্ত প্রায় ৩০০টির মত পালসার আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রধান প্রধান আবিষ্কারক এবং তাঁদের আবিষ্কৃত পালসারের সংখ্যা নিচে প্রদান করা গেল।

১। ইংলণ্ডের ডেভিস এবং তাঁর সহকর্মীরা মোট ৯টি

২। আমেরিকার বাইফেনস্টোন, হিউগোনিস এবং তাঁদের সহকর্মীরা ৪টি

৩। লাভলস এবং তাঁর সহকর্মীরা ৪টি

৪। সোভিয়েত রাশিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ৮টি

৫। ভারতের গোবিন্দস্বরূপ এবং তাঁর সহকর্মীরা ৩টি।

পালসার সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বলছেন, এরা কোয়াসারদের মত অদ্ভুত কোন জ্যোতিষ্ক নয়। নক্ষত্রের শেষ পরিণতি এই পালসার। কিছুকাল আগে কেউ মনে করেছিলেন, নক্ষত্র সাদা বামনের পর্যায়ে গেলেই অনুরূপ বেতার সংকেতের উদ্ভব হয়। পরে কর্কট নীহারিকাস্থিত পালসারটি আবিষ্কৃত হওয়ায় সে ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। মনে করা হচ্ছে, পালসাররা সম্ভবতঃ এক একটি নিউট্রন নক্ষত্র।

নিউট্রন নক্ষত্ররা আবার কারা?

নিউট্রন নক্ষত্রদের সম্বন্ধে প্রথমে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করেছিলেন লান্ডাউ, ফ্রিৎজজীকি প্রভৃতি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ১৯৩০ সালে। তাঁদের মতে সূর্য থেকে বড় যে সব নক্ষত্র তারাই শেষ পর্যন্ত নিউট্রন তারায় পরিণত হয়। কম করে ১·৫ সৌরভরের নক্ষত্রদের জ্বালানী হাইড্রোজেন ফুরিয়ে গেলে সৌর তেজের চাপ কমে যায় এবং মহাকর্ষের দরুন তাদের দেহে সঙ্কোচনের সূচনা হয়। জ্বালানীর অভাবে ভেতরটা ঠান্ডা হয়ে গেলেও বাহিরে ইলেকট্রনদের চাপ থেকে যায়। মাঝারি কিংবা ছোট ছোট নক্ষত্রদের বেলায় ইলেকট্রনদের চাপ অবশ্য থাকে কিন্তু মহাকর্ষের চাপে একেবারে ভেঙ্গে পড়তে পারেনা। পরিণত হয় সাদাবামনে। তখন ওর ঘনত্ব দাঁড়ায় $১০^{৪}$ থেকে $১০^{৮}$ গ্রাম এবং ব্যাসার্ধ হয় প্রায় ৬০০০ মাইল।

কিন্তু বড় বড় নক্ষত্রদের বেলায় মহাকর্ষজনিত চাপ এত প্রবল হয় যে,

বহিঃস্থিত ইলেকট্রন সে চাপকে প্রতিহত করতে পারেনা। সেইচাপে ইলেকট্রন-রা সরাসরি বস্তুপিণ্ডটার ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং প্রোটনদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিউট্রন তারায় পরিণত হয়। এই অবস্থায় ইলেকট্রনের চাপের বাধা অপসারিত হওয়ায় আয়তনে ছোট হয়ে যায় এবং একটা সাম্যাবস্থায় আসে। এক্ষেত্রে প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারের ঘনত্ব দাঁড়ায় ১০১১ গ্রাম থেকে ১০১৫ গ্রাম এবং ব্যাসার্ধ হয় মাত্র ১০ কিলোমিটারের মত। এমন ঘনত্ব অবশ্য কোন পার্থিব বস্তুর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

নিউট্রন তারাদের নিরেট এক বস্তুপিণ্ড বলে মনে করছেন না বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে এরা এক একটা শক্তিশালী দুই মেরু বিশিষ্ট চুম্বক। প্রচণ্ড গতিতে নিজ মেরু অবলম্বনে পাক খাচ্ছে। কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে রয়েছে ঠিক শনিগ্রহের বলয়ের মত বলয়। এবং এদের দুটি মেরুতে দুটি প্রচণ্ড উষ্ণ অঞ্চল বিদ্যমান। সেই উষ্ণ অঞ্চলগুলো থেকে অবিরাম নির্গত হচ্ছে এক্স রশ্মি।

কোয়াসার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজ্ঞানের সব কটি শাখায় অভাবনীয় ভাবে উন্নতি আসে। আবিষ্কৃত হয় বেতার তরঙ্গ উদ্ভাবনের কৌশল, মহাকাশ জয়ী রকেট ইত্যাদি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এবার আকাশ পর্যবেক্ষণের কাজে উপরোক্ত হাতিয়ারগুলোকে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন।

পূর্বে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের একমাত্র হাতিয়ার ছিল দূরবীন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উইলিয়ম হার্সেলের প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছিল অতি উন্নত মানের আলোক'দূরবীন। পরে অপরাপর অনেকের প্রচেষ্টায় দূরবীন আরও উন্নত হয় এবং বহু দূরে অবস্থিত গ্যালাক্সীসমূহের আলোকচিত্র গ্রহণে সমর্থ হয়।

১৯২৯ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী হাবল। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করলেন দূর নীহারিকার বর্ণালীতে লাল সরণ। তাতে ডপলার তত্ত্ব প্রয়োগ করে বোঝা গেল বিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ নক্ষত্র জগৎগুলো আমাদের কাছ থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে

দূরে সরে যাচ্ছে। এবং যতদূরের নক্ষত্রজগৎ—তত তার অপসরণ বেগ বেশী।

হাবলের আমল থেকে পরমাণু বিজ্ঞানেরও চরম উন্নতির যুগ শুরু হয়। অপরদিকে শুরু হয় বলবিদ্যা ও তাপীয় গতিবিদ্যাকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা তার ফলে আবিষ্কৃত হয় বহু নতুন নতুন তথ্য। সেই সব তথ্যকে অবলম্বন করে রবার্ট অ্যাটকিনসন এবং ফ্রিৎজ হুটের মানস সেই ১৯২৯ সালেই নক্ষত্রপৃষ্ঠে প্রচণ্ড তেজের উৎস রূপে পারমাণবিক বিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেন। যদিও তাঁরা এ বিষয়ে খুব বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি, তথাপি তাঁদের গবেষণা প্রভাবিত করেছিল অনেককে। যার ফলে ১৯৩৮ সালে হান্স বেটে এবং কার্ল ফন উইৎসেকার নক্ষত্রদেহের জ্বালানী হাইড্রোজেনের কথা উল্লেখ করেন। জ্বালানী নিঃশেষ হতে থাকলে যে ভাবে নক্ষত্রদেহে বিবর্তন সূচিত হয় সে সম্বন্ধেও সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই মহাকাশের অতি দূরবর্তী নক্ষত্র জগৎগুলোকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য মাউণ্ট পালোমারে একটি ২০০ ইঞ্চির দূরবীণ স্থাপন করা হয়েছিল। ঐ দূরবীনটি ভালভাবে চালু হওয়ার পর কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্র জগৎকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। তখনই তাদের লাল অপসরণ মাত্রা নির্ধারণ করে হাবলের সূত্রের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে বিশ্ব রহস্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা কিছুটা আন্দাজ করেছিলেন। তবে অচিরে অর্থাৎ ১৯৫৩ সালের দিকে বুঝতে পারলেন, আলোক দূরবীনের সাহায্যে মহাবিশ্বের অধিক দূরবর্তী গ্যালাক্সী সমূহের খবর সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভব নয়। শুধু তত্ত্বীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন মাত্র।

সেই সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। কার্ল ইয়ানস্কি নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী একরকম আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করলেন মহাকাশের স্বতন্ত্র বেতার উৎস। তিনি প্রথমটায় ওকে আমল না দিলেও পরের দিকে ওকে নিয়ে শুরু করেন গবেষণা।

প্রথম প্রথম বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন, বেতার উৎসগুলো সম্ভবতঃ আমাদের সৌরজগতের কোন না কোন স্থান থেকে উৎসারিত হচ্ছে। পরে বুঝতে পারলেন, এরা কাছাকাছি কোন গ্রহের তো নয়ই—এমনকি সূর্য অথবা সূর্যের প্রতিবেশী কোন নক্ষত্র থেকেও আসছে না। এদের উৎসস্থল ছায়াপথ বিশ্বের বাহিরে বহু দূরবর্তী কোন নক্ষত্রজগৎ।

এবার শুরু হয়ে গেল অতি দূরবর্তী গ্যালাক্সিসমূহকে নিয়ে গবেষণা। লাল অবসরণ মাত্রা নির্ধারণ করে দূরত্বও তাঁরা নির্ণয় করলেন। নানা জনে আবিষ্কার করলেন নানা তথ্য।

১৯৪৩ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন তড়িৎ নিরপেক্ষ হাইড্রোজেন পরমাণুর ২১ সেমি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেতার বিকিরণ। ১৯৫১

সালে হল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ওকে সনাক্ত করলেন।

এরপর চললো সনাক্ত করণের পালা। ১৯৫৩ সালে বাডে এবং মিনকাওস্কি সনাক্ত করলেন সায়াগনাম নক্ষত্র মণ্ডলীর বেতার উৎসকে, ১৯৫৯-৬০ সালে রুডলফ মিনকাওস্কি এমন এক বেতার নক্ষত্রজগৎকে সনাক্ত করলেন—যার লাল সরণের মাত্রা ৪৬ শতাংশ। দেখতে দেখতে বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের প্রারম্ভে প্রায় কয়েকশ স্বতন্ত্র বেতার উৎসের সন্ধান পাওয়া গেল। তবে ওদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কেউ করতে পারেননি। শুধু তাদের বেতার উৎসগুলোকে নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়েছিল এবং ঐ-বেতার উৎসগুলোকে বিশ্লেষণ করে তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছিল।

সে সময় দূরবর্তী নক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করার যেন একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। সেই হিড়িকের ভেতরেই টমাস ম্যাথিউস এবং অ্যালান স্যানডেজ দূরে —অতি দূরে দেখতে তারার মত অথচ যেমন ঠিক তারা নয় এমন একটা আশ্চর্য জ্যোতিষ্কের সন্ধান লাভ করলেন। নাম রাখলেন, কোয়াসি স্টেলর রেডিও সোরসেস বা সংক্ষেপে কোয়াসার। রেডিও দূরবীনে এদের তীব্র রেডিও বিকিরণও ধরা পড়লো। দেখা গেল, সাধারণ নক্ষত্র জগতের লাল সরণের মাত্রা অপেক্ষা ওদের লাল সরণ মাত্রা অনেক বেশী।

কোয়াসার সম্বন্ধে সঠিক তথ্য এখনও উদ্ঘাটিত হয়নি। তবু এদের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন বিজ্ঞানীরা। বোঝা গেছে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা চিরকাল একই অবস্থায় নেই। বিশ্ব যখন তরুণ ছিল তখনই এদের আবির্ভাব হয়েছিল এবং সে সময় এদের পরিমাণ ছিল আজকের তুলনায় অনেক—অনেক বেশী। পরে আজ থেকে প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে সূর্যের জন্মের সময়ে এদের পরিমাণ ছিল আজকের তুলনায় প্রায় ১০০ গুণ। তাদের অনেকেই নিভে গেছে। এত দূরে দূরে তাদের অবস্থান যে, যারা নিভে গেছে তাদের অনেকের আলো এখনও পৃথিবীতে এসে পড়েনি। আসবে আরও কত কোটি বছর পরে। কী অকল্পনীয় দূরত্ব!

এই মুহূর্তে বহু কোয়াসারকে সনাক্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের ধারণা, মহাবিশ্বে এখনও টিকে আছে এমন কোয়াসারের সংখ্যা কম করে ৩৫০০। এরা অত্যন্ত উজ্জ্বল। এত উজ্জ্বল যে, বহু কোটি নক্ষত্রকে নিয়ে এক একটি গ্যালাক্সীকে যে পরিমাণ উজ্জ্বল দেখায় তার থেকে ৫০ বা ১০০ গুণ উজ্জ্বল এক একটা কোয়াসার। এরা ব্যাতিক্রমও। সাধারণ নক্ষত্র-জগতের মত আলোক বিকিরণ সব সময় সমান থাকে না। ঔজ্জ্বল্যের তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

ব্ল্যাকহোল

চন্দ্রশেখর লিমিট

শভাংশু শিল্ড ব্যাস

সাদা বামন আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছিল, নক্ষত্রের সাদা বামন পর্যায়েই ঘনত্ব সর্বাধিক। অর্থাৎ বিশ্বের কোন বস্তুর ঘনত্ব সাদা বামনের ঘনত্বকে অতিক্রম করতে পারে না।

মহাকাশের নক্ষত্রদের শেষ পরিণতি নিয়ে গবেষণা করতেন এক ভারতীয় বংশোদ্ভব অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর। তত্ত্বীয় বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি। একদিন এক তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করলেন। তাতে দেখালেন, কোন নক্ষত্র ধ্বংস হওয়ার পর যদি তার ভর সূর্যের ভরের ১.৪ গুণ অবশিষ্ট থেকে যায় তাহলে সে সাদা বামন পর্যায় অতিক্রম করবে এবং আরও নিবিড় ঘনত্বের দিকে এগিয়ে যাবে।

তৎকালে চন্দ্রশেখরের ঐ তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তটুকু কেউ কিন্তু মেনে নিতে পারেন নি। সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল বিজ্ঞানীদের কাছে। কিন্তু কিছুকাল পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্রদের নিয়ে গবেষণা যখন জোরদার হলো তখনই কারও কারও মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো।

অপরদিকে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটি থিওরিতে একটি ইঙ্গিত ছিল। সে ইঙ্গিতটি হলো "যদি কোন সুবৃহৎ বস্তুপিণ্ডের আকর্ষণ বল চরমতম হয়ে উঠে তাহলে ঐ বস্তুপিণ্ডটি ক্রমশঃ সংকুচিত হতে হতে বিন্দুবৎ অবস্থায় এসে যাবে। এই অবস্থায় তার ঘনত্ব হবে অসীম এবং আয়তন হবে শূন্য।"

আইনস্টাইনের উপরোক্ত তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তটিও অনেকের কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। অসীম ঘনত্ব অথচ আয়তন একেবারে শূন্য—বিশ্বাসই করা যায় না।

বিজ্ঞানের রাজ্যে অবিশ্বাস্য বলতে কিছুই নেই। বিজ্ঞানীরা আবার চন্দ্রশেখর এবং আইনস্টাইন উভয়ের সিদ্ধান্তকে নিয়ে শুরু করলেন মাথা ঘামাতে। শুরু হলো হিসেব নিকেশ—গাণিতিক গণনা। শেষে গাণিতিক প্রমাণ উপস্থাপিত করায় দেখা গেল চন্দ্রশেখরের তত্ত্বটি অদ্ভুতভাবে মিলে যাচ্ছে। মিলে যাচ্ছে আইনস্টাইনের তত্ত্বও। তাই চোখে না দেখে একমাত্র গাণিতিক প্রমাণের সাপেক্ষে বস্তুপিণ্ডের বিন্দুবৎ অবস্থানের নামকরণ করা হোল ব্ল্যাক হোল। বাংলায় রূপান্তরিত করে কেউ বলেন কৃষ্ণগহ্বর কেউ বা বলেন কালো বিবর।

দীর্ঘকাল ধরে মহাকাশে ব্ল্যাকহোলের উপস্থিতি কেউই আবিষ্কার করতে

পারেন নি। অর্থাৎ সেটি অনেকদিন তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত হিসেবেই ছিল। যাচাই করার সুযোগ এলো বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতি হলে। ঐ বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানই পরিস্কার নক্ষত্রের বিবর্তনের ধারাগুলো জানিয়ে দিল। বিজ্ঞানীরাও বুঝতে পারলেন, আকাশের সূর্যের মত মাঝারি কোন নক্ষত্র—যার ব্যাস সাত লক্ষ কিলোমিটারের মত, সে যদি কোন অবস্থায় সংকুচিত হতে হতে এক সময় মাত্র তিন কিলোমিটার ব্যাসের বস্তুপিণ্ডে পরিণত হয় তাহলে তার সংকোচনকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। নিবিড় ঘনত্বের দিকে এগিয়ে যায় এবং সত্য সত্যই বিন্দুবৎ এক ব্ল্যাক হোলে পরিণত হয়।

চন্দ্রশেখরের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত এতদিনে প্রমাণিত হলো। বিজ্ঞানীরা আরও সিদ্ধান্তে এলেন, এমন নিবিড় ঘনত্ব অর্জন করতে পারে সূর্য অপেক্ষা বড় বড় নক্ষত্ররা তথা সুপার জায়েন্টরা। সেই কারণে ১.৪ সৌরভরকে একটা সীমারেখা ধরা হলো। ঐ সীমারেখার উপরে যাদের ভর, কেবল তারাই নিবিড় ঘনত্বের দিকে এগিয়ে যেতে পারে বলে ঐ সীমারেখাকে আবিষ্কারকের নামানুসারে নামকরণ করা হল চন্দ্রশেখর লিমিট।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী শভার্ৎজ শিল্ডও সে সময় আর এক তত্ত্বের উপস্থাপনা করলেন। তিনি দেখালেন, কোন বৃহদাকার নক্ষত্র ভেঙ্গে যাওয়ার পর যে অবশেষটুকু থেকে যায় তার সংকোচন মাত্রা প্রবল হয় এবং সেই সংকোচনের ব্যাস হয় মাত্র তিন কিলোমিটার।

বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বটিকেও প্রমাণ করলেন এবং ঐ তিন কিলোমিটার ব্যাসকেও একটা সীমারেখা ধরা হলো। এক্ষেত্রেও আবিষ্কারকের নাম অনুসারে নাম রাখা হলো শভার্ৎজ শিল্ড ব্যাস।

এতদিনে বোঝা গেল, নক্ষত্রের শেষ পরিণতি হয় সাদা বামন, নয়ত নিউট্রন নক্ষত্র, নতুবা ব্ল্যাকহোল। তত্ত্বীয় বিজ্ঞানীদের হিসেব মত কোন নক্ষত্রের ভর যদি ৩.৫ সৌরভরের কম হয় তাহলে সেটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলে ভর দাঁড়াবে ১.৪ সৌর ভরের কম। এই অবস্থায় ওর পরিণতি সাদা বামন। কিন্তু প্রাথমিক ভর ৩.৫ এর বেশী অথচ ১০ সৌরভরের কম হয়, তাহলে তার অবশেষের ভর হবে ৩ সৌরভরের সমান। অপরদিকে প্রাথমিক সৌরভর যদি ১০ এর অধিক হয় তাহলে সেটির পরিণতি ঘটবে ব্ল্যাকহোলে। এই অবস্থায় ওর মহাকর্ষের টান এত প্রবল হবে যে, আলোও পর্যন্ত বাহিরে বার হতে পারবে না। এমনকি যদি বাহির থেকে কোন আলো এসে তার উপরে পড়ে, তাহলে সে আলোও অভ্যন্তরে তলিয়ে যাবে। কিছুতেই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসবে না। সে এক নিশ্ছিদ্র ও অতি ভয়ংকর অন্ধকার গহ্বর।

ব্ল্যাকহোলের আকর্ষণের আওতায় কোন নক্ষত্র থাকলেও তার রক্ষা নেই। সেখান থেকে গ্যাস প্রবল বেগে ছুটে আসবে। কাছাকাছি হলেই অতিশয় তপ্ত হয়ে উঠবে এবং এক্স রশ্মির সৃষ্টি হবে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, সায়াগনাস x_1 নামক ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্রটি একটি ব্ল্যাকহোল।

লাল সরণ

নক্ষত্রের দৌড়

ডপলার তত্ত্ব

মহাকাশের বাসিন্দারা কেউ স্থির নয়। প্রত্যেককেই ঘুরতে হচ্ছে এবং ঘুরতে হচ্ছে পাক খেতে খেতে যে কোন কেন্দ্রীয় বস্তুর চারদিকে। প্রত্যেকের কিছু না কিছু গতিবেগও আছে।

না, এই গতিবেগের কথা বলা হচ্ছেনা। এইভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের গ্যালাক্সিরা যদি আবর্তন করতে করতে কেন্দ্রীয় বস্তুর চারদিকে একই ছন্দে বৃত্তাভাস পথে কলুর বলদের মত চলতে থাকতো তাহলে মহাকাশের চেহারাটা চিরকাল একই থাকতো। কিন্তু বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, মহাকাশের চেহারাটা বদলেছে বারে বারে। আগের চেহারার যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনই ভবিষ্যতেও পরিবর্তন হতে থাকবে।

বিজ্ঞানীরা উপরোক্ত সত্যটি উদ্ঘাটন করেছেন একেবারে আধুনিককালে। আর এই আধুনিককালেই প্রমাণিত হয়েছে মহাকাশটা অবিশ্বাস্য রকমের বিশাল। আর্থার এডিংটনের মতে এক একটা গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র জগতে কম করে একশ কোটি নক্ষত্র আছে। এক নক্ষত্র থেকে আর এক নক্ষত্রের দূরত্ব কম করে দুই, তিন কিংবা তারও অধিক আলোকবর্ষ। অতএব এক একটা নক্ষত্র জগতের অধিকৃত স্থান যে কত বিশাল, তা সহজে অনুমান করা যেতে পারে। অপর-দিকে একটি নক্ষত্রজগৎ থেকে আর একটি নক্ষত্র জগতের এমনই ব্যবধান যে তার ভেতরে কয়েকশ নক্ষত্র জগৎ অক্লেশে স্থান পেতে পারে। বর্তমানের হিসেব অনুযায়ী পাঁচ-হাজার কোটি দূরত্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা তাঁদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে পেরেছেন এবং প্রায় হাজার কোটি নক্ষত্রজগতের সন্ধান পেয়েছেন। আন্দাজ করা হচ্ছে, এর বাহিরেও হাজার হাজার কোটি নক্ষত্রজগৎ বিদ্যমান।

অকল্পনীয় এই মহাবিশ্বের পরিচয় এই বিংশ শতাব্দীতেই লাভ করেছেন বিজ্ঞানীরা। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, একমাত্র আমাদের নক্ষত্রজগৎটাকে নিয়েই বিশ্ব গড়ে উঠেছে। এর বাহিরে কোন নক্ষত্র-জগৎ নেই। তবে ১৮২৬ সালে জার্মান বিজ্ঞানী উইলহেম ওলবার বলেছিলেন মহাকাশে ক্রম বর্ধমান ব্যাসযুক্ত অসংখ্য গোলক আমাদের নক্ষত্রজগৎটাকে একরকম মালার মত ঘিরে রেখেছে। দুটি গোলকের মাঝখানে অবস্থিত নক্ষত্র জগতের সংখ্যা বর্ধিত ব্যাসার্ধের বর্গফলের সমানুপাতিক এবং দীপনমাত্রা দূরত্বের বর্গের, ব্যাস্তানুপাতিক।

ওলবারের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তটা অনেকের মনে চমক লাগিয়েছিল। অনেকে ভাবনা চিন্তাও করেছিলেন। কিন্তু প্রমাণ অভাবে সিদ্ধান্তটিকে বাতিল করে দিয়েছিলেন।

বাতিল করার অন্য কারণও ছিল। ওলবারের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিলে মহাশূন্যে ব্যভিচারের ফলে অধিকাংশ আলো লয় প্রাপ্ত হওয়া 'সত্বেও পৃথিবীতে যত আলো ভিড় করতো তাতে দিনরাত সবসময় আলোয় আলোময় হয়ে থাকতো। তা হয়নি কেন?

বিংশ শতাব্দীর উন্নত দূরবীন ওলবারের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তকে অনেকটা সমর্থন করলো। সত্য সত্যই বিজ্ঞানীরা দেখলেন, মহাকাশে অসংখ্য নক্ষত্র-জগৎ চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কেউ কেউ এত দূরে আছে যে, তাদের আলো প্রচন্ড গতিতে অর্থাৎ সেকেন্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে ছুটে আসা সত্ত্বেও আজও পৃথিবী পৃষ্ঠে পেঁছিতে পারে নি। তবুও তাঁরা ভেবে দেখলেন যত আলোক পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে তাতে পৃথিবীর রাতের-আকাশটা এত অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার কথা নয়।

সন্দেহের দোলায় দোল খেতে লাগলেন বিজ্ঞানীরা। সুরু করলেন নক্ষত্র-দের বর্ণালীকে নিয়ে পরীক্ষা।

বর্ণালী হচ্ছে সাত রঙের পটি বা গুচ্ছ। সূর্য অথবা যে কোন নক্ষত্রের সাদা আলোক বেগুনী, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল-এই সাত রঙের আলোকের মিশ্রণ। এদের প্রত্যেকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পৃথক পৃথক। লালের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী এবং বেগুনীর সবচেয়ে কম। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেগুনী থেকে ক্রমান্বয়ে বেড়ে বেড়ে গেছে লালের দিকে।

দূরের নক্ষত্রদের বর্ণালী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখতে পেলেন কাছাকাছি নক্ষত্র অপেক্ষা দূরের নক্ষত্রদের বর্ণালী কিছুটা পৃথক। কাছের নক্ষত্রের বর্ণালীকে বিশ্লেষণ করলে যেখানে লাল বর্ণালী পাওয়া যায়, দূরের নক্ষত্রেদের বেলায় সে জায়গায় লাল না থেকে সামান্য উপরের দিকে থাকে।

ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ সন্দেহ নেই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কোন কিছুকে তুচ্ছ ভাবেন না। তাই-শুরু করলেন ভাবনা চিন্তা—কেন এই লাল অপসরণ?

বিজ্ঞানী ডপলার কিছুকাল আগে শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে বিশেষ এক ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন। সে ক্রিয়াটি ডপলার এফেক্ট নামে পরিচিত। ঐ ক্রিয়া অনুযায়ী শব্দের তীব্রতা শব্দতরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি তথা প্রতিসেকেন্ডে উত্থিত শব্দ-তরঙ্গের যতগুলো শ্রোতার কাণে আসে সেই সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ রেলগাড়ীর বাঁশীর কথা ধরা যেতে পারে। ধরা গেল, স্টেশনে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে আর একটা ট্রেন বাঁশি বাজাতে বাজাতে ছুটে আসছে —সেটি থামবেনা সে স্টেশনে। বাঁশী বাজাতে বাজাতে অতিক্রম করে যাবে স্টেশনটি।

ট্রেনটি যখন স্টেশনের দিকে ছুটে আসে তখন তার গতির দ্রুততা অনুযায়ী

বাঁশি কর্তৃক উৎপন্ন শব্দ তরঙ্গগুলো (প্রতি সেকেণ্ডে) অধিক সংখ্যক স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির কাণে আসবে। যেহেতু বাঁশীর একটা নির্দিস্ট ফ্রিকোয়েন্সি আছে, তাই এই অবস্থায় ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যাবে এবং শ্রোতার কাণে শব্দের তীব্রতা বাড়বে। স্টেশন অতিক্রম করে ট্রেনটি যখন দূরে চলে যেতে থাকবে তখন বাঁশীর শব্দ তরঙ্গ ক্রমশঃ কমসংখ্যায় লোকটির কাণে আসবে। কাজে কাজেই ফ্রিকোয়েন্সি কমবে এবং লোকটির কাণে বাঁশীর শব্দের তীব্রতাও তদনুযায়ী কমে যাবে।

শুধু শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে নয় যে কোন তরঙ্গ মাত্রেই অনুরূপ ধর্মের অধিকারী একথাও ডপলার উল্লেখ করেন। এই তত্ত্বটাকে বিজ্ঞানীরা এবার প্রয়োগ করলেন আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে। তত্ত্ব অনুযায়ী যদি কেউ কোন একটি আলোর উৎসের দিকে ক্রমাগত ছুটতে থাকে তাহলে সে অবশ্যই আলোর রঙ বদলাতে দেখবে! কারণ, কোন উৎস থেকে যখন আলো আমাদের চোখে এসে পড়ে তখন সেই আলোর কম্পনাঙ্ক আমাদের চোখকে আঘাত করে। ধরা গেল, আমরা কোন একটি লাল আলোককে দেখছি। ওর কম্পনাঙ্ক ৪ × ১০^{১৪} থেকে ৪·৮ × ১০^{১৪}। অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে আলোকটা ৪ × ১০^{১৪} বার চোখে আঘাত করছে। যদি কেউ সে আলোর দিকে যথেষ্ট গতিবেগ নিয়ে ছুটতে থাকে তাহলে আলোক তরঙ্গগুলো আরও তাড়াতাড়ি তার চোখে আঘাত করবে। লোকটির গতিবেগ যদি এমন হতো, যাতে ৪·৮ × ১০^{১৪} এর অধিক কম্পনাঙ্ক বিশিষ্ট আলো চোখে আঘাত করতে পারবে তাহলে সে লাল আলো না দেখে কমলা রঙকে দেখবে। কেননা কমলার কম্পনাঙ্ক ৪·৮ × ১০^{১৪} থেকে ৫ × ১০^{১৪}। [অন্যান্যদের কম্পনাঙ্ক যথাক্রমে হলুদের ৫ × ১০^{১৪} থেকে ৫·২ × ১০ × ^{১৪}, সবুজের ৫·২ × ১০^{১৪} থেকে ৫·৯ × ১০^{১৪}, নীলের ৫·৯ × ১০^{১৪} থেকে ৬·৫ × ১০^{১৪}, আসমানির ৬·৫ × ১০^{১৪} থেকে ৭·১ × ১০^{১৪}, বেগুনীর ৭·১ × ১০^{১৪} থেকে ৭·৫ × ১০^{১৪}]

অতএব যদি কেউ আরও আরও বেশী জোরে আলোকের উৎসের দিকে ছুটে যায় এবং ৫ × ১০^{১৪} কম্পনাঙ্ক তার চোখে আঘাত করে তাহলে সে হলদে কে দেখতে পাবে। এর বিপরীতও হতে পারে। অর্থাৎ উৎস থেকে কেউ যদি ক্রমান্বয়ে দূরে দূরে সরে যায় তাহলেও রঙ বদলাবে। তথা ছোট তরঙ্গের আলোর পরিবর্তে বড় তরঙ্গের আলো দেখবে। উদাহরণ স্বরূপে উল্লেখ করা যায় যে, কেউ হয়ত হলদে আলোক দেখছে, কিন্তু সে কমলার পরিবর্তে দেখবে কমলার উপরের রঙ লালকে।

পূর্বের সেই বর্ণালী পরীক্ষায় লাল অপসরণের এবার প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া গেল। বর্ণালীতে যখন লালরঙের অপসরণ হচ্ছে, তথা দূরের নক্ষত্রের বর্ণালীর রঙটা যখন উপরের দিকে সরে সরে যাচ্ছে, তখন বুঝতে হবে আলোর উৎসটাও দূরে সরে যাচ্ছে। এর ব্যাখ্যা দাঁড়াচ্ছে, নক্ষত্র জগৎগুলো ক্রমাগত

আমাদের সূর্য যে নক্ষত্রজগতের বাসিন্দা—সেই নক্ষত্রজগৎ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

এর একটা বাস্তব উদাহরণও দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। একটা বেলুনকে ফুঁ দিয়ে ফাঁপাতে থাকলে যেমনটি হয়, মহাবিশ্বটাও তেমনই ফাঁপছে। তার ভেতরের নক্ষত্রজগৎগুলোর মধ্যে পরিসরও বেড়ে চলেছে। ফলে দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে নক্ষত্রজগৎগুলো। আদিতে সবটা এক জায়গায় যেন ঠাসাঠাসি ভাবে অবস্থান করছিল। হাবলের গণনা অনুযায়ী প্রায় ২০০ কোটি বছর আগে ওরা যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু বর্তমানের পরীক্ষা থেকে জানা গেছে, ঐ সময়কালটা আরও অনেক বেশী।

যাই হোক, নক্ষত্রের অপসরণ বেগকে নিয়ে গবেষণার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন বহু বিজ্ঞানী। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কালিফোর্নিয়ার উইলসন মানমন্দিরে গবেষণারত এডুইন পি. হাবল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে নক্ষত্রদের অপসরণ বেগ সংক্রান্ত একটা সূত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন। সূত্রানুযায়ী নক্ষত্র জগতের অপসরণ বেগ তার দূরত্বের সমানুপাতিক। অর্থাৎ অপসরণ বেগ = ধ্রুবক × দূরত্ব।

বর্ণালী পরীক্ষা থেকে ঐ ধ্রুবকের মানও নির্ণয় করা গেছে। তা থেকে জানা গেছে, প্রতি ৩ ২৬ আলোকবর্ষ দূরত্ব বৃদ্ধির জন্য অপসরণ বেগ প্রতি সেকেন্ডে ১০০ মাইল করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোটামুটি এই সিদ্ধান্তকে এখনও মেনে নেওয়া হচ্ছে এবং সম্ভবতঃ মহাবিশ্বের এটি সর্বাধিক বিস্ময়কর তথ্য।

এবার সেই বেলুনটার কথায় ফিরে আসা যাক। বেলুনকে ক্রমাগত ফাঁপাতে থাকলে এক সময় পটাং করে ফেটে যায়। কিন্তু মহাবিশ্বতো আর বেলুন নয় উদাহরণ মাত্র। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা প্রসারিত হতে আছে বটে, কিন্তু ওর প্রসারণের একটা সীমা আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। সেই সীমা পর্যন্ত গেলে প্রসারণ থেমে যাবে এবং বাতাস বার করে দেওয়া ফুটবলের ব্লাডারের মত চুপসে যাবে এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই এক জায়গায় জড় হবে। প্রচণ্ড তাপমাত্রা ও চাপে ধ্বংস হয়ে যাবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। তবে সে সময়টা আসতে আরও কয়েকশ কোটি বছরের দরকার।

মহাবিশ্বের বয়স ● পৃথিবীর বয়স

এককালে মনে করা হতো, মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে স্থিতাবস্থায় আছে। বিশ্ব সম্প্রসারণ মতবাদ স্বীকৃত হওয়ার পর এবং এক মহাবিস্ফোরক থেকে

বিশ্বের উৎপত্তিকে মেনে নেওয়া হলে স্বভাবতঃই এর বয়স সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে। তখনই বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বের বয়স নির্ণয়ে যত্নবান হন।

যতদূর সম্ভব মহাবিশ্বের বয়স নির্ধারণে প্রথম সচেষ্ট হয়েছিলেন বিজ্ঞানী এড্উইন পি. হাবল। ১৯৩৬ সালে তিনি মহাবিশ্বের বয়স নির্ধারণ করেন বিশেষ এক গাণিতিক ফরমুলার সাহায্যে। নক্ষত্রজগৎগুলো ক্রমান্বয়ে যে দূরে দূরে সরে যাচ্ছে তাদের বর্ণালীর লাল অপসরণ থেকে দূরত্বের পরিমাণটা নির্ণয় করার জন্যই অবশ্য ফরমুলাটির উদ্ভাবন। সেই ফরমুলাটি $r = \frac{cz}{H}$। এখানে c = আলোকের বেগ, z = লালসরণ, r = দূরত্ব এবং H = হাবল ধ্রুবক। তাই ফরমুলাটি থেকে পাওয়া যায় $cz = r \times H$ বা লালসরণ × আলোর গতিবেগ = নক্ষত্র জগতের অপসরণ বেগ। নক্ষত্র জগতের অপসরণ বেগকে v ধরলে, $cz = v$।

অতএব মূল ফরমুলাটি হয় $r = \frac{v}{H}$ বা $\frac{r}{v} = \frac{I}{H}$.

এই ফরমুলাটি থেকেই হাবল বয়স নির্ণয় করেছিলেন। এবং বয়স নির্ধারিত হয়েছিল ২০০ কোটি বছর।

সে আমলে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর নানা জায়গায় শিলাস্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলোকে পরীক্ষা করে পৃথিবীরই বয়স বার করেছিলেন ৩৫০ কোটি বছর। পরে ভারি মৌলের তেজস্ক্রিয়া থেকে পৃথিবীর বয়স নির্ধারিত হলো প্রায় ৪৫০ কোটি বছর!

তাই হাবলের নির্ধারিত বয়সকে মেনে নিতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। কারণ আগে মহাবিশ্ব, তারপর নক্ষত্রজগৎ ও নক্ষত্র, অবশেষে পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহের সৃষ্টি। অতএব এমন অসঙ্গতিকে কেমন করে মেনে নেওয়া যায়! তাই মেনে নিতে পারেননি ফ্রেড হয়েল প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা। তিনি অবশ্য মহাবিশ্বের স্থিতাবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বহু বিজ্ঞানীর সেই একই ধারণা ছিল।

পরে বিশ্বের সম্প্রসারণ মতবাদ স্বীকৃতি লাভ করলে, অনেকেরই মনে সন্দেহ ঘণীভূত হলো—যেহেতু বিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে, সেই হেতু আদিতে নিশ্চয়ই সবকিছু একটি জায়গায় ঘন সন্নিবিষ্ট ছিল। মহাবিস্ফোরণ মতবাদকে যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে মহাবিস্ফোরণ যে কালে ঘটেছিল সেই সময়টার নিশ্চয়ই একটা হদিস খুঁজে পাওয়া যাবে। সেই থেকে পাওয়া যাবে বিশ্বের বয়স। কিন্তু কোন্ সূত্র ধরে অগ্রসর হবেন তাঁরা? তবে এও স্বীকার করলেন, যে সূত্রই অবলম্বন করা হোক না কেন, কাল যখন বিপুলা তখন দশ বিশ কিংবা ১০০ কোটি বছরেরও গরমিল হতে পারে। কেবল স্থূল বয়স একটা নির্ণয় করা যাবে মাত্র!

বিজ্ঞানীরা বিশ্বের বয়স মাপার জন্য সেই হাবলের ফরমুলার দিকেই প্রথম

আকর্ষণ বোধ করলেন। সচেষ্ট হলেন হাবলের ত্রুটি অনুসন্ধান করতে। শেষে বুঝতে পারলেন, হাবলের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল দূরের নক্ষত্র জগতের দূরত্ব নির্ণয়ের। কাছাকাছি কোন নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয়ের যে নিয়ম আছে তা কিন্তু অতি দূরের নক্ষত্র জগতের ক্ষেত্রে ঘটবে না।

কাছের জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নির্ণয় করা হয় সাধারণতঃ লম্বন বা ত্রিকোনোমিতির সাহায্যে। নিয়মটি হচ্ছে, পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধের তথা সূর্য ও পৃথিবীর ব্যবধানের দুটি প্রান্ত থেকে রেখা বরাবর মহাকাশের কোন নক্ষত্রের সঙ্গে যুক্ত করলে একটি কোণ উৎপন্ন হবে। ঐ কোণকে বলে বার্ষিক লম্বন বা অ্যানুয়েল প্যারালাক্স। যত দূরে থাকলে কোণের পরিমাপ ১ সেকেন্ড তথা $\frac{১}{৩৬০০}$ ডিগ্রী হয়, সেই দূরত্বকে বলা হয় পারসেক। এক মিটার ভূমির সামনে ১ সেকেন্ড পরিমিত কোণ দেখতে পাওয়া যায় ২০৬২৬৫ মিটার দূরের বিন্দু থেকে। সূর্য ও পৃথিবীর ব্যবধান যেহেতু ৯৩০০০০০০ মাইল, তাই হিসেব করলে ১ পারসেক হয়=৩·২৬ আলোকবর্ষ।

এই নিয়ম দূরের নক্ষত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এই কারণে যে, কোণটি বেজায় সূক্ষ্ম হয়ে পড়ে। এত সূক্ষ্ম যে পরিমাপ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই বিজ্ঞানীরা দূরত্ব নির্ণয়ের অন্য পথ ধরলেন। সে পথ নক্ষত্রের আপাত ও পরম ঔজ্জ্বল্য পরিমাপের পথ।

ততদিনে বিজ্ঞানীরা স্থির করে নিয়েছেন, জ্যোতিষ্কের আপাত ঔজ্জ্বল্য, পরম ঔজ্জ্বল্য এবং দূরত্বের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। জ্যোতিষ্কের আপাত ঔজ্জ্বল্য বা প্রভা দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়, এবং এই আপাত ঔজ্জ্বল্য ফটোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে সহজে নির্ণয় করতে পারা যায়। কিন্তু পরম ঔজ্জ্বল্য! এটি নির্ণয় করার বেশ অসুবিধে। অপরদিকে অতি দূরের নক্ষত্র জগতের ক্ষেত্রে আরও অসুবিধা।

বিজ্ঞানীরা পরম ঔজ্জ্বল্য মাপতে বাঁকাপথ ধরলেন। যেহেতু একই প্রভা-বিশিষ্ট সমভরের এবং সম আয়তনের দুটি জ্যোতিষ্কের কাছেরটিকে উজ্জ্বল এবং দূরেরটিকে ম্লান দেখায়, তাই পৃথিবী থেকে দুটিকে সমান দূরত্বে রেখে প্রভার তুলনা করা যেতে পারে। অপরদিকে একটি সূত্রের সাহায্যেও মাপা যেতে পারে পরম ঔজ্জ্বল্য। সূত্রটি—

$I \propto \frac{1}{d^2}$ । I = ঔজ্জ্বল্য এবং d = দূরত্ব। (ঔজ্জ্বল্য দূরত্বের ব্যস্তানু-পাতিক)।

উপরোক্ত নিয়মগুলো অবলম্বনে পরম ঔজ্জ্বল্য মাপতে গিয়েও নিখুঁত হিসেব পেলেন না বিজ্ঞানীরা। এটি সম্ভব হলো সেফাইড তারা আবিষ্কারের পর। সেফাইড তারারা এমনই যে, তাদের ঔজ্জ্বল্য পর্যায়ক্রমে বাড়ে এবং কমে (পালসার নয়)। পর্যায়কাল কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত স্থায়ী

হয়। একদিন সেফাইড তারাদের পর্যায়কালের সঙ্গে তাদের ঔজ্জ্বল্যের একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক খুঁজে পেলেন এবং সম্পর্কটি প্রয়োগ করে পর্যায়কাল থেকেই তাদের নির্ভুল ঔজ্জ্বল্য এবং দূরত্ব নির্ণয় করলেন। আর এই আবিষ্কারকে ভিত্তি করে ১৯৫০ সালে বিজ্ঞানীরা "হাবল ধ্রুবক" পরিমাপ করে নির্ণয় করলেন মহাবিশ্বের বয়স এবং বয়স নির্ধারিত হলো এক হাজার বছর।

অন্য উপায়েও বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের বয়স মাপতে সচেষ্ট হলেন। সে উপায়টি ভারি মৌলের তেজস্ক্রিয়া—যার সাহায্যে পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা পৃথিবীর মাটিতেই রয়েছে তেজস্ক্রিয় ধাতু। কিন্তু পৃথিবী আর মহাবিশ্ব আসমান জমিন ফারাক। আদিকালে উৎপন্ন ভারি মৌলের সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে?

বিজ্ঞানী গ্যামভের মতে মহাবিস্ফোরণের কয়েক মিনিটের ভেতরেই প্রোটন ও নিউট্রন একত্রিত হয়ে সমস্ত মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রীয় বস্তু উৎপন্ন করেছিল। অর্থাৎ সেই স্বল্প সময়ের ভেতরেই তৈরি হয়েছিল হাইড্রোজেন থেকে ইউরেনিয়াম ও ইউরেনিয়ামোত্তর সব রকমের মৌল। কিন্তু উক্ত মতের বিরোধিতা করলেন অনেকে। শেষে স্থির হলো, বিশ্বসৃষ্টির প্রথমভাগে তৈরি হয়েছিল হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং তাদের আইসোটোপগুলো। পরে মৌল সৃষ্টির শেষ পর্যায়ে তৈরি হয়েছিল তেজস্ক্রিয় ভারি মৌলগুলো।

তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওরা আপনা হতেই ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এবং তাদের ক্ষয়ের হার সব সময় নির্দিষ্ট। অর্থাৎ সৃষ্টির আদি থেকে একই হারে তারা ক্ষয় পেয়ে আসছে এবং সেই ক্ষয়ের শেষ ধাপে উৎপন্ন হয় সীসা। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত প্রাচীন শিলায় সীসা ও ইউরেনিয়াম অথবা সীসা ও থোরিয়াম ইত্যাদির আপেক্ষিক পরিমাণ নির্ণয় করে যেমন পৃথিবীর বয়স স্থির করা হয়েছে, তেমনই মহাবিশ্বেরও বয়স নির্ণয় করা হয়েছে।

ব্যাপারটা অবশ্য বেশ জটিল। তবু সার কথা হলো, মহাবিশ্বের বয়স নির্ণয় করার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এক একজোড়া তেজস্ক্রিয় মৌল বেছে নেন। যখন প্রথম তৈরি হয়েছিল তাতে সীসা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থটির যে অনুপাত ছিল সেই অনুপাত এবং আজকের দিনে প্রাপ্ত সেই পদার্থে তাদের অনুপাত মেপে নেওয়া হয়! ওতেই প্রয়োগ করা হয় তেজস্ক্রিয়তার হার। (ইউরেনিয়ামের অর্ধ জীবনকাল ৭৬০ কোটি বছর, থোরিয়ামের অর্ধজীবন ২১১০০০ বছর। যে নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ যে সময়ে ভাঙ্গনের ফলে ঐ পরিমাণের অর্ধেক দাঁড়ায় তাকেই বলে অর্ধজীবন কাল। এই ভাঙ্গনের হার স্থান বা কালের উপর নির্ভরশীল নয়। যে কোন অবস্থাতে থাক না কেন ১ গ্রাম ইউরেনিয়াম কোথাও থাকলে ৭৬০ কোটি বছর পরে আধ গ্রামের অর্ধেক তথা সিকি গ্রাম সীসা উৎপন্ন হবে এবং সিকি গ্রাম ইউরেনিয়াম অবশিষ্ট থাকবে। ঠিক এই ভাবে সীসাতে রূপান্তরিত হওয়ার হারটা নির্দিষ্ট থাকে। পৃথিবীর বুকে অতি

প্রাচীনকালে উৎপন্ন পাথরগুলোকে পরীক্ষা করে পাওয়া যায় পৃথিবীর বয়স। পৃথিবীতে এই ধরণের পাথর পাওয়া গেছে গ্রীণল্যান্ড এবং ভারতের ওড়িশা রাজ্যে। এই ব্যাপারে প্রখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহার পুত্র ডঃ অজিত কুমার সাহার অবদান রয়েছে। তাছাড়া এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন ডঃ সমর সরকার, ডঃ সাগরলাল রায় প্রমুখ বিজ্ঞানীরা)।

পৃথিবীর মত মহাবিশ্বের বয়স নির্ণয় করা সহজ নয় বলে তেজস্ক্রিয়তার হার প্রয়োগ করে যে সময় কাল নির্ধারণ করা হয় তার সঙ্গে যোগ করা হয় মহা বিস্ফোরণের কাল থেকে ভারি মৌল তৈরি হওয়ার সম্ভাব্য সময়। এই পদ্ধতিতে বয়স নির্ধারিত হয়েছে। ৭০০ কোটি বছর থেকে ১১০০ কোটি বছর!

বর্তমানে বহু প্রাচীন তারা ও তারামণ্ডলীর সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই সব তারামণ্ডলীকে পরীক্ষা করে তাদের বয়স নির্ণয় করা হয়েছে। আর তার সঙ্গে যোগ করা হয়েছে মহাবিস্ফোরণের সময় থেকে তারামণ্ডলী সৃষ্টির সম্ভাব্য কাল। এক্ষেত্রে বয়স পাওয়া গেছে ১০০০ কোটি থেকে ১৫০০ কোটি বছর।

তাই আমরা ধরে নিতে পারি, কম করে হাজার কোটি বছর আগে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতে শুরু করেছিল।

ধূমকেতু

কালেভদ্রে সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম আকাশে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশে এক আশ্চর্য ধরণের জ্যোতিষ্ককে উদয় হতে দেখা যায়। একটু যেন অদ্ভূত লাগে দেখতে এবং আকাশের অন্যান্য জ্যোতিষ্ক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। জ্যোতিষ্কটির কেন্দ্রদেশটা একটা ম্লান তারার মত অথচ সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে ঝাঁটার মত মস্ত এক পুচ্ছ। পুচ্ছটা বেশ উজ্জ্বলও। কখনও কখনও সেই পুচ্ছটি আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, এবং পুচ্ছটি এত পাতলা যে, তার ভেতর দিয়ে ম্লান তারাগুলোকেও অক্লেশে দেখা যায়।

অদ্ভূত দর্শন এই জ্যোতিষ্কটির নাম ধূমকেতু। মানুষ যতদিন থেকে নিজের মনোভাবকে লিপির মাধ্যমে প্রকাশ করার ক্ষমতা লাভ করেছে, ততদিন থেকেই লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করে এসেছে বিস্ময়। আশ্চর্য এই জ্যোতিষ্কটি হঠাৎই আকাশে এসে পড়ে এবং কয়েকদিন পরে আবার কোথায় চলে যায়, তার

হদিস খুঁজে পাওয়া যায় না। এইভাবে ধূমকেতুর আকস্মিক আগমন ও প্রস্থানকে অবলম্বন করে মানুষ এককালে ওদের জন্য শুধু বিস্ময় প্রকাশ করেনি, নানা কুসংস্কারও গড়ে তুলেছিল। সব দেশের মানুষই ধূমকেতুর উদয়কে অমঙ্গলের প্রতীক রূপে গণ্য করতো। ভাবতো ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ইত্যাদির প্রতীক ধূমকেতু। কোন কোন দেশের মানুষ আবার মনে করতো ধূমকেতুর উদয় হলে রাজার মৃত্যু ঘটবে। সেক্সপীয়র হয়ত এই কারণে সখেদে একটি সংলাপে লিখেছিলেন "ভিখিরির মৃত্যুতে ধূমকেতুকে দেখা যায় না, দেখা যায় রাজপুত্রের মৃত্যুতে।"

তাই ধূমকেতুর প্রতি সবারই ছিল যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়। আর ঐ কারণেই প্রাচীনকালের বহু দেশের বহু পুঁথিতে ধূমকেতুর উল্লেখ দেখা যায়। সেকালে কেউ কেউ ওর ছবিও এঁকে গেছেন। কিন্তু ধূমকেতু সম্বন্ধে কোন বিবরণ কেউ প্রদান করেননি। তাই মনে করা যেতে পারে, ধূমকেতু যে প্রকৃতপক্ষে কী এবং এর পুচ্ছটাই বা থাকে কেন—এ বিষয়ে কোন ধারণা ছিল না সেকালের পন্ডিতদের। শুধু লোকমুখে প্রচলিত সংস্কারটাই প্রাধান্য লাভ করেছিল।

ধূমকেতুর রহস্য প্রথম উদ্ঘাটন করেন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালি, যিনি ছিলেন নিউটনের অকৃত্রিম বন্ধু। ১৬৮২ সালে ইংলন্ডের আকাশে বিশাল এক পুচ্ছযুক্ত এবং অত্যুজ্জ্বল একটি ধূমকেতুকে দেখে মানুষ যখন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল তখনই তিনি ঐ ধূমকেতুটিকে নিয়ে শুরু করেন গবেষণা করতে।

অংক কষে তিনি ধূমকেতুটির প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করলেন একদিন। জানালেন, ধূমকেতুকে দেখে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই! এই ধূমকেতুটি প্রতি ৭৬ বছর অন্তর অন্তর পৃথিবীর আকাশে উদিত হয়। ৭৬ বছর আগে যেমন একবার এসেছিল, তেমনই পুনরায় ওকে দেখা যাবে ৭৬ বছর পরে। এরাও সৌরজগতের বাসিন্দা, তবে পথ বড় বেশী উপবৃত্তাকার। গ্রহ ও উপগ্রহদের মত এদের সূর্যকে পরিক্রমা করতে হয়।

সেদিন হ্যালির কথায় হয়ত অনেকে আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। কিন্তু ৭৬ বছর পরে ওকে পুনরায় যখন পৃথিবীর আকাশে দেখা গেল, তখনই হ্যালির ভবিষ্যদ্বাণীকে স্বাগত জানালেন সবাই। হ্যালির নামেই চিহ্নিত করা হলো ধূমকেতুটিকে। অর্থাৎ নামকরণ করা হলো হ্যালির ধূমকেতু।

সহস্র সহস্র বছরের সংস্কারের দৃঢ়ভিত্তির মূলটা এতদিনে যেন নড়ে উঠল। এবারে অনেকেই ধূমকেতুর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনে যত্নবান হলেন। গবেষণা থেকে জানা গেল, ধূমকেতুর চারটে অংশ। এর কেন্দ্রস্থল তথা মুন্ডকে খালি চোখে দেখা যায় না। অধিকাংশের মুন্ডের ব্যাস মাত্র বিশ ত্রিশ কিলোমিটারের মত। মুন্ডকে ঘিরে থাকে গ্যাসীয় আবরন বা কোমা। কোমার উপাদান প্রধানতঃ জলীয় বাষ্প, মিথেন এবং অ্যামোনিয়া। কোমার জন্যই নাম কমেট বা

ধূমকেতু। তৃতীয় অংশটা হচ্ছে পুচ্ছ এবং চতুর্থ অংশ পুচ্ছকে ঘিরে এক সূক্ষ্ম আবরণ।

ধূমকেতু সূর্য সন্নিধানে এলেই সূর্যরশ্মির চাপে তার পুচ্ছ উৎপন্ন হয়। সূর্য থেকে ধূমকেতু যত দূরে সরে যায়, ততই তার পুচ্ছটা কমতে থাকে। অতিদূরে গেলে পুচ্ছ উৎপন্ন হয় না।

ধূমকেতুর পুচ্ছ চিরস্থায়ী নয়। ঘন ঘন সূর্যের সন্নিকটবর্তী হলে অথবা বার কয়েক সূর্যের কাছাকাছি হলে, পুচ্ছটা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। তখন তাকে ধূমকেতু বলে আর চেনা যায় না। এমন পুচ্ছহীন ধূমকেতুও আকাশে উদিত হয়।

ধূমকেতুর পুচ্ছ যে নষ্ট হয়ে যায়—এই সত্য ব্যায়েলার ধূমকেতুর বেলায় প্রমাণিত হয়েছে। ১৮৩২ সালে বিজ্ঞানী ব্যায়েলার যে ধূমকেতুটিকে সনাক্ত করেছিলেন সেই ধূমকেতুটি মাত্র ৬৩/৪ বছরে সূর্য পরিক্রমা শেষ করতো। ১৮৪৫ সালে শেষবারের জন্য সে এসেছিল এবং সে সময় তার পুচ্ছ ছিল না। পরের পর্যায়ে দেখা যায় নি। তার পরের পর্যায়ে এসেছিল আধখানা। এর পরে সে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।

বর্তমানের উন্নত জ্যোতির্বিজ্ঞান ধূমকেতু সম্বন্ধে নানা তথ্য আহরণ করেছে। তবু সব সত্য এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। জ্যোতির্বিজ্ঞানী উর্টের মতে সৌরজগতের শেষপ্রান্তে সূর্য দেহ থেকে উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থ- যারা গ্রহ উপগ্রহ উৎপন্ন হওয়ার পর অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল তারাই জমাট বেঁধে কোটি কোটি শীতল পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। এই পিণ্ডগুলো সৌর জগতের শেষপ্রান্তে চারদিকে একটা আবরণ যেন গড়ে তুলেছে। ঐ পিণ্ডগুলোই এক একটা ধূমকেতু এবং আবরনটির নাম উর্টের মেঘ বা উর্ট ক্লাউড। নামকরণ করা হয়েছে আবিষ্কারক উর্টের নামে।

ধূমকেতুর সংখ্যা তাই অনেক। পথও সবার উপবৃত্তাকার। কেউ কেউ সৌরজগতে ছিটকে এসে প্রবেশ করেছে এবং কোন না কোন গ্রহের আকর্ষণের আওতায় পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। সৌরজগৎ থেকে ছিটকে কেউ কেউ বেরিয়েও যায়। এদিক থেকে ওরা একরকম স্বেচ্ছাচারী।

ধূমকেতু সম্বন্ধে এখনও মানুষের জ্ঞান সীমিত। অনেকের ধারণা, ধূমকেতুর গঠন উপাদানকে বিশ্লেষণ করতে পারলে আমাদের সৌরজগতের সৃষ্টি রহস্যটা উদ্ঘাটিত হতে পারবে। তাই ১৯৮৬ সালে হ্যালির ধূমকেতুকে পৃথিবীর আকাশে দেখা গেলে নানা ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল। তবে সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা কোন আলোকপাত করেননি।

মহাকাশে এক্স রশ্মির সন্ধান

এককালে মহাকাশের নক্ষত্রদের সনাক্ত করার একমাত্র হাতিয়ার ছিল তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে যে আলোক তরঙ্গ ছুটে আসছে তাকেই পর্যবেক্ষণ করা। প্রথম প্রথম খালি চোখেই পর্যবেক্ষণ করা হতো। তারপর দূরবীন আবিস্কৃত হলে কাজটা সহজ হয়।

আলোক তরঙ্গকে পৃথিবীতে আসতে হলে নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়। প্রথমতঃ নক্ষত্র বা নক্ষত্রজগতের ভেতর থেকে আলোক তরঙ্গ নির্গত হওয়ার পর বহু অস্বচ্ছ বস্তু তার পথ অবরোধ করে। দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলের দ্বারা আলোকের কিছু কিছু অংশ বিশোষিত হয় এবং ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক অনেক সময় পৃথিবীপৃষ্ঠ অবধি পেঁছতে পারে না। তাই বেতার তরঙ্গের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হওয়ার পর জ্যোতিষ্ক থেকে আগত বেতার তরঙ্গকে বিশ্লেষণ করা শুরু হয় এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান আরও একধাপ এগিয়ে যায়। আবিষ্কৃত হয় বেতার দূরবীক্ষণ-যন্ত্র। অতি দূর নীহারিকা থেকে আগত বেতার রশ্মিকে পরীক্ষা করার সুবিধে হলো। সেই সঙ্গে ধরা পড়লো কোয়াসার, পালসার প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য জ্যোতিষ্ক।

বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন, নক্ষত্রপৃষ্ঠ থেকে কেবলমাত্র আলোকরশ্মি এবং বেতার রশ্মি নির্গত হয় না। আরও নানাধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মি নির্গত হয়। বেতার রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সব থেকে বড়—এক মিলিমিটার থেকে এক মিটার পর্যন্ত। আলোকরশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৪×১০^{-৫} সেমি থেকে ৭×১০^{-৫} সেমি। এরা দুজনেই পৃথিবীর আবহমণ্ডলকে ভেদ করে ছুটে আসতে পারে। কিন্তু অপরাপর ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মি যথা এক্স রশ্মি, গামা রশ্মি প্রভৃতি যাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিতান্ত কম, তথা $১০^{-৮}$ সেমি থেকে $১০^{-১০}$ সেমি পর্যন্ত তারা সরাসরি পৃথিবীপৃষ্ঠে ছুটে আসতে পারে না। অথচ এদেরও নক্ষত্র পৃষ্ঠ থেকে সবসময় উদ্ভব হচ্ছে এবং তেজও বিকিরণ করছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা হলো, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সঠিকভাবে জানতে হলে এদেরও বিশ্লেষণ করা দরকার।

মহাকাশ থেকে আগত এক্স রশ্মিকে সনাক্ত করার কোন উপায় অবশ্য আগে ছিল না। কারণ, মহাকাশ থেকে আগত এক্স রশ্মিকে পৃথিবীর আবহমণ্ডল বাধা দেয়। পৃথিবীর আয়নমণ্ডলে প্রবেশ করলেই তথাকার আয়নিত বায়ুকণার ইলেকট্রনদের সঙ্গে সংঘর্ষে বিশোষিত হয়ে যায়। (এক্সরের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $১০^{-৮}$ সেমি থেকে $১০^{-৬}$ সেমি বা ১ থেকে ১০০ আংস্ট্রম। যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত ক্ষুদ্র সে তত বেশী শক্তিশালী। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী ৬ আংস্ট্রম

তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক্সরের কাছে সমগ্র নক্ষত্রজগৎটাই স্বচ্ছ। তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১০০ আংস্ট্রমের অধিক না হলে পৃথিবী পৃষ্ঠে অবতরণ করতে পারে না।)

এক্স রশ্মিকে লাভ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে মহাকাশে গিয়ে পর্যবেক্ষণ চালানো। এ কাজটি সম্ভব হলো ১৯৬০ সাল থেকে রকেট ব্যবস্থার উন্নতি হলে। ১৯৬২ সালের ১৮ই জুন প্রথম মহাকাশে এক্সরশ্মি অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করা হয় এয়ারোবী নামে একটি রকেটকে। এটিকে উৎক্ষেপন করা হয়েছিল নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্যান্ডস মিসাইল রেঞ্জ থেকে। সজ্জিত ছিল স্বয়ং চালিত একটি গবেষণাগার এবং এক্সরে সংবেদী তিনটি গাইগার কাউন্টার। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সৌর এক্সরশ্মি চাঁদের পিঠে আছড়ে পড়ায় সেখানে প্রতি-প্রভার সৃষ্টি হয় কিনা—তা নির্ণয় করার জন্য।

রকেটটি পৃথিবীর আবহমণ্ডলকে ভেদ করে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উর্ধ্বে আরোহণ করেছিল। ব্যাপারটা কিন্তু ঘটেছিল অন্যরকম। ৮০ কিলোমিটার উর্ধ্বে মাত্র ৬ মিনিট সময় কালের মধ্যে গবেষণাগারের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে ধরা পড়লো একটি শক্তিশালী এক্স রশ্মির উৎস এবং আরও কয়েকটা ক্ষীণ উৎস। পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, শক্তিশালী এক্স রশ্মির উৎসটি অতি দূরের বৃশ্চিক নামক নক্ষত্রপুঞ্জের।

ঐ বছর অক্টোবর মাসে পুনরায় আর একটি রকেট পাঠানো হয় এবং পরের বছর আরও একটা। প্রতিবারেই ধরা পড়লো একাধিক এক্স রশ্মির উৎস। তখন ১৯৬৪ সালে অধিক সংখ্যক এক্স রশ্মির উৎস লাভ করার জন্য প্রেরণ করা হলো পাঁচ-পাঁচটি রকেট।

এবার বিজ্ঞানীদের হাতে এলো অসংখ্য এক্স রশ্মির উৎস। ওদের বিশ্লেষণ করে অতি দূরবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জের স্বরূপ উদ্ঘাটন করার কাজও হলো শুরু। সেই থেকে জন্মগ্রহণ করলো এক্সরে জ্যোতির্বিজ্ঞান।

বর্তমানে মহাবিশ্বের এক্স রশ্মি অনুসন্ধানও বিশ্লেষণের নানা ধরণের যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। সোডিয়াম আয়োডাইডের কেলাস, ফটো-ইলেকট্রিক সন্ধানী এবং গ্যাস কাউন্টার একাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শক্তিশালী এবং কম শক্তিসম্পন্ন দু'ধরণের এক্স রশ্মিকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে এদের দ্বারা। যার জন্য আজ ব্ল্যাকহোল, নিউট্রন নক্ষত্র প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে।

মহাকাশে গামা রশ্মির উৎস

মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত গবেষণাকালে বিজ্ঞানীরা গামা রশ্মির সন্ধান লাভ করেছিলেন। লক্ষ্য করেছিলেন, উচ্চশক্তিসম্পন্ন দুটি প্রোটন কণিকার সংঘর্ষে অথবা প্রোটন এবং অ্যান্টি প্রোটনের মিলনে উভয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং শক্তিশালী গামা রশ্মির উদ্ভব হয়। গামা রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য অতি ক্ষুদ্র বলে শক্তি প্রচণ্ড। মহাজাগতিক রশ্মির মত মহাকাশে গামা রশ্মিদের ধরার জন্য প্রচেষ্টাও শুরু হয় সেই থেকে।

প্রথম গামা রশ্মিকে ধরার জন্য তোড়জোড় চলে ১৯৫৭ সালে। একটা বেলুনে স্বয়ংক্রিয় কতকগুলো যন্ত্রপাতি রেখে পাঠানো হয়েছিল আকাশে। কিন্তু এই পরীক্ষা সফল হতে পারে নি। তাই পরবর্তী প্রচেষ্টা শুরু হয়। বিজ্ঞানী টমাস ক্লাইন এবারেও একই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত আর একটা বেলুন। ক্লাইনের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হলো।

রকেট ব্যবস্থা ও মহাকাশযানের উন্নতি হলে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়লো ওদেরই উপর। উইলিয়ম ক্রাউসার এবং জর্জ ক্লার্কের ব্যবস্থাপনায় ১৯৬১ সালে গামারশ্মিকে ধরার জন্য পাঠানো হলো মার্কিন মহাকাশযান এক্সপ্লোরার—১১ কে। গামারশ্মিকে সনাক্ত করতে ওতে স্থাপন করা হয়েছিল চকচকে একটি কাউন্টার চেরেনকভ বিকিরণ যন্ত্র এবং একটি ফোটন বিবর্ধক যন্ত্র।

এক্সপ্লোরার—১১ দীর্ঘ ২৩ দিন ধরে মহাকাশে অনুসন্ধান চালিয়েছিল। কিন্তু পৃথিবীর বিপরীতে মহাকাশের দিক থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিল মাত্র ৯ ঘণ্টা। ঐ ৯ ঘণ্টা সময়ের ভেতরেই সে লাভ করেছিল ২২ বার গামারশ্মির সঙ্কেত।

এই প্রথম গামারশ্মিকে লাভ করে ক্রাউসার এবং ক্লার্কের উৎসাহ বেড়ে গেল। আরও দু-দুবার মহাকাশযানের সাহায্যে তাঁরা পর্যবেক্ষণ চালালেন। এবং প্রতিবারেই লাভ করলেন কিছু না কিছু গামা রশ্মির উৎস। সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে কিছু কিছু নতুন তথ্য লাভ করলেন। এবার সোভিয়েত বিজ্ঞানীরাও উঠে পড়ে লেগে গেলেন গামারশ্মিকে সনাক্ত করতে। তাঁরা প্রেরণ করলেন কসমস—২০৮ নামক কৃত্রিম উপগ্রহটিকে।

এত পরীক্ষা নিরীক্ষা সত্ত্বেও গামারশ্মি সংক্রান্ত গবেষণা খুব বেশী অগ্রসর হতে পারেনি। মাত্র গুটিকয়েক গামারশ্মির উৎসকে সনাক্ত করতে পেরেছিলেন। তাতে তাঁরা বুঝতে পারলেন বেশ কয়েকটি উপায়ে মহাকাশে গামারশ্মির উদ্ভব হচ্ছে। তাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো—

(১) ব্যস্ত কম্পটন বিক্ষেপের ফলে

(২) উষ্ণ ব্রেম ন স্ট্রা হ লুং পদ্ধতিতে

(৩) প্রোটন প্রোটন সংঘর্ষ থেকে

(৪) পজিট্রন ও ইলেকট্রনের মিলনের ফলে এবং

(৫) প্রোটন ও অ্যান্টিপ্রোটনের মিলনের ফলে।

প্রথম দুটি প্রক্রিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুই প্রক্রিয়ায় এক্সরশ্মিরও উদ্ভব হয়। ব্যস্ত কম্পটন বিক্ষেপ প্রক্রিয়াটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে বিজ্ঞানী আর্থার কম্পটনের নামানুসারে। কম্পটনই প্রমাণ করেছিলেন, পরমাণু ইলেকট্রনের সঙ্গে এক্সরশ্মির ফোটনের সংঘর্ষ বাধলে হয় ফোটন কণা, তার কিছু শক্তি ইলেকট্রনকে দান করে নিজে অল্প শক্তির ফোটন কণায় পরিণত হবে নতুবা ইলেকট্রনের শক্তিকে আত্মসাৎ করে নিজে উচ্চশক্তিসম্পন্ন ফোটন কণায় পরিণত হবে। ফলে উৎপন্ন হবে এক্সরশ্মি সহ গামারশ্মি।

দ্বিতীয় ব্রেম স্ট্রা হু লুং পদ্ধতি অনুযায়ী অতি উচ্চ গতিবেগ সম্পন্ন ইলেকট্রন কণিকা প্রোটন কণিকায় সন্নিকটবর্তী হয়ে পড়লে যে জোরালো বৈদ্যুতিক আকর্ষণ ঘটে তাতে ইলেকট্রনের পথ বেঁকে যায় এবং শক্তির ক্ষয় হয়। এই-শক্তিক্ষয় প্রকাশ পায় বিকিরণের মাধ্যমে এবং যে বিকিরণ এক্স রশ্মি এবং গামারশ্মি।

তৃতীয় প্রোটন প্রোটন সংঘর্ষে পাইমেসনের উদ্ভব ঘটে। জাপানের প্রখ্যাত নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী য়ুকাউয়ারের মতে সংঘর্ষের ফলে একটা প্রোটন ভেঙ্গে পড়ে এবং অপরটি পরিণত হয় নিস্তড়িৎ পাইমেসনে। এই পাইমেসন অত্যন্ত স্বল্পায়ু এবং এর আয়ুষ্কাল মাত্র $১০^{-১৬}$ সেকেণ্ড। আর এরই ফলে উৎপন্ন হয় গামারশ্মি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, নক্ষত্রজগতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রোটন প্রোটন সংঘর্ষেই গামারশ্মির উদ্ভব হয়ে থাকে।

গামারশ্মি সংক্রান্ত বহু তথ্য এখনও অজ্ঞাত। আগামী দিনের বিজ্ঞানীরাই ওর অবগুণ্ঠন মোচন করতে পারবেন।

নক্ষত্রজগতের আয়তন

মানুষের কাছে প্রথম বিশ্বদর্শন ঘটে আলোকের মাধ্যমে। পরে দূরবীনের উন্নতি হলে বিজ্ঞানীরা আকাশের এখানে ওখানে লক্ষ্য করেছিলেন টুকরো টুকরো মেঘের মত জিনিস। নাম রেখেছিলেন নীহারিকা। যেন সাদা সাদা জলীয় বাষ্প একজায়গায় ঘনীভূত হয়ে আছে। নীহার বলতে জলীয় বাষ্পকে বোঝায় বলে ওদের নীহারিকা নাম।

নীহারিকার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন ১৯২৫ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাবল এবং তার সহযোগী হুমাসন। তাঁরা উল্লেখ করেন, নীহারিকারা আসলে অতি দূরের এক একটি নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সি। ওখানকার বাসিন্দা হচ্ছে কোটি কোটি নক্ষত্র। তারা নানাশ্রেণীর। কোন কোনটিতে নক্ষত্র সৃষ্টি অব্যাহত আছে, কোন কোনটিতে গ্যাসপুঞ্জের অবশেষ বেশী না থাকায় নক্ষত্র সৃষ্টি হচ্ছে না। আবার কোন কোনটিতে যে গ্যাস উদ্বৃত্ত আছে তা থেকে ভবিষ্যতে অল্পসংখ্যক নক্ষত্র সৃষ্টি হলেও হতে পারে। নানা আকারের ওরা। কোনটি বর্তুলাকার, কোনটি সর্পিলাকার, কোনটি বেলনাকার ইত্যাদি।

অতি দূর নিহারিকা থেকে হোক, অথবা আমাদের সূর্য যে গ্যালাক্সীতে অবস্থান করছে সেই গ্যালাক্সী থেকেই হোক, সব জায়গা থেকে কেবলমাত্র আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হছে না—এই তথ্য বিংশ শতাব্দীর। বেতাররশ্মি, এক্সরশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি, অবলোহিত রশ্মি, গামারশ্মি প্রভৃতি হরেক রকমের অদৃশ্য রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা হলো, কেবলমাত্র আলোর মাধ্যমে বিশ্বরূপ দর্শন সম্ভব নয়। নক্ষত্রগুলোর প্রকৃত আকার, আয়তন ইত্যাদি জানতে হলে অদৃশ্য বিকিরণগুলোকেই পরীক্ষা করতে হবে।

একটা উদাহরণ উদ্ধৃত করলেই মনে হয় ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ধরা যাক একটা লোহার দণ্ডকে নেওয়া হলো যার এক অংশ পাতলা এবং অপর অংশ বেজায় পুরু। দণ্ডটাকে খুব করে আগুনে পোড়ানো হলো। একসময় দেখা গেল গোটা দণ্ডটাই টকটকে লাল হয়ে উঠেছে।

এবার আগুন থেকে দণ্ডটা সরিয়ে দিয়ে একটা অন্ধকার ঘরে রাখা হলো। প্রথম প্রথম দেখা যাবে সারা দণ্ডটা থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে লাল আলোর রশ্মি। কিছুক্ষণ পরে আবার দেখা যাবে কেবলমাত্র পুরু অংশটি থেকে লাল আলো বিকীর্ণ হচ্ছে। এই অবস্থায় দূর থেকে দণ্ডটিকে লক্ষ্য করলে দণ্ডের দৈর্ঘ্য আসল দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট মনে হবে।

অনুরূপ অবস্থায় যে অংশ থেকে লাল আলো বিকীর্ণ হচ্ছে না সেটি যে শীতল হয়ে গেছে এমন নয়। লাল রশ্মি নির্গত না হলেও অদৃশ্য তাপশক্তি নির্গত হছে। কিন্তু সেই তাপশক্তি বাহিত হচ্ছে অবলোহিত রশ্মির আকারে। রশ্মিটি চোখে দৃশ্যমান না হলেও যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়ে এবং সেই যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্য করলে পুরো দণ্ডটাই ভেসে উঠবে।

অবলোহিত রশ্মি যে যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়ে তার নাম "ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ" বা অবলোহিত আলোক দূরবীন। ১৯৭০ সালে মার্কিন বিজ্ঞানীরা একটি কৃত্রিম উপগ্রহের স্বয়ংক্রিয় গবেষণাগারে ইনফ্রারেড টেলিস্কোপকে পাঠিয়ে-ছিলেন নক্ষত্র বা নক্ষত্র জগতের প্রকৃত আয়তনটা জানার জন্য।

উপগ্রহটি ফিরে আসার পর সেই দূরবীনের সাহায্যে তোলা ছবি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। আন্দাজ যা করেছিলেন, তা সত্যে পরিণত হয়েছে বটে, কিন্তু এতটা বিশাল আশা করতে পারেননি।

শুধু একবার নয়, এর পরে আরও কয়েকবার অনুরূপ পরীক্ষা চালিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। প্রতিবারেই লাভ করেছিলেন সেই একই তথ্য। অর্থাৎ আলোককে নিয়ে পরীক্ষা করলে যে আয়তন পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী ওদের আয়তন। সেই থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, কোন নক্ষত্র কিংবা কোন গ্যালাক্সি তার আলোকিত অংশের বাহিরে একটা মস্ত বড় জায়গা অধিকার করে আছে। সেখান থেকে বিকীর্ণ আলোকের মাধ্যমে যে আয়তন নির্ণয় করে এসেছেন তা ভুল। প্রকৃত আয়তন অনেক-অনেক বেশী।

রাতের আকাশ কেন এত আঁধার

রাতের আকাশ এত আঁধার কেন? প্রশ্নটি প্রথম তুলেছিলেন এডমাণ্ড হ্যালি—নিউটনের সমসাময়িক সেই বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। প্রশ্নটি সেদিন অনেকের কাছে উদ্ভট বলে মনে হয়েছিল এবং আজকে এ প্রশ্নকে সম্পূর্ণ অবান্তর বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্নটার পেছনে যে কোন যুক্তি ছিল না, একথা বলতে পারা যায় না এবং লাল সরণের বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যাপারটা একটু উত্থাপনও করা হয়েছে।

হ্যালির এ প্রশ্নটিকে সেকালে খতিয়ে দেখেছিলেন ওলবার্গ নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি প্রশ্নটাকে বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং বেশ কয়েকটা তথ্যও উত্থাপন করেছিলেন। প্রশ্নটাকে সাজিয়েছিলেন এইভাবে—

রাতের আকাশে সূর্য থাকে না সত্য, কিন্তু তার চেয়েও সহস্র সহস্র গুণে বড় কোটি কোটি তারা রয়েছে। আর রয়েছে সংখ্যাতীত ছোট ও মাঝারি নক্ষত্র। সারা আকাশটা যেন ছোট ছোট আলোর চাকতি দিয়ে ঢাকা। তারা দূরে দূরে অবস্থান করছে ঠিকই, কিন্তু সহস্র সহস্র কোটি নক্ষত্রের মৃদু আলো সম্মিলিত ভাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠে এসে পড়ছে, আকাশের সূর্য তো অতি সাধারণ একটি তারা মাত্র। আর দূরত্ব? নক্ষত্রের উপরিভাগের ঔজ্জ্বল্য তো তাদের দূরত্বের উপর নির্ভরশীল নয়। তাহলে?

বহুকাল ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রশ্নটি ওলবার্সের কূটাভাস নামে পরিচিত ছিল। এরকম বিংশশতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সযত্নে লালন করেছিলেন প্রশ্নটিকে। ১৯২৫ সালেই সমাধানের একটি পথ খুঁজে পান। সেই সমাধানটি এলো হাবলের গবেষণা থেকে। হাবল উল্লেখ করলেন বিশ্ব সম্প্রসারণ হচ্ছে। বিশ্বের নক্ষত্র, নক্ষত্রজগৎ, নীহারিকা ইত্যাদি সৃষ্টির লগ্ন থেকে যদি একইভাবে একই জায়গায় অচলভাবে অবস্থান করতো, তাহলে হয়ত

রাত্রির আকাশ এত অন্ধকার হতোনা। যেহেতু ওরা ক্রমশঃ দূরে দূরে সরে যাচ্ছে এবং প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে, অতি দূরে যারা রয়েছে তাদের অপসরণ-বেগ আলোর গতিবেগের সমান।

অতএব আকাশের সমূহ জ্যোতিষ্ক থেকে নির্গত আলোকের অংশ একই সময়ে পৃথিবীতে এসে পড়তে পারছে না। অতি দূরের নক্ষত্রমণ্ডলী থেকে এখনও আলো এসে পেঁছতে পারেনি।

আবার বিজ্ঞানীদের হাতে এলো ডপলার তত্ত্ব। সমাধানের দ্বিতীয় ধাপ। ডপলার তত্ত্ব প্রয়োগ করে এবং বর্ণালী পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, নক্ষত্রের মধ্যে ঘটছে লাল সরণ। তাদের আলোকের বর্ণগুলোকে বদল হতে হচ্ছে অপসরণ বেগের জন্য। যার ফলে মহাবিশ্বে এত আলো থাকা সত্ত্বেও আমরা তাদের পাচ্ছি না।

শুধু আলোক নয়, অপরাপর সব রশ্মির বিকিরণের ক্ষেত্রেও প্রশ্নটি প্রযোজ্য। বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেতার রশ্মি থেকে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের গামা রশ্মি পর্যন্ত সবারই ঘটছে বিকিরণ। মহাকাশ যেন সেই বিকিরণে পরিপূর্ণ। অথচ পৃথিবী এসব বিকিরণ থেকে অনেকাংশেই মুক্ত।

পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের জন্মরহস্য

সভ্যতার আদি পর্ব থেকে মানুষ পৃথিবীর কথা ভেবে এসেছে। এই যে সুন্দর পৃথিবী—এর গিরি, নদী, বন, উপবন, দিকে দিকে এমন রূপের পসরা, এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ জীব ও উদ্ভিদ জগৎ, চিরকালই কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী সবাইকে চিন্তার খোরাক সরবরাহ করে এসেছে! তবে সেকালে বিজ্ঞানচিন্তা ছিল দার্শনিক চিন্তার নামান্তর। তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দার্শনিক পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মনগড়া কাহিনীকেই খাড়া করেছিলেন। সে কাহিনীগুলো আজও নানা দেশের নানা ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায়। বলা বাহুল্য সর্বক্ষেত্রেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে।

পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক মতবাদ খাড়া করা হয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। না, ঠিক হলো না। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সব মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল সেগুলোকে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মতবাদ বলা যাবে না। সেগুলোও দার্শনিক মতবাদ ছিল। তবে সেই মতবাদের ভেতরে কিছুটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল এবং ঈশ্বরের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি—এই মাত্র।

আর যাঁরা এই মতবাদগুলোকে খাড়া করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জোহান কেপলার এবং ইম্যানুয়েল কাণ্ট অন্যতম।

কাণ্টের মতবাদকে এককালে কিন্তু সবাই মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর মতবাদটি প্রচারিত হয়েছিল ১৭৫৫ সালে। কাণ্টের মতে মহাশূন্যে ভাসমান ধূলিকণা ও মেঘপুঞ্জ থেকে সূর্য-সহ অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি। আদিতে ঐ ধূলিকণা ও মেঘপুঞ্জ মহাশূন্যে ইতঃস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে প্রাকৃতিক কারণে ঘনীভূত ও একমুখী হয়েছিল। অতঃপর ঘনীভূত মেঘপুঞ্জটি বৃহত্তম এক গোলকের আকার প্রাপ্ত হয়। পরে সেই গোলক থেকে মালার মত ছোট বড় গোলক বিচ্ছিন্ন হয় এবং সেইগুলো থেকে এক একটি গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি হয়।

কাণ্ট কিন্তু মহাশূন্যে ধূলিকণা ও মেঘপুঞ্জের উৎস সম্বন্ধে কিছুটি বলেন নি। তাই বিজ্ঞানীরা ঐ মতবাদকে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেন এবং নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করেন। প্রচারিতও হয় একাধিক মতবাদ। কাণ্টের সমসাময়িক ফরাসী বিজ্ঞানী বুফোঁ কাণ্টের মতবাদের কিছু অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রচার করেন, সূর্য থেকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে ঠিকই, তবে ধূলিকণা ও মেঘপুঞ্জ থেকে নয়। সূর্যের পাশ দিয়ে সূর্যের প্রায় সমান ভরের একটি ধূমকেতু এককালে সূর্যের পাশ দিয়ে ছুটে চলে যায়। তার ফলে সূর্য দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল ছোট বড় কতকগুলো বস্তুপিণ্ড। সেই বস্তুপিণ্ড গুলোই কালক্রমে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহদের রূপ নিয়েছে।

১৭৯৬ সালে লা প্লাস নামে আর একজন বিজ্ঞানী কাণ্টের মতবাদকে একটু অন্যভাবে উপস্থাপিত করেন। তিনি কাণ্ট বর্ণিত ধূলিকণা ও মেঘপুঞ্জের কথাটা বাদ দিয়ে প্রথম থেকে গতিশীল এক ঘন মেঘপুঞ্জের কল্পনা করেন। তাঁর মতে ঘূর্ণমান এক নীহারিকা থেকেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহদের জন্ম হয়েছে!

লা প্লাসের মতবাদকে দীর্ঘকাল বিজ্ঞানীরা মেনে এসেছিলেন। কিন্তু ত্রুটি এতেও ধরা পড়লো। তাই ১৯০০ সালে চেম্বারলেন এবং মুলটন নামে দুজন বিজ্ঞানী "গ্রহাণুপুঞ্জ মতবাদ" নামে একটি মতবাদ প্রচার করেন। সেই মতবাদ অনুযায়ী সুদূর অতীতে সূর্য অপেক্ষা আয়তনে বড় কোন একটি ভ্রাম্যমান নক্ষত্র সূর্যের পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় সূর্য দেহ থেকে কয়েক টুকরা বস্তুপিণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়। সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে নক্ষত্রটি নিয়ে যেতে পারে নি। তারা সূর্যের আকর্ষণের আওতায় থেকে যায়। কালক্রমে সেই খণ্ড গুলো শীতল হয়ে এক একটি গ্রহের রূপ গ্রহণ করে।

প্রথম প্রথম মতবাদটিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন বহু বিজ্ঞানী। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হ্যারল্ড উইলসন এবং জীনস। কিন্তু পরের দিকে এরা দুজনেই বিরোধিতা করলেন। এঁদের মতে বিশ্বজগৎ নিয়মে বাঁধা। স্বেচ্ছাচারীর মত কোন নক্ষত্র হুট করে ছুটে আসতে পারে না. বা খেয়াল খুশি মত চলে যেতেও পারে না। প্রত্যেককেই কোন না কোন কেন্দ্রীয় বস্তুর চারদিকে পাক

খেয়ে খেয়ে ঘুরতে হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ যদি এইভাবে বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলো থেকে সব গ্রহ জন্মলাভ করতো তাহলে প্রত্যেকের গঠন উপাদান একই হতো। কিন্তু তা তো হয়নি!

পরবর্তী মতবাদ প্রচারিত হয় ১৯৫৩ সালে। প্রবক্তা কার্লফন উইৎসেকার এবং তাঁর দুই সহযোগী য়ুরে ও কুইপার। মতবাদটি উল্কা মতবাদরূপে গৃহীত হয়েছে।

উইৎসেকারের মতে যে সুবৃহৎ গ্যাস ও ধূলির মেঘ থেকে সূর্যের জন্ম হয়েছিল, সেই মেঘের বহু দূরবর্তী অঞ্চলে কিছু কিছু গ্যাস ও ধূলিকণা অবশিষ্ট ছিল। সেগুলো সূর্যের জন্মলাভের পর ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে মহাকাশে বিলীন হয়ে যেতে পারেনি। সূর্যের আকর্ষণের আওতায় থেকে যায় এবং মহাকাশের নিয়ম অনুযায়ী আপন আপন উপবৃত্তাকার পথে সূর্য প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এরা ছিল অসংখ্য এবং অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। পরিক্রমা করতে শুরু করলে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খায়। এর ফলে ছোটরা ক্রমশঃ জোড়া লেগে বাড়তে থাকে। আরও বড় হয়ে উঠলে তাদের মধ্যে প্রকাশ পায় আকর্ষণ বল। আকর্ষণ বল লাভ করার ফলে তাদের কলেবরগুলো ক্রমান্বয়ে বাড়তে শুরু করে। বড় বস্তুপিণ্ডে যারা পরিণত হলো তারা বহুদূর পর্যন্ত শোষণ চালালো। ফলে পিণ্ডগুলো কালক্রমে এক একটা বিরাট আয়তন লাভ করলো। শেষপর্যন্ত মাত্র কয়েকটিই টিকে যায় এবং তারাই রূপ নেয় এক একটি গ্রহ ও উপগ্রহের। তারা অতি দূরে অবস্থান করার জন্য পরস্পরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারলো না। নিজ অক্ষের উপর আবর্তন করতে করতে সূর্য-পরিক্রমা করতে লাগলো।

ছোট বড় উল্কারা যেমন গ্রহের দিকে প্রবলবেগে ছুটে আসে, তেমনই আদিম কণিকাগুলো পরস্পর পরস্পরের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল এবং বৃহৎ বস্তু পিণ্ডের রূপ নিয়েছিল বলে এই মতবাদটিকে উল্কা মতবাদ বলা হয়।

উল্কা মতবাদের ত্রুটি ধরলেন ফ্রেড হয়েল প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বললেন (১) বৃহৎ বৃহৎ বস্তুপিণ্ডে পরিণত হলো, কিন্তু দ্রুত আবর্তন সত্ত্বেও ভেঙ্গে পড়লো না কেন?

(২) পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে, গ্রহদের সৃষ্টির পর মন্থর হয়েছে সূর্যের আবর্তন বেগ। কিন্তু এভাবে গ্রহদের জন্ম হলে সূর্যের আবর্তনবেক মন্থর হওয়ায় কথা নয়।

(৩) উক্ত মতবাদ যদি সত্য হতো, তাহলে সব গ্রহ ও উপগ্রহের উপাদান সমান হতো।

উপরোক্ত ত্রুটিগুলো লক্ষ্য করে ফ্রেড হয়েলরা আর এক মতবাদ প্রচার করেন। সেই মতবাদটিকে বলা হয় বলয় মতবাদ।

বলয় মতবাদ অনুযায়ী এক সুবিশাল গ্যাসীয় স্তূপ থেকে সূর্যের জন্ম হয়েছিল। প্রাথমিক অবস্থায় ওর ব্যাস ছিল কয়েক কোটি মাইল। আভ্যন্তরীণ

অস্থিরতার ফলে তার আবর্তন বেগ প্রবল হয় এবং তারই ফলে সে সংকুচিতও হয়। এর ফলে স্তূপটির ঘনত্ব ও তাপমাত্রা দুই-ই অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। তাতে অস্থিরতা আরও বেড়ে উঠে, আবর্তন বেগ হয় তীব্র এবং বর্তুলাকার রূপ প্রাপ্ত হয়।

তীব্র আবর্তনবেগের জন্য সূর্যের মেরুদ্বয় ধীরে ধীরে ভেতরের দিকে ঢুকে পড়ে এবং পৃষ্ঠদেশ স্ফীত হয়ে উঠে। এই স্ফীতির পরিমাণ বাড়তে বাড়তে এমন এক অবস্থায় আসে, যখন সূর্য তার পিঠের বোঝাটাকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। তখনই সূর্যের পৃষ্ঠদেশ থেকে একটি গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জ বলয়ের আকারে বিচ্ছিন্ন হয়।

প্রথম প্রথম সেই বলয়টি সূর্যের আবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শুরু করেছিল। সূর্যও চেষ্টা করেছিল তাকে ধরে রাখতে। ওকে ধরে রাখতে গিয়েই মন্থর হয়েছিল সূর্যের আবর্তন বেগ এবং এই সুযোগে বলয়টি সূর্যের আকর্ষণ বলকে একটু একটু করে ছিন্ন করে দূরে সরে যেতে শুরু করলো। বলয়ের মধ্যে গ্যাসীয় অবস্থায় নানা ধরণের ধাতু, ধাতব অক্সাইড ও সিলিকেট এবং কারবন ছিল এবং এর প্রধান উপাদান ছিল হাইড্রোজেন হিলিয়াম ও নাইট্রোজেন। পরবর্তী উপাদানগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করেছিল কারবন-ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, জলীয় বাষ্প, মিথেন প্রভৃতি।

বলয় যতই দূরে সরে যেতে লাগলো ততই সে তাপ হারাতে শুরু করলো। শীতল হওয়ার প্রাথমিক অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল সেই সব মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ—যারা খুব বেশী তাপমাত্রায় কঠিন কিংবা তরলের আকারে থাকতে পারে। যেমন লোহা প্রভৃতি ধাতু এবং তাদের অক্সাইড ও সিলিকেট। অতঃপর যতদূরে গেছে ততই তাপ হারিয়েছে এবং পর পর ছড়িয়ে গেছে উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের বস্তুকণা থেকে নিম্ন স্ফুটনাঙ্কের বস্তুকণা। হাইড্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস যারা অতিশয় শীতল হলেও সহজে তরলে রূপান্তরিত হয় না, তাদের অধিকাংশ ঘনীভূত হতে পারে নি সূর্যের আবর্তনের আওতা থেকে ওরা কিছু কিছু বেরিয়ে গেছে, কিছু বা ফিরে গেছে সেই সূর্যের দেহেই।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণা জড় হয়ে গ্রহের রূপ নিয়েছে উল্কা মতবাদ অনুযায়ী। বলয়ের মধ্যে উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের বস্তুকণা তথা লোহা প্রভৃতি ধাতু এবং তাদের অক্সাইড ও সিলিকেটগুলো পরিমাণে ছিল কম এবং এইগুলো প্রথমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এরা উল্কা মতবাদ অনুযায়ী একত্রিত হয়ে গঠন করেছে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, পৃথিবী ও মঙ্গলের উপগ্রহগুলো এবং কয়েকটা গ্রহাণু। বুধ ও মঙ্গল দুপাশে অবস্থান করার জন্য অধিক বস্তুকণা সংগ্রহ করতে পারে নি তাই আকারে ওরা ছোট। কিন্তু পৃথিবী ও শুক্র মাঝখানে থাকার জন্য আকর্ষণ বল চালিয়ে চারদিক থেকে বস্তুকণা সংগ্রহ করেছিল। ফলে এদের আয়তন বেশী। বুধ থেকে মঙ্গল পর্যন্ত গ্রহগুলোর প্রধান উপাদান লৌহ শিলা বলে ওদের লৌহ শিলা অঞ্চলের বাসিন্দা বলা হয়।

লৌহশিলা অঞ্চলের পরে নিম্ন স্ফুটনাঙ্কের পদার্থ কণা তথা তেল, জল প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। বলয়ে এদেরই পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশী! তাই ওদের দ্বারা গড়ে উঠেছে সুবৃহৎ দুটি গ্রহ বৃহস্পতি ও শনি এবং তাদের উপগ্রহগুলো। তবে ধাতব পদার্থ ওরা যে আদৌ লাভ করেনি এমন নয়। পেয়েছে খুব কম পরিমাণে।

বৃহস্পতি ও শনির পরে ঘনীভূত হয়েছে মিথেন প্রভৃতি। ওদের দ্বারা গড়ে উঠেছে অবশিষ্ট গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহগুলো।

বর্তমানে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সৃষ্টির ব্যাপারে বলয় মতবাদ এবং উল্কামতবাদ দুটি মতবাদকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ গ্রহণ করা হয়েছে ফ্রেড হয়েলের বলয় মতবাদ এবং উল্কামতবাদের শেষ অংশ—তথা ক্ষুদ্র বস্তুকণা থেকে বৃহৎ বস্তুপিণ্ডের রূপ গ্রহণ। বস্তুপিণ্ডগুলো পুনরায় ভেঙ্গে না যাওয়া বা বস্তুকণাগুলো জড় হওয়ার মূলে কল্পনা করা হয়েছে, সে সময় কিছু কিছু হাইড্রোকারবনও উৎপন্ন হয়েছিল এবং এরাই বস্তুকণাগুলোকে বৃহৎ বস্তুপিণ্ডে পরিণত করতে সাহায্য করেছিল।

পরিশেষে উল্লেখ করতে হয় যে, পৃথিবীর জন্ম সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যত মতবাদ প্রচারিত হয়েছে, তাদের মধ্যে কিছু না কিছু ত্রুটি আছে। সে ত্রুটি গুলোর সঠিক জবাবে আরও বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচারিত হতে পারে। এগুলো সবই মতবাদ মাত্র। আজকের উন্নত গবেষণা চেষ্টা করছে সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটন করতে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সব জিজ্ঞাসার নিরসন ঘটবে। এবং পৃথিবীর জন্ম রহস্যের সঠিক তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হবে।

ভূমিকম্পের কারণ

ভূমিকম্প এমন এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়—যাকে চিরকালই মানুষ ভয় করে এসেছে। তাইতো প্রথম থেকেই মানুষ ওর কারণ খুঁজতে প্রয়াসী হয়েছিল এবং পূর্বাহ্নে জ্ঞাত হওয়ার আবিষ্কার করতে যত্নবান হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই গ্রীক আমল থেকে আজ পর্যন্ত সহস্র সহস্র বিজ্ঞানীর সহস্র সহস্র প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভূমিকম্প রহস্য এখনও অনেকটা অন্ধকারেই ডুবে আছে এবং আগে ভাগে ভূমিকম্পের আভাস দানও আজকের উন্নত বিজ্ঞানের পক্ষেও পুরোপুরি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই ভূমিকম্প এখনও সবার কাছে একটি আতঙ্ক।

আদিতে যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, তথা ঝড়ঝঞ্ঝা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি সব কিছুর মূলে ঈশ্বরের রুদ্ররোষের কল্পনা করা

হয়েছিল। তাই সেকালে পৃথিবীর সবদেশেই রচিত হয়েছিল নানা উপকথা, পৌরাণিক কাহিনী, ইত্যাদি।

ভারতের পুরাণ কাহিনীতে অবশ্য ঈশ্বরের রোষের কথা বর্ণিত হয় নি। উল্লেখ করা হয়েছে, পাতালে বিশালাকায় এক কূর্মের পিঠে নাগরাজ বাসুকি আরোহণ করে আছেন এবং তার সহস্র ফণার একটিতে পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। মাঝে মাঝে সেই ফণাকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য পৃথিবীকে একটি ফণা থেকে সরিয়ে অন্য ফণায় স্থাপন করেন। এই সময়টা পৃথিবী একবার কেঁপে ওঠে এবং তখনই আমরা বলি ভূমিকম্প হয়েছে।

ভারতীয় পুরাণে আরও একটি কাহিনী আছে। পাতালে কূর্মপৃষ্ঠে আরোহণ করে আছে চারটে দিগ্‌হস্তী। দিগ্‌হস্তীরা তাদের চারটে শুঁড় দিয়ে পৃথিবীকে উপরে তুলে ধরেছে। তাদের কারও শুঁড় দুলে উঠলেই ভূমিকম্প হয়।

অন্যান্য দেশের উপকথাগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষের পাপের সমুচিত শাস্তি দানের জন্য ঈশ্বর মাঝে মাঝে ভূমিকম্প ঘটিয়ে থাকেন। কোথাও বলা হয়েছে, স্রষ্টা মাঝে মাঝে পৃথিবীকে নাড়া দিয়ে পরখ করতে চান—তাঁর সৃষ্ট জীবজগৎটা টিকে আছে কিনা। খ্রীষ্টানজগৎ মনে করতেন, ভূমিকম্প ঈশ্বরের কোপানল এবং ইসলাম জগৎ মনে করতেন আল্লার শাস্তি প্রদান। স্বয়ং খোদাতালা পাপে নিমজ্জিত আদ ও সামুদ নামক দুটি জাতিকে ধ্বংস করতে প্রথম ভূমিকম্পের সৃষ্টি করেছিলেন।

প্রথম ভূমিকম্প সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তির উত্থাপন করেছিলেন প্রখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক অ্যারিস্টটল। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, ভূগর্ভের শিলাস্তরে মাঝে মাঝে গ্যাস জমা হয়। ঐ গ্যাস জমতে জমতে যখন আয়তনে বেড়ে ওঠে তখন বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করে এবং ধাক্কা দেয় শিলাস্তরে। যেখানে ধাক্কা দেয় সেইখানে এবং আশে পাশের স্থানগুলোতে ভূমিকম্প হয়।

গ্রীক লুক্রেশিয়াস আর একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, ভূগর্ভে অসংখ্য শিলাস্তর গুহার আকারে বিদ্যমান। স্থান বিশেষে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুণ গুহাগুলো ভেঙ্গে পড়লে ভূমিকম্প হয়।

গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদগুলোতে বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করা হলেও ঠিক ঠিক বিজ্ঞানসম্মত কারণ ছিল না আজকের ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে ভূগর্ভে গুহা লুকিয়ে নেই। তবে লুক্রেশিয়াসের মতটাকে শিলাচ্যুতিজনিত কারণ বলে আখ্যা দিতে পারা যায়।

ভূমিকম্পের কারণ নির্ণয়ে বিজ্ঞানীরা প্রকৃত প্রয়াসী হয়েছেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে। সেই থেকে এ পর্যন্ত অনেকগুলো মতবাদ প্রচারিত হয়েছে। বর্তমানে তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

(১) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত জনিত কারণ,

(২) শিলাচ্যুতি জনিত কারণ, এবং

(৩) ভূ-ত্বকের খণ্ডগুলোর চলন জনিত কারণ বা প্লেট টেকটনিস মতবাদ।

ভূ-কম্পনের কারণগুলোর ভেতরে একটি যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত জনিত কারণ—সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। আগ্নেয়গিরি যখন অগ্ন্যুদগার শুরু করে তখন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। সেই বিস্ফোরণের ফলে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উড়ে যায়। এবং আগ্নেয়গিরি থেকে প্রবল বেগে বেরিয়ে আসে লাভা ও গ্যাসপ্রবাহ। সেই লাভা ও গ্যাস ভূ-স্তরে যে আঘাত হানে তাতেই ভূমিকম্প হয়।

শিলাচ্যুতি জনিত কারণের প্রবক্তা বিজ্ঞানী রিড। ১৯০৬ সালে সানফ্রান্সিসকোতে যে প্রবল ভূমিকম্প হয়েছিল, সেই ভূমিকম্পের পর্যালোচনা করে রিড এই মতবাদটি প্রদান করেন। মতবাদটির নাম ইলাস্টিক রিবাউন্ড থিওরি। এর মূল কথা হলো, ভূ-স্তরে রয়েছে শিলাস্তরের বিন্যাস। কোন একটি শিলাস্তরের দুপাশে কোন কারণে টান পড়লে শিলাস্তরটি বাঁকতে বাঁকতে এক সময় তার স্থিতিস্থাপক সীমা অতিক্রম করে যায়। তখনই ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যায় শিলাস্তরটি। ফলে কোন টুকরা নিচে নেমে যায় এবং কোনটি বা উপরে উঠে আসে। শিলাস্তরে এমন বিপর্যয়ই ভূমিকম্পের কারণ।

তৃতীয় প্লেট টেকটনিস মতবাদের প্রবর্তক বিজ্ঞানী আলফ্রেড ওয়েগনার। ১৯১২ সালে তিনি মহীসঞ্চরণ মতবাদ উত্থাপন করেন। তাঁর মতে পৃথিবীর স্থলভাগটা প্রথমে অখণ্ড ছিল, পরে শুরু হয় ভাঙ্গন। ভাঙ্গনের ফলে স্থলভাগসমূহ সঞ্চরণশীল হয় এবং এখনও সঞ্চরণশীল অবস্থায় আছে।

প্রথম প্রথম ওয়েগনারের মতবাদকে কেউ গুরুত্ব না দিলেও পরবর্তীকালে সাগরগর্ভে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানোর পর মহীসঞ্চরণ মতবাদটিকে বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন। হেস, উইলসন, ভাইন. হোনস্ প্রভৃতি আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানীরা মহীসঞ্চরণের ক্ষেত্রে আরোপ করেছেন প্লেট টেকটনিস মতবাদ। ঐ তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীর স্থলভাগ এবং সাগর তলায় মোট দুটো ভূ-ত্বক মিলেই পৃথিবীর বাহিরের ত্বক লিথোস্ফিয়ার। বাহিরের ত্বকটা প্রায় সাত আটটি অতি বৃহদাকার প্লেট বা পাতে বিভক্ত। পাতগুলো তলার অপেক্ষাকৃত নরম স্তর তথা "অ্যাসথেনোস্ফিয়ার" এর উপর দিয়ে অতি মন্থর গতিতে চলমান অবস্থায় আছে। চলতে চলতে যখন একটির সঙ্গে আর একটির সংঘর্ষ ঘটে অথবা একটা পাত অপর একটা পাতকে স্পর্শ করে তখনই ভূমিকম্প হয়।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ প্রদান এখনও কিন্তু সম্ভব হয়নি। অথচ এই চেষ্টায় সঙ্গে যুক্ত আছেন পৃথিবীর প্রায় সবদেশের বিজ্ঞানী। কিছু কিছু তথ্য তাঁরা উদ্ঘাটন করেছেন সত্য, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তাঁদের দেওয়া পূর্বাভাষ ঠিক ঠিক মিলে যায়নি। এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। অপরদিকে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, ভূমিকম্পের আগে গবাদি পশু, পিঁপড়ে প্রভৃতিরা কেমন যেন টের পেয়ে যায়। তাদের এটা যেন একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা। বিজ্ঞানীরা তাদের সেই স্বাভাবিক ক্ষমতাটা যে কী, সে বিষয়েও গবেষণা করছেন।

পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডল

পৃথিবীকে ঘিরে বায়ুর যে একটা আবরণ আছে—এই সত্যটি বহুকাল আগে মানুষের কাছে ধরা পড়েছিল। তবে পৃথিবীর উপরের দিকে বায়ুর অবস্থা যে কেমন—এ সম্বন্ধে কারও ধারণা ছিল না। এমনকি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতেও মানুষ ভাবতো, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে বায়ু যেমন বিরাজ করছে, উপরের দিকেও ঠিক তেমনটি। বায়ুকে তখনও মৌলিক পদার্থ রূপে গণ্য করতো সবাই। তাই উপরের দিকে যে কিছুটা তারতম্য আসতে পারে—এ ধারণা কারও মাথায় আসেনি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষ আকাশে ওড়ার পরিকল্পনাকে জোরদার করেছিল। এই উদ্দেশ্যে নানাজনে নানা ধরণের বেলুন বানিয়েছিল। বেলুনে চেপে অনেকে উপরে উঠেছিলেন এবং মজাও পেয়েছিলেন। তবে মানুষ অল্পে সন্তুষ্ট নয় কিনা! তাই চাইলো আরও—আরও উপরে উঠতে। বেলুন ওড়াবার পরে সবাই তখন প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলেন—কে কতটা উপরে উঠতে পারেন। অপরদিকে অজানাকে জানার কৌতূহলও মানুষের প্রতিটি রক্ত-বিন্দুতে। তাই ঊর্ধ্বাকাশের খবর সংগ্রহ করার জন্যও অনেকে সচেষ্ট হলেন এবং কোন কোন বিজ্ঞান সংস্থা তৈরী করলেন নানা ধরনের বেলুন।

ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণের আনন্দ উপভোগ এবং সেই সঙ্গে উপরের খবর সংগ্রহ করার জন্য ১৮৬২ সালে বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভ্যান্সমেণ্ট অব্ সায়েন্সের পক্ষ থেকে কক্সওয়েল এবং গ্লেসিয়ার নামক দুজন বেলুন নির্মাতা বেলুনে চেপেই উঠলেন আকাশে। এই প্রথম তাঁরা ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬ মাইল উপরে উঠতে সমর্থ হলেন। কিন্তু এ কী! হঠাৎ অস্বস্তি হলো কেন? কেন শ্বাস গ্রহণ করতে কষ্ট হচ্ছে, কেনই বা দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে? না, একজনের না, দুজনেরই।

হাইড্রোজেন গ্যাসে ভরা বেলুনটি তখনও উপরে উঠতে আছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে অস্বস্তি। অগত্যা অধিক উচ্চে আরোহন করা যুক্তি সঙ্গত মনে না করে ছিপি খুলে গ্যাসকে বার করে দিতে গেলেন। কিন্তু সেখানেও দেখা গেল বিপদ। হাজার টানাটানি সত্ত্বেও ছিপি খুললো না। যত টানতে গেলেন ততই ছিপিটা যেন ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলো। একেবারে অনড়।

দেখতে দেখতে দুজনের একজন মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। অপরজনে তখনও বাঁচার চেষ্টা সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছেন ছিপিটাকে, আর প্রাণপনে টান দিচ্ছেন।

কপাল ভাল, ছিপিটা এক সময় খুলে গেল। গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে বেলুনটাও নিচে নামতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা স্বস্তি পেলেন এবং সে যাত্রা উভয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেন।

কক্সওয়েল এবং গ্লেসিয়ার উভয়েই আপন আপন অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করলেন। এই প্রথম মানুষ বুঝতে পারলো, পৃথিবীর উপরিভাগের বায়ুমণ্ডলটা মানুষের পক্ষে নিরাপদ নয়। অপরদিকে কক্সওয়েলদের কথার সত্যতা যাচাই করার জন্যও চিন্তা ভাবনা শুরু হলো।

চিন্তাভাবনা করতে করতেই বেশ কিছুকাল কেটে গেল। বেলুন তো ওড়াবেনই, কিন্তু কী নিয়ে উঠবেন আকাশে! যদি ওঁদের কথা সত্য হয়!

ততদিনে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বিজ্ঞানীদের হাতে এসে গেছে। ১৮৯৮ সালে টি. ভি বোর্ট নামে একজন ভূ-তত্ত্ববিদ নিজে বেলুনে না চেপে কতকগুলো যন্ত্রপাতি বেলুনে রেখে দিয়ে বেলুনটিকে পাঠালেন আকাশে। যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে উষ্ণতা মাপক যন্ত্রই ছিল প্রধান। উপরের দিকে তাপমাত্রা নির্ণয় করাই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য। এবং উদ্দেশ্য সফলও হলো তাঁর। যন্ত্রে ধরা পড়লো, উপরের দিকে বায়ুর তাপমাত্রা ক্রমশঃ কম। সাত মাইল উর্ধ্বে উষ্ণতা স্থির।

বোর্টের কথা প্রচারিত হলো। কিন্তু কেউ সহজে মেনে নিতে পারলেন না বোর্টের কথাকে। তার ফলে বহুজনে বহু পরীক্ষার আয়োজন করলেন। বেশ কয়েকটা বেলুনকেও পাঠানো হলো। অবশেষে কোর্টের পরীক্ষার সত্যতা যাচাই হলো। সেই সঙ্গে উপরের বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে নতুন নতুন সংবাদও সংগৃহীত হলো। জানা গেল, উপরের দিকে অক্সিজেনের পরিমাণ ক্রমশঃ কম। তাই সাথে অক্সিজেন বহন না করলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা পড়তে হবে।

উর্ধ্বাকাশের বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে আরও অধিক খবর সংগ্রহের জন্য ১৯৩১ সালের ২৭শে মে পিকার্ড এবং কিপফার নামে দুজন বেলুন নির্মাতা ও বিজ্ঞানী অক্সিজেন গ্যাসের মুখোস নিয়ে সেই বেলুনে চেপেই প্রায় ১০ মাইল উর্দ্ধে আরোহণ করেছিলেন। সেখানে গিয়ে এক ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হন তারা। নামবার উপক্রম করবেন এমন সময় দেখলেন, বেলুনের গ্যাস বার করে দেওয়ার একমাত্র ছিপিটার সঙ্গে বেলুনের কতকগুলো দড়ি একেবারে জট পাকিয়ে গেছে। দড়ির জট না খুললে ছিপি খুলে গ্যাস বার করে দেওয়া যাবে না বলে তাঁরা উভয়েই দাঁড়র জট খুলতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু পারলেন না, যতই খুলতে গেলেন ততই যেন বেশী করে জট পাকাতে শুরু করলো। অবশেষে একেবারে মরিয়া হয়েই তাঁরা প্রচেষ্টা চালালেন। না, কিছুতেই কিছু হলোনা।

পিকার্ডরা এবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে বসে রইলেন চুপচাপ। সূর্য-এক সময় অস্ত গেল। কিন্তু একী! সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে উঠতেই দড়ির জট আপনা হতে খুলে গেল। তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছিপির দিকে হাত বাড়ালেন এবং অতি সহজেই খুলে ফেললেন ছিপিকে।

বুঝতে পারলেন, আকাশে সূর্য থাকায় গরমের জন্যই বেলুনের গ্যাস প্রসারিত হয়েছিল এবং বেলুন ফেঁপে ওঠায় দড়িগুলো শক্তভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। সূর্য অস্ত যাওয়ায় ঠাণ্ডা পেয়ে গ্যাস সংকুচিত হয়েছে এবং আপনিই খুলে গেছে জটটা।

পিকার্ড ও কিপ্‌ফারের অভিজ্ঞতার কথা শুনলেন সবাই। বেলুন ব্যবস্থাকে তখন আরও জোরদার করা হলো—যাতে উপরে উঠলে এই ধরণের বিপত্তি না ঘটে। বিশেষ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে এক বিশেষ ধরণের বেলুনে চেপে কয়েকজন বিজ্ঞানী আবার উঠলেন আকাশে। সম্ভবতঃ দশ মাইলেরও ঊর্ধ্বে আরোহণ করেছিলেন তাঁরা। দুঃখের বিষয় জীবদ্দশায় কেউ ফিরে আসেননি।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে দুই মার্কিন অভিযাত্রী এনডারসন এবং স্টিভেনসন বেলুনে চেপে আবার উঠলেন আকাশে। ততদিনে বেতারের উন্নতি হওয়ায় তাঁরা বেতার প্রেরক যন্ত্রকে সঙ্গে করেছিলেন। প্রায় ১৩ মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত তারা এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং আপন আপন অভিজ্ঞতা প্রেরণ করেছিলেন বেতার বার্তার মাধ্যমে। সেখান থেকে পৃথিবীর ফটোও তাঁরা তুলেছিলেন। সেই প্রথম ফটোতে মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল পৃথিবীর গোলাকার অবয়বটা।

এঁদের পরেও বহুজনে বেলুনে চেপে আকাশে উঠেছিলেন। তবে বায়ুমণ্ডল সংক্রান্ত সমূহ জিজ্ঞাসার নিরসন ঘটে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে। রকেট ও মহাকাশযানের উন্নতির ফলে।

১৯৫৭ সালেই রকেটের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের খবর সংগ্রহেরর জন্য একটা সংস্থা গঠন করা হয়েছিল। এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে রকেট উৎক্ষেপনের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতবর্ষও সেদিন উক্ত সংস্থার সঙ্গে সামিল হয়েছিল এবং স্থাপন করেছিল থুম্বার রকেট উৎক্ষেপন কেন্দ্রটি।

দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর বিংশ শতাব্দীর ষাট ও সত্তর দশকে বায়ুমণ্ডলের সম্পূর্ণ রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। বায়ুমণ্ডলকে বিজ্ঞানীরা ভাগ করেছেন প্রধান তিনটি স্তরে—ট্রোপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ও আয়নোস্ফিয়ার নামে। দেখা গেছে, মাটি থেকে মাত্র তিন মাইলের ভেতরেই অবস্থান করছে বায়ুর শতকরা ২৫ ভাগ। উপরের দিকে অক্সিজেনের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমেছে। কমেছে তাপমাত্রাও। সূর্য-রশ্মির প্রতিফলক রূপে ভূ-পৃষ্ঠেই তাপমাত্রা সর্বাধিক। মাত্র তিন মাইল উপরে তাপমাত্রা 0° সেলসিয়াসে নেমে গেছে। প্রায় ৫২ মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকলেও, তার উপরে পুনরায় বাড়তে শুরু করেছে।

প্রথম স্তরটিকে ধরা হয়েছে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৭ মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত, দ্বিতীয়টি ৭ থেকে ৪০ মাইলের মধ্যে এবং তৃতীয়টির বিস্তার ৪০ থেকে প্রায় ২৫০ মাইল পর্যন্ত। সর্বনিম্ন স্তর বিক্ষুব্ধ। তাই বাংলায় বলা হয় ক্ষুব্ধস্তর। ঝড় বৃষ্টি, বজ্রপাত প্রভৃতির উৎপত্তি এই স্তরেই। দ্বিতীয় স্তরটি শান্ত ও সমাহিত। তাই বলা হয় শান্তস্তর। যদিও এখানেও কিছু ক্ষুব্ধতা আছে।

উক্তস্তরের উপরেই রয়েছে পৃথিবীর রক্ষাকবচ, ওজনের স্তর—ছাতার মত ঘিরে রেখেছে পৃথিবীকে। যার জন্য কোন ক্ষতিকর সৌর বিকিরণ পৃথিবীপৃষ্ঠে নামতে পারছে না, সম্ভব হয়েছে উন্নত জীব ও উদ্ভিদবাসের।

তৃতীয় আয়োনোস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডল অতি বিপজ্জনক অঞ্চল। এই অঞ্চলে ছুটে আসছে মহাকাশের যত ক্ষতিকর রশ্মি ও কণিকা। যার প্রভাবে এখানকার বিরল বায়ুকণা সবসময় আয়নিত হয়ে আছে। এই স্তরটি সম্বন্ধে প্রথমে গবেষণা করেছিলেন বিজ্ঞানী গোয়েকল এবং বিজ্ঞানী হেস। আয়নমন্ডলের উপর গবেষণা করে কালজয়ী খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন দুই ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ শিশিরকুমার মিত্র এবং ডঃ মেঘনাদ সাহা।

আগে মনে করা হতো, বায়ুমণ্ডলটা ২৫৮ মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই পর্যন্তই পৃথিবীর সম্পর্ক। পরে দেখা যায়, পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক আরও আরও বহু ঊর্ধ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী জেমস্‌ভ্যান অ্যালেন।

বিজ্ঞানী ভ্যান অ্যালেন কৃত্রিম উপগ্রহ মারফত পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন—বহু ঊর্ধ্বে পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছে দুটি বিস্তৃত চৌম্বকক্ষেত্র। প্রথম ক্ষেত্রটি ১৩০০ মাইল ঊর্ধ্ব থেকে ৩০০০ মাইল ঊর্ধ্ব পর্যন্ত। এখানকার চৌম্বক বলরেখাগুলো সূর্য থেকে আগত সৌরকণাগুলোকে দুই মেরুর দিকে প্রবাহিত করাচ্ছে। এর ফলে মেরুদেশে মেরুজ্যোতি দেখা যায়।

দ্বিতীয় চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা আরও বেশী এবং এটির বিস্তার ঊর্ধ্বাকাশে দশ থেকে বার হাজার মাইল পর্যন্ত। দুটি ক্ষেত্রই যেন বলয়ের মত ঘিরে রেখেছে পৃথিবীকে।

ঘুড়ি

ঘুড়ি! হ্যাঁ, ছোটরা যাদের উড়িয়ে আনন্দ পায়—সেই খেলনা তথা ঘুড়ির কথাই বলা হচ্ছে।

না, কারিগরিটা এমন কিছু নয়। বাঁশের সরু সরু বাখারি চেঁচে তার উপর কাগজ চাপানো হয়। তারপর কারিগর সুতো দিয়ে কলটি বেঁধে দেন। সেই কলের সঙ্গে সুতো বেঁধে দিয়ে উড়িয়ে দিলেই পতপত করে উড়তে থাকে।

একটি সাধারণ খেলনা মাত্র। তবে এর পেছনেও আছে বিজ্ঞানচিন্তা।

আজকের দিনে ঘুড়িটা একমাত্র আনন্দোপকরণ হলে কী হবে, ঐ ঘুড়ি উড়িয়ে কত বিজ্ঞানী কত যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তার সীমা পরিসীমা নেই। অপরদিকে ঘুড়ির কথা উঠলেই বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের কথা মনে পড়ে যায়। যিনি সিল্কের ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎকে মাটিতে নামিয়ে এনেছিলেন।

ঘুড়ির আবিষ্কারটা কিন্তু বহু প্রাচীন কালের ঘটনা। কোন কারিগরের মাথায় ব্যাপারটি এসেছিল তা বলা মুশকিল। তবে অনেকে মনে করেন, এটি গ্রীক প্রযুক্তিবিদ আর্কিটাসের মস্তিষ্ক প্রসূত। খৃষ্টজন্মের প্রায় তিনশ বছর আগে তিনি ঘুড়ি উড়িয়ে আনন্দ পেয়েছিলেন এবং অনেককে আনন্দ দানও করেছিলেন। আবার কারও কারও মতে প্রথমে চীনদেশ ঘুড়ি বানিয়েছিল।

যাইহোক, এর আবিস্কারক যে দেশ হোক না কেন, ঘুড়ি সবার মন জয় করেছিল এবং এখনও করে। তবে প্রাচীনকালে মনে হয় কোন কোন দেশে ওর জনপ্রিয়তা যথেষ্ট ছিল। শোনা যায়, চীনারা নানা উৎসব অনুষ্ঠানে ঘুড়ি ওড়াতেন। ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতাও সেকালে চলতো।

ঘুড়ির সাহায্যে সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন চীন সম্রাট ওয়ানহু। তিনি কারিগরদের দিয়ে বিরাট এক ঘুড়ি বানিয়েছিলেন এবং ঘুড়িতে সংযুক্ত করেছিলেন কয়েকশ হাউই। ঘুড়িতে চেপে স্বর্গে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। ঘুড়িতে চেপে বসলে হাউইতে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছিল এবং ঘুড়িটা আকাশে উঠে গিয়েছিল।

চীনাদেশের ইতিহাস থেকে এর বেশী তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ওয়ানহুর মৃতদেহ যে ফিরে এসেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খেয়ালি রাজার এই ছেলেমানুষী হাসির উদ্রেক করে সত্য, কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, মহাকাশের প্রথম অভিযাত্রী সেই ওয়ানহু।

ঘুড়ির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্যাঙ্কলিন। অতঃপর উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর নানা স্থানের আবহবিভাগ ঘুড়ি তৈরি করে আকাশে ওড়াতে শুরু করেন। বেলুন আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে আবহদপ্তরগুলো ঘুড়ির মাথাতে তাপমান যন্ত্র, বায়ুর আর্দ্রতা মাপক যন্ত্র ইত্যাদিকে বেঁধে দিয়ে আকাশে ওঠাতেন। অবশ্য এসব ঘুড়ি ওড়ানোর কাছে সুতোর পরিবর্তে সরু সরু তারকে ব্যবহার করা হতো।

বেলুন আবিষ্কারের প্রাক্‌মুহূর্তে অনেকে ওয়ান হুর মত বিশাল বিশাল ঘুড়ি বানিয়ে আকাশে উঠেছিলেন। তবে ওয়ানহুর মত কেউ বোকামি করেননি। কেউ কেউ ১০০ ফুট পর্যন্ত উপরে উঠতে পেরেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। আকাশে আরোহণ করা এবং আকাশ পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যম এই ঘুড়ির যুগ শেষ হয়ে যায় বেলুন আবিষ্কারের পরে। তবে আনন্দোপকরণ হিসেবে সে আজও টিকে আছে এবং থাকবেও।

বিবর্তনের ধারা

পৃথিবী মা বটে, কিন্তু বড় খেয়ালি মা। মা হয়ে কখনও কখনও বিমাতার মত আচরণ করে বসে। তার খেয়ালীপনায় কখনও আবহাওয়ার পরিবর্তন আসে, দীর্ঘস্থায়ী দুর্যোগ হানা দেয়, ভয়ংকর ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসে, আবার কখনও তার পৃষ্ঠদেশ বরফে বরফে ঢেকে যায়। এই অবস্থায় তার সন্তানদের মধ্যেও শুরু হয়ে যায় বাঁচার লড়াই। পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে সবাই যেন বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক মাত্র টিকে থাকতে পারে, বাদবাকিদের হারিয়ে যেতে হয়।

যারা লড়াই করে বেঁচে যায়, তারাও অবিকৃত থাকে না। পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে তাদের বংশধরদের মধ্যে প্রকাশ পায় নানা গুণ ও বৈশিষ্ট্য। এমনকি আকার, আকৃতি, আপন আপন বৈশিষ্ট্য সবই যেন পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে পরিবর্তন এমনই যে, তাকে আগেকার জীবের বংশধর বলে চেনাই যায় না। তবে এমনটি দু-এক পুরুষে আসে না। বেশ কয়েকটা এমনকি শত শত পুরুষ অতিক্রান্ত হয়ে যায়। বোধহয় পৃথিবী সব সময় নতুনের পিয়াসী। পুরাতনকে পরিত্যাগ করে নতুনকে বরণ করতে চায়।

না, পৃথিবীর খেয়ালিপনা নয়, পৃথিবীর বুকে দীর্ঘস্থায়ী দুর্যোগ সৃষ্টি হওয়ার নানা কারণ আছে। এবং দুর্যোগ আসে পর্যায়ক্রমে—অন্ততঃ কয়েক হাজার বছর পরে। পরে দুর্যোগ স্থায়ীও হয় হাজার হাজার বছর। আবার অতি ভয়ংকর দুর্যোগও আসে—যার ব্যাপ্তিকাল লক্ষ লক্ষ বছর। ঐ দুর্যোগের ভেতরেই সবকিছু যেন ওলোট পালট হয়ে যায়। পুরাতনের ঘটে বিলুপ্তি এবং পুরাতনের কবরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নতুনের রাজত্ব। এইভাবে চলে এসেছে চিরটা কাল। তাই পৃথিবী তার খেলাঘরের রঙ্গমঞ্চে আমদানি করেছে এককোষী থেকে বহুকোষী, অমেরুদণ্ডী থেকে মেরুদণ্ডী, অণ্ডজ থেকে স্তন্যপায়ী। অপরপক্ষে কারও একাধিপত্যকেও সহ্য করে না পৃথিবী। খোলকধারী প্রাণী, মাছ, সরীসৃপ, অতিকায় স্তন্যপায়ী ইত্যাদি অনেককে সে একে একে আহ্বান জানিয়েছে। যখনই কারও বংশ অত্যধিকভাবে বিস্তার লাভ করেছে, যখনই তাদের অত্যাচার চরমে উঠেছে, ঠিক তখনই যেন নেমে এসেছে দুর্যোগ। বর্তমানে সে সুযোগ দিয়েছে মানুষকে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই ঘটবে। একদিন মানুষের রাজত্বেরও হবে অবসান।

মানুষও স্বয়ম্ভু নয়। তাঁর আগমনের বীজ রোপিত হয়েছিল এক কোষীদের ভেতরে—শত শত কোটি বছর আগে। এককোষী থেকে যাত্রা শুরু করে

কালে কালে নানা রূপান্তরের মাধ্যমে আজকের এই জীব, এমনকি উদ্ভিদ জগৎও।

উপরের আলোচনা আমরা আজ যত সহজে করতে পারছি, মাত্র একশ বছর আগে এমন খোলাখুলিভাবে কেউ করতে সাহসী হতেন না। ধারণাটির উদ্ভবও হয়েছে মাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এর পূর্বে সাধারণের বদ্ধমূল ধারণা ছিল জীব ও উদ্ভিদ ঈশ্বরের সৃষ্ট। আর মানুষই হচ্ছে ঈশ্বরের প্রিয় সৃষ্টি। মানুষের সুবিধার জন্যই অপরাপর জীব ও উদ্ভিদের আমদানি করেছেন তিনি।

পৃথিবীতে মাঝে মাঝে ধ্বংসও যে নেমে আসে—এই সত্য কিন্তু পুরাকালে আবিষ্কার করেছিল মানুষ। ভারতীয় পুরাণে জলমগ্ন পৃথিবীর কথা আছে। পুরাণ মতে চক্রের মত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ আসে। তারপর নামে মহাপ্লাবন। সেবার মহাপ্লাবন শুরু হওয়ার পূর্বে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং তাঁরই নির্দেশে মনু জোড়ায় জোড়ায় প্রতিটি জীবকে সংরক্ষণ করেছিলেন। সংরক্ষণ করেছিলেন গাছপালার বীজ।

য়িহুদীদের ধর্মশাস্ত্রেও মহাপ্লাবনের উল্লেখ আছে। তাঁদের মতে "নোয়া" নামে এক অবতারকল্প মহাপুরুষ জোড়ায় জোড়ায় জীবকে রক্ষা করেছিলেন পরবর্তী সৃষ্টির জন্য।

হিন্দু ও য়িহুদিদের পুরাণে ধ্বংসের কথা থাকলেও, জীবের বিবর্তনের কথা নেই। তাঁদেরও ধারণা ছিল, পৃথিবীতে জীব ও উদ্ভিদজগৎ একইভাবে চিরকাল বিরাজ করছে। এবং জীব ও উদ্ভিদ স্বয়ং ঈশ্বরেরই সৃষ্ট। খ্রীষ্টান জগৎ আবার এই মতের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। একরকম ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তিই মনে করতেন, সৃষ্টির মূলে আছে স্রষ্টা এবং মানুষই হচ্ছে তার প্রিয়। ঈশ্বর নিজের খেয়ালে নিজের অবয়বের মত গড়েছেন মানুষকে।

তবে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে জীব ও উদ্ভিদজগতের চিন্তাভাবনা কেউ যে করেন নি এমন নয়। গ্রীক পণ্ডিতেরা মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলেন, জীবজগতের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। গ্রীক অ্যানাক্সামেণ্ডার বলেছিলেন, মানুষ প্রথমে মাছরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল। পরে একসময় গায়ের আঁশগুলোকে ঝেড়ে ফেলে উঠে এসেছিল ডাঙায়।

এম্পিডকসাস নামে আর এক গ্রীক দার্শনিক বলেছিলেন, মাটি থেকে গাছ জন্মেছে, গাছ থেকে এসেছে জীব। জীবদের মধ্যে যারা শক্তিশালী তারাই কেবল টিকে আছে। অর্থাৎ বিবর্তনের সুরটি প্রথমে অতি ক্ষীণভাবে ধ্বনিত হয়েছিল—এম্পিডকসাসের কণ্ঠে। আর জীববিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টোটল বলেছিলেন জড় থেকেই জীবের উৎপত্তি।

গ্রীক পণ্ডিতদের কথাগুলো একদিন হারিয়ে যায়। মধ্যযুগে পাশ্চাত্য কেবল ধর্ম নিয়েই শুরু করে দেয় মাতামাতি। সাহিত্য, বিজ্ঞান দর্শন সবকিছুর উপর প্রভাব বিস্তার করে চার্চ। চার্চের যাঁরা পুরোহিত ছিলেন, তাঁদের প্রতাপ

রাজার চেয়েও বেশী ছিল। ঈশ্বর সংক্রান্ত বিষয় ও ঈশ্বরের গুণগান ব্যতীত অন্য কথা বলতে গেলেই ধর্মদ্রোহী আখ্যায় ভূষিত হতে হতো এবং তার জন্য কঠোর শাস্তিরও ব্যবস্থা ছিল। তাই মানুষের উৎস সন্ধানে কেউ প্রবৃত্ত হননি।

ইউরোপের রেনাসাঁস যুগে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি সব বিষয়েই নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। বহু যুগন্ধর মহাপুরুষেরও আবির্ভাব ঘটেছিল সেই যুগে। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। তাঁর শ্যেনদৃষ্টি পৃথিবীর পুরাতন শিলাস্তরে আটকে থাকা কিছু কিছু প্রস্তুরীভূত জীবদেহ তথা জীবাশ্মের উপর নিবদ্ধ হয়েছিল। তিনি তাদের কিছুকিছু সংগ্রহ করেছিলেন এবং তাদের সম্বন্ধে চিন্তাভাবনাও করেছিলেন, সহজ বুদ্ধিতে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, এইসব জীব বহুপূর্বে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল। বর্তমানে ওরা হারিয়ে গেছে।

জীবাশ্ম অবশ্য প্রথমে ভিঞ্চি আবিষ্কার করেননি। তাঁর বহু পূর্বে গ্রীক পণ্ডিত জেনোফেন আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি কোন একটি পাহাড়ের গায়েই পেয়েছিলেন কতকগুলো সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ। তাতে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন—এগুলো হারিয়ে গেছে এবং পাহাড়গুলো এককালে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল।

দা ভিঞ্চির প্রায় একশ বছর পরে জীবাশ্মকে নিয়ে প্রথম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন চার্লস বনেট নামে এক বিজ্ঞানী। তিনি বহু জীবাশ্ম সংগ্রহ করেছিলেন। দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর ঘোষণা করেন, পৃথিবী থেকে বহু জীব কালে কালে হারিয়ে গেছে।

চার্লস বনেট হয়ত ধর্মভীরু ছিলেন, নয়ত চার্চের ভয়ে সত্য গোপন করেছিলেন। কেননা ধর্মযাজকরা প্রচার করেছিলেন, খৃষ্ট জন্মের ৪০০৪ বছর আগে ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন এবং তখনই সবরকম জীবকে সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। পরে মহাপ্রলয় হলে নোয়াই জীবদের বংশকে রক্ষা করেছিলেন। তাই বনেট বলেছিলেন, এইসব জীব হারিয়ে গেছে মহাপ্রলয়ে। সম্ভবতঃ নোয়া এদের বংশকে রক্ষা করতে পারেন নি।

যাইহোক, চার্লস বনেটের পরে বহু জনেই জীবাশ্ম সংগ্রহ করতে এবং তাদের পরীক্ষা করতে এগিয়ে আসেন। তাঁদের ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে পাওয়া গেল বহু জীবের প্রস্তরীভূত দেহ। পরীক্ষা করতে গিয়ে অনেকের মনে সন্দেহ এলো। কেউ কেউ বলে বসলেন, হারিয়ে যাওয়া জীবের সংখ্যা প্রচুর এবং হারিয়ে যাওয়া জীবের সঙ্গে আজকের জীবজগতের কোন জীবের মিল নেই।

মানুষ পাছে পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি সন্দিহান হয়ে উঠে, এই ভয়ে ধর্মযাজকরা উল্টো সুর ধরলেন। বললেন, বিজ্ঞানীরা যাদের প্রস্তুরীভূত জীবদেহ বলছেন—সেগুলো আসলে কোন জীবদেহ নয়। মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য শয়তান এগুলো তৈরী করে লুকিয়ে রেখেছে মাটির তলায়।

যাঁরা প্রকৃত বিজ্ঞানী ছিলেন, তাঁরা ধর্মযাজকদের কথা মেনে নিতে পারলেন না, অধিকন্তু আরও উৎসাহী হয়ে উঠলেন জীবাশ্মের অনুসন্ধানে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উইলিয়ম স্মিথ নামে জনৈক ইংরাজ সার্ভেয়ার একটা খাল খনন করার সময় ভূ-ত্বকের নানা স্তরবিন্যাস লক্ষ্য করেন। বিভিন্ন স্তরে দেখলেন বিভিন্ন ধরণের প্রাণীর জীবাশ্ম এবং আশ্চর্য হলেন, এক স্তরের জীবাশ্মের সঙ্গে অপর স্তরের জীবাশ্মের আকৃতিগত কোন মিল নেই।

স্মিথ বিস্মিত হলেন। সেই সঙ্গে ভূ-ত্বকের স্তরবিভাগ এবং জীবাশ্ম গুলোকে নিয়ে শুরু করলেন গবেষণা। তাঁরই গবেষণা থেকে জন্ম গ্রহণ করলো জীব ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের শাখা জীবাশ্মবিদ্যা—প্যালিওণ্টোলজি ও প্যালিও বোটানি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী জীববিজ্ঞানী ক্যুভিয়ে এক অদ্ভুত নিদর্শন আবিষ্কার করলেন। পাললিক শিলাস্তর থেকে লাভ করলেন বিশালকায় এক আকাশচারী প্রাণী—যা পাখী নয়, অথচ সরীসৃপদের সঙ্গে ওর মিল ষোল আনা। চঞ্চুতে সারি সারি দাঁত, ডানায় নেই পালক, লম্বা লেজ, অথচ আকাশে উড়তে পারতো। ক্যুভিয়ে ওকে সনাক্ত করলেন সরীসৃপ হিসেবে। নাম রাখা হলো টেরাডাকটিল। বহুকাল আগে অবলুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে।

কিছুদিন পরে জার্মানীর ব্যাভেরিয়া অঞ্চল থেকে আর এক ধরণের খেচরের জীবাশ্ম পাওয়া গেল। আকারে ছোট, ডানায় পালক থাকলেও আজকের দিনের পাখীর পালকের মত নয়। পাখীর সঙ্গে যেমন কিছু সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনই টেরাডাকটিলের সঙ্গেও। দেখা গেল, এরাও অবলুপ্ত হয়ে গেছে। নাম আর্কিও পটেরিক্স।

উক্ত ঘটনার পর বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হয়ে যায়। একে একে লাভ হলো আরও বহু অবলুপ্ত জীবের জীবাশ্ম। সেই সঙ্গে কিছু কিছু অতিকায় জীবেরও। বিজ্ঞানীরা এবার গবেষণায় মেতে উঠলেন। আশ্চর্যও বড় কম হলেন না। বার বার একই প্রশ্ন সবার মনে উদিত হলো—ওরা হারিয়ে গেল কেন? ওদের বংশধরদের কেউ কী কোথাও টিকে নেই।

এই প্রশ্নের জবাব দিলেন লীল নামে জনৈক ভূ-বিজ্ঞানী। দীর্ঘ গবেষণার পর তিনি মন্তব্য করলেন, সবার বংশধারা যে হারিয়ে গেছে, এমন নয়। আবার নতুনের আমদানিও হয়নি। অতীতের জীবগোষ্ঠী পরিবর্তিত পরিবেশে নতুন নতুন প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা এবার দোটানায় পড়লেন। লীলের কথা সম্পূর্ণরূপে মেনেও নিতে পারলেন না, আবার অস্বীকার করারও সাহস হলো না। রীতিমত বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। যাচাই করার জন্যও শুরু হয়ে গেল উদ্যোগ আয়োজন।

যাঁরা যাচাই করার জন্য গবেষণা করছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন লামার্ক। তিনি মন্তব্য করলেন, সমস্ত প্রজাতির জীবই জীবন ধারণের তাগিদে

তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সজ্ঞানে প্রচেষ্টা চালায়। সেই প্রচেষ্টার ফলে তাদের বংশধারার মধ্যে আসে রূপান্তর। পরিবেশের প্রভাব—বিশেষ করে আবহাওয়া, খাদ্য সংগ্রহ এবং শত্রুভাবাপন্ন জীবের প্রভাব প্রাণীর উপর পতিত হবেই। জিরাফের লম্বা গলা, হাতির শূঁড়, হরিণের শিং, বাঘ-সিংহের সুতীক্ষ্ম দাঁত ও নখর ইত্যাদি সজ্ঞান প্রচেষ্টার ফল।

এর পরেই এক যুগান্তকারী মতবাদ আসে এবং সেই মতবাদটির প্রবক্তা ডারউইন। মতবাদ প্রচারের পূর্বে তিনি বীগল নামক জাহাজে চেপে প্রায় পাঁচ বছর কাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পর্যটন করেছিলেন। লক্ষ্য করেছিলেন পৃথিবীর প্রতিটি দেশের জীব জন্তুদের। সব চেয়ে আশ্চর্যবোধ করেছিলেন গ্যালাপাগোস দ্বীপের বাসিন্দা কয়েক প্রজাতির ফিঞ্চ পাখীর ঠোঁটের গড়ন দেখে। তখনই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, যে অঞ্চলে যে প্রজাতির পাখী বাস করে, সেই অঞ্চলের খাদ্যের উপযোগী হয়ে গড়ে ওঠে তাদের ঠোঁটের গড়ন।

বাড়ীতে ফিরে আসার পর এ বিষয়ে ডারউইন গবেষণা করেছিলেন এবং বহু বিজ্ঞানীর লেখা বহু বইও পাঠ করেছিলেন। শেষে একটি পুস্তকের মাধ্যমে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁর সার কথা হলো, জীব তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে। যারা জয়ী হয় তারাই টিকে থাকে, আর যারা পারে না তাদের অবলুপ্ত হয়ে যেতে হয়। এই সংগ্রামের ফলেই জীবের বংশধারার মধ্যে রূপান্তর আসে। তার ফলে মাছ থেকে সরীসৃপ, সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ীতে রূপান্তর। এমন কী ঈশ্বর সৃষ্ট বলে কথিত যে মানুষ জাতটা, সেও তার ব্যতিক্রম নয়।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, সেদিনের ধর্মান্ধতার যুগে ডারউইন সহসা এই ধর্মবিরুদ্ধ কথা প্রচার করতে সাহসী হননি। দীর্ঘ ২২ বছর পরে প্রকাশ করেছিলেন গ্রন্থ।

ডারউইন যা ভেবেছিলেন শেষ পর্যন্ত তাইতো হলো। চারদিক থেকে উঠলো বিতর্কের তুমুল ঝড়। মাত্র কয়েকজন বিজ্ঞানী ছাড়া সেকালে কেউই মেনে নিতে পারেননি ডারউইনের কথা। তবে কালের কষ্টি পাথরে যাচাই হয়ে ডারউইনই অভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছেন। এখন ভুলেও কেউ ডারউইনের বিরোধিতা করছেন না।

মানুষের পূর্বপুরুষ

পৃথিবীর উন্নত জীব মানুষ উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অহংকার করে এসেছিল —সে ঈশ্বরের প্রিয় সৃষ্টি। ঈশ্বর তাকে নিজের মত করে গড়ে তুলেছেন পৃথিবীতে রাজত্ব করার জন্য।

মানুষের এই বিশ্বাসের মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করেন চার্লস ডারউইন। ১৮৫৯ সালে অরিজিন অব স্পেসিস নামে বইটিতে উল্লেখ করলেন "জীবের ক্রমবিকাশের অনিবার্য ধারায় নিম্নস্তরের জীব থেকে মানুষ উদ্ভূত হয়েছে। এবং কোন এক সময়ে গরিলা, শিম্পাজী, ওরাংওটাং প্রভৃতির পূর্বপুরুষের সঙ্গে মানুষের পূর্বপুরুষও একই জাতের প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়েছিল।"

ডারউইনের গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে বলদর্পী ও আত্মাভিমানী মানুষের অহংকারে আঘাত লেগেছিল। ক্ষেপে উঠেছিলেন ধর্মযাজকরা, ক্ষেপে উঠেছিলেন পণ্ডিত দার্শনিকেরাও। কথিত আছে, বেঞ্জামিন ডিসরেলি—যিনি পরে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, মানুষ বনমানুষের বংশধর নয়—সে দেবদূত। স্যামুয়েল উইলবার ফোর্স সারা ইংলণ্ডে বিতর্কের ঝড় তুলেছিলেন। ডারউইন এবং তাঁর সমর্থকদের হেয় প্রতিপন্ন করতে বিভিন্ন স্থানে জনসভার আয়োজন করেছিলেন এবং তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন ডারউইনকে। কুৎসিৎ ইঙ্গিতও। কথিত আছে, একবার একটি সভায় ডারউইনের একজন বড় সমর্থক হেনরি হ্যাক্সলেকে প্রশ্ন করেছিলেন "পণ্ডিত হাক্সলেকে আমি জিজ্ঞাসা করছি, হাক্সলের পিতামহ-পিতামহী কিংবা মাতামহ-মাতামহীরা কোন তরফে বনমানুষ ছিলেন?"

ডারউইনের সমর্থক সেই হেনরি হাক্সলেকে বলা হতো "ডারউইনের বুলডগ।" হাক্সলে সেদিন খুব সুন্দর কথাটি বলেছিলেন! বলেছিলেন "একদিকে অহংকারী মানুষ; অপরদিকে নিরীহ বনমানুষ। যদি নির্বাচন করার ক্ষমতা থাকতো তাহলে আমি বনমানুষকেই বেছে নিতাম।"

বিতর্ক দু-দশ বছরে শেষ হয়ে যায় নি। কোন কোন জায়গায় বিতর্ক চলেছিল বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত। তখনও আমেরিকার টেনেসি রাজ্যে কঠোর আইন ছিল স্কুলের ছেলেদের যেন ডারউইনের মতবাদ পড়ানো না হয়।

ততদিনে অনেকে ডারউইনের মতবাদকে সমর্থন করে নিয়েছেন। ১৯২৫ সালে বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের প্ররোচনায় এক তরুণ শিক্ষক ইচ্ছে করেই একদিন ক্লাসে উপস্থাপিত করলেন, ডারউইনের মতবাদ। তিনি জোর দিয়ে ছাত্রদের বললেন, মানুষ ঈশ্বর সৃষ্ট নয়। ডারউইনের মতটাই ঠিক।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গড়িয়ে গেল। তরুণ শিক্ষকটির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হলো। কিন্তু যে বিচারকের উপর ভার পড়লো—তিনি ছিলেন বাইবেলের গোঁড়া সমর্থক। তিনি তরুণ শিক্ষকটির কোন কথা শুনলেন না বা কোন জীববিজ্ঞানীর মতামত গ্রহণ করে সত্যতা যাচাই করলেন না। আইন অমান্যের অপরাধে ১০০ ডলার জরিমানা ধার্য করলেন।

ডারউইনকে নিয়ে প্রায় ৭০ বছর কাল বিতর্ক চলেছিল। তার পরেই ধীরে ধীরে মানুষ ডারউইনের মতকে মেনে নিতে শুরু করে। তবে এও ঠিক যে ডারউইনের পূর্বেও কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কতকগুলো প্রাচীন কবর খনন করে ডেনমার্কের প্রত্নতত্ত্ববিদরা কতকগুলো কঙ্কাল লাভ করেছিলেন এবং কঙ্কালের সঙ্গে লাভ করেছিলেন কিছু কিছু পাথরের হাতিয়ার। তাঁরা আরও কতকগুলো কবরে কঙ্কাল সহ ব্রোঞ্জ ও লোহার হাতিয়ারও পেয়েছিলেন। কঙ্কালগুলোকে দেখে তাঁরা শুধু বিস্ময় প্রকাশ করেননি, মানুষকে কয়েকটা শ্রেণীতে বিভক্তও করেছিলেন।

১৮২৫ সালে ম্যাক হেনরি নামে একজন পাদরি সাহেব টর্কের এক গিরি গুহায় লাভ করেছিলেন কতকগুলো হাড় এবং কিছু পাথরের হাতিয়ার। তিনি কঙ্কাল গুলোকে পরীক্ষাও করেছিলেন। মন্তব্য করেছিলেন, এই হাড়গুলো বিভিন্ন জীবের এবং কিছু মানুষেরও। প্রাণীগুলোতো বটেই, পাথরের হাতিয়ার ব্যবহারকারী এই মানুষরাও হারিয়ে গেছে।

উপরোক্ত দুটি আবিষ্কার-ই বিজ্ঞানীদের কিছুটা চঞ্চল করে তুলেছিল। ১৮৫৮ সালে সেই টর্কের গিরি গুহার কাছে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি এবং জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি খনন কার্য চালিয়ে পুনরায় লাভ করেন বহু অবলুপ্ত প্রাণীর কঙ্কাল এবং কিছু কিছু মানুষের তৈরি পাথরের হাতিয়ার। সে সময় আরও বহুজনে অনুরূপ নিদর্শন লাভ করেছিলেন বলেও খবর এসেছিল রয়্যাল সোসাইটির কাছে। তাই অনেকেই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন মানুষের পূর্ব পুরুষকে নিয়ে।

অতঃপর প্রচারিত হয় ডারউইনের মতবাদ এবং ঠিক তার পরের বছর অর্থাৎ ১৮৬০ সালে এক ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক এদুয়ার লার্ভে ফ্রান্সের এক গিরিগুহা খনন করে লাভ করলেন একটা উনান, কিছু ছাই, মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর কঙ্কাল এবং কতকগুলো পাথরের হাতিয়ার। সে সময় আরও খবর পাওয়া গেল, জার্মানীর নিয়ান্ডার উপকূলে পাওয়া গেছে এক ধরনের বেঁটে মানুষের কঙ্কাল (নিয়ানডারথাল মানুষ)। যদিও সেই কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৮৫৬ সালে। তেমনই ১৮৬৮ সালে ফ্রান্স থেকে পাওয়া গেল দীর্ঘাকৃতি মানুষের কংকাল (ক্রোম্যাগনন মানুষ)।

এবার প্রাচীন মানুষের খোঁজ করতে চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। অনেকে অনেক কঙ্কাল লাভও করলেন। কিন্তু কোন কঙ্কালকে প্রাচীন বলে চিহ্নিত

করা গেল না। অবশেষে ১৮৯২ সালে ডাঃ দ্যুবোয়া জাভা থেকে আবিষ্কার করলেন জাভা মানুষের কঙ্কাল।

জাভা মানুষের কঙ্কাল দেখে বিজ্ঞানীদের এবার ভাবতে হলো। ললাট প্রায় নেই, চোয়াল উচুঁ, এ কেমন ধরণের মানুষ! বনমানুষের সঙ্গেই যেন ওর সাদৃশ্য বেশী।

ধীরে ধীরে আরও বহু কঙ্কাল আবিষ্কৃত হলো। তাদের মধ্যে ১৯২৫ সালে রেমণ্ড ডার্ট কর্তৃক আবিষ্কৃত আফ্রিকার বেচুয়ানাল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রালোপিথেকাস মানুষের কঙ্কাল, ১৯২৯ সালে পিকিং এর গিরি গুহা থেকে আবিষ্কৃত পিকিং মানুষের কঙ্কাল, ভারতের শিবালিক পর্বতমালায় শিভাপিথেকাস মানুষের কঙ্কাল, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেদিন অবশ্য বহুজনে সচেষ্ট হয়েছিলেন প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল আবিষ্কার করতে এবং যাঁরাই লাভ করেছিলেন তাঁরাই দাবি করেছিলেন, তাঁদের আবিষ্কৃত কঙ্কালই প্রাচীনতম। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই নিয়ে নানা বৈজ্ঞানিক জালিয়াতিও হয়েছিল।

যাইহোক, মানুষ যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে তার সকল স্তরের জীবাশ্ম না পাওয়া গেলেও, যা পাওয়া গেল তাও বড় কম নয়। জীবাশ্মদের পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা এতদিনে সিদ্ধান্তে এলেন, কোন উচ্চ শ্রেণীর প্রাইমেট থেকেই মানুষ বিবর্তিত হয়েছে। সত্য প্রতিপন্ন হলো ডারউইনের মতবাদ।

তবু একটা প্রশ্ন থেকে গেল। মানুষ বুদ্ধিমান হয়েছে তার মস্তিষ্কের জন্য। তার মস্তিষ্কের আয়তন প্রায় ১৬০০ ঘন সেণ্টিমিটারের মত। অথচ বনমানুষের ক্ষেত্রে আয়তনটা মাত্র ৬০০ ঘন সেন্টিমিটার। একই উৎস থেকে যদি বনমানুষের ও মানুষের পূর্বপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল, তাহলে সেই প্রাচীন মানুষের নমুনা কোথায়! তবে একথাও স্বীকার করলেন সবাই; মানুষ যে সময় মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিল—সেদিন সে পাথরের হাতিয়ার ছুঁড়তে পেরেছিল। যা বনমানুষ পারে না! অতএব তেমন মানুষের কঙ্কাল চাই। আর সেই কঙ্কালের সঙ্গে চাই সেদিনের অনুন্নত ও ভোঁতা পাথরের হাতিয়ার।

আদি সেই মানবের অনুসন্ধান করতে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন ডঃ এল, এস বি লীকি। তিনি আগে থেকে খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছিলেন, আফ্রিকার বিভিন্ন জনবিরল অঞ্চলে অতীতের জীবজন্তু—যারা বর্তমানে লুপ্ত হয়ে গেছে তাদের প্রচুর জীবাশ্ম পাওয়া যায়। বিশেষ করে আফ্রিকার টাঙ্গানিকার অলডুবাই উপত্যকায়। কথিত আছে, জনৈক জার্মান প্রজাপতি সংগ্রহকারী এই খবরটা প্রথম সভ্য জগতের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তাঁরই কথায় আস্থা স্থাপন করে ১৯১৩ সালে রেক নামে এক জার্মান অধ্যাপক অভিযানও চালিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় তিনি তাঁর অভিযানকে স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

লীকি সাহেব দলবল নিয়ে ১৯৩১ সালে আফ্রিকায় রওনা হন। সঙ্গে ছিলেন

তাঁর স্ত্রী ও পুত্র। তারা সুদীর্ঘ ২৮ বছর কাল অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। খনন কার্যের ফলে শিলাস্তর থেকে উদ্ধার করেছিলেন প্রায় ১৫০টির মত অবলুপ্ত প্রাণীর জীবাশ্ম। কিন্তু প্রাচীন মানুষের কোন কংকাল লাভ করতে পারেন নি।

১৯৫৯ সালে মিসেস লীকিই প্রথম দেখতে পান একটি বিশেষ ধরনের মাথার খুলি। লীকি অসুস্থ ছিলেন। মিসেস লীকি সেই মাথার খুলিটি এনে দেন স্বামীকে।

লীকি পরীক্ষা করে দেখলেন। বুঝতে পারলেন, বনমানুষের মাথার খুলির সঙ্গেই সাদৃশ্যটা বেশী, অথচ ঠিক ঠিক মানুষ নয়। নামকরণ করলেন জিনজ্যান থ্রোপাস মানুষ। বনমানুষ থেকে বিবর্তনের শৈশবাবস্থায় এদের আগমন হয়েছিল ভেবে লীকি অনুরূপ নামকরণ করেছিলেন। কারণ জিনজ্ অর্থে প্রিয় বালক।

আবিষ্কার হলো বটে, কিন্তু কোন হাতিয়ার পাওয়া গেল না। তাই সন্দেহের দোলায় দোল খেতে লাগলেন লীকি সাহেব। কিন্তু কয়েকমাস যেতে না যেতেই লীকিরা লাভ করলেন কয়েকটি করোটি, চোয়াল এবং দাঁত। নমুনাগুলোকে পরীক্ষা করলেন। এবার দেখলেন, পূর্বের জিনজ্যানথ্রোপাসদের চেয়েও এদের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল বেশী। নিচের চোয়ালটার সঙ্গে আজকের মানুষের সাদৃশ্যটা বেশ প্রকট। আরও বুঝতে পারলেন, এরা পাথর ধরতে পারতো।

লীকি সাহেব এই মানুষের নামকরণ করলেন হোমোহাবিলিস। দাবী করলেন, তাঁর আবিষ্কৃত মানুষের কংকালই সব থেকে প্রাচীন মানুষের কংকাল। তাঁর দাবি মেনে নিলেন লন্ডনের রয়্যাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি এবং স্বর্ণপদক প্রদানের মাধ্যমে লীকিকে সম্মান জানালেন।

হোমোহাবিলিসকে প্রাচীন মানুষরূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল বেশ কিছুদিন। পরে সেই লীকি সাহেবই ভুল ভাঙ্গিয়ে দিলেন। আবিষ্কারের পরেও তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন তাঁর অভিযানকে। আফ্রিকার নানা স্থানে খনন কার্যও চালাতেন। একদিন ভিক্টোরিয়া হ্রদের কাছে লাভ করলেন একটি পুরুষ, একটি স্ত্রীলোক এবং একটি শিশুর প্রস্তরীভূত কংকাল। বাবা, মা তাদের একমাত্র সন্তান। বেচারারা জল খেতে এসে কোন কারণে আটকা পড়ে যায়। হয়ত চোরাবালিতে আটকে গিয়েছিল। কতকাল পরে তাদের কংকালগুলো এসে পড়লো এক সভ্য মানুষের হাতে।

লীকি কংকালগুলোকে পরীক্ষা করলেন, মস্তিষ্কের মাপ নিলেন, তাদের হাতগুলো পাথর ধরার উপযোগী ছিল কিনা তাও পরীক্ষা করলেন। শেষে সিদ্ধান্তে এলেন, হোমোহাবিলিসদের অনেক আগে ওরা আবির্ভূত হয়েছিল। সম্ভবতঃ আজ থেকে দুকোটি বছর আগে। নামকরণ করা হলো কেনিয়া পিথেকাস আফ্রিকানাস।

কেনিয়া পিথেকাস আফ্রিকানাসের চেয়ে পুরাতন কোন মানুষের জীবাশ্ম

এখনও আমাদের হস্তগত হয় নি। লীকি সাহেবের নমুনা এবং জাভামানুষ, পিকিংমানুষ, অস্ট্রালোপিথেকাস, নিয়ান ডার্থাল, সিভাপিথেকাস, ক্রোম্যাগনন প্রভৃতি নানা স্তরের জীবাশ্ম হস্তগত হওয়ায় আজ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে ঐ বনমানুষের পূর্বপুরুষ এবং মানুষের পূর্বপুরুষ কোন একটি বিশেষ উৎসের কাছে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সেই বিশেষ উৎসটি উচ্চ বর্গের অ্যানথ্রোপয়েড। হেকেল এর নাম রেখেছিলেন ড্রায়োপিথেকাস। তিনি আরও মনে করেছিলেন, ড্রায়া পিথেকাস থেকে পুরোপুরি মানবের মাঝখানে মানুষ ও বনমানুষের মাঝামাঝি পিথেকানথ্রোপাস মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। এদের কেউ কথা বলতে পারতো না। লীকি সাহেবের আবিষ্কার হেকেলের মতকে সমর্থনও করেছে। ভবিষ্যতে হয়ত আরও বহু নমুনা আবিষ্কৃত হবে এবং আরও নতুন করে এ বিষয়ে আলোকপাত ঘটবে।

মৃত্যু রহস্য

মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষ চিরকাল ভেবে এসেছে। অতি প্রাচীনকালে পণ্ডিতেরা মনে করতেন, জীবনের মূলে আত্মা। আত্মা আবার অবিনশ্বর। সে পুরাতন জীর্ণদেহ ত্যাগ করে নতুন দেহকে অবলম্বন করে। দেহ থেকে আত্মার বিদায় গ্রহণই মৃত্যু।

মৃত্যু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা নিরসনের জন্যই প্রাচীণকালে প্রায় সব দেশের দার্শনিকরা প্রায় অনুরূপ মত পোষণ করেছিলেন এবং এইমতে এখনও অনেকে বিশ্বাসী। অপরদিকে সেই প্রাচীনকাল থেকে মৃত্যুকে ঘিরে নানা সংস্কার প্রচলিত হয়েছে এবং সব ধর্মের মানুষের মধ্যে এখনও সেসব সংস্কারের কিছু না কিছু বিদ্যমান।

মনে পড়ে প্রাচীন মিশরীয়দের কথা। প্রথম সুসভ্য মানুষ। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে কল্পনা করেছিল, দেহের মৃত্যু হলেও আত্মার মৃত্যু নেই। ইহজীবন ক্ষণেকের। পরলোক অনন্তকালের। পরলোকে যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য মৃতকে মমিতে পরিণত করে কবরে পাঠানো হতো এবং কবরে দেওয়া হতো ইহলোকে যে সমস্ত জিনিস সে ব্যবহার করতো তার সবকিছুকে।

হিন্দু দর্শনেও আত্মাকে স্বীকার করা হয়েছে এবং গীতায় আত্মা সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করা হয়েছে।

সেকালে গ্রীকরা ছিলেন ভারি পণ্ডিত। তাঁরাও মৃত্যু সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তা

করেছিলেন এবং আত্মার অবিনশ্বরতাকে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা আরও মনে করতেন, আত্মা দেহছাড়া হলেও পুনরায় ফিরে এসে পুরাতন দেহকে আশ্রয় করতে পারে। তাই মৃত বলে সনাক্ত করার পরে অন্ততঃ তিনদিন মৃতদেহকে ফেলে রাখতো। কবর দিত তিনদিন পরে। অবশ্য এ ধারনার উৎপত্তির মূলে ছিল তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা। অতি বিরল হলেও এখনও মৃত বলে ঘোষিত হওয়ার পরে দু-একজনকে বেঁচে উঠতে দেখা যায়।

তবে সে আমলে (হাল আমলে বললেও মনে হয় অত্যুক্তি হবে না) একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন প্রথম বিশ্বকোষ প্রণেতা, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক প্লিনি। সেই ধর্মান্ধতার যুগেও তিনি ঈশ্বর এবং আত্মায় বিশ্বাস করেন নি। যার জন্য তাঁর বিশ্বকোষে দার্শনিকদের যুক্তি উদ্ধৃত করতে গিয়ে ঈশ্বরকে নিয়ে রসিকতা করতেও বাদ দেননি তিনি। কোথাও বলেছেন, ঈশ্বর সবকিছুই করতে পারেন, কিন্তু আত্মহত্যা করতে পারেন না। আবার কোথাও বলেছেন, ঈশ্বর সবই পারেন কিন্তু কোন মানুষকে অমর করতে পারেন না। তেমনই মৃত্যু সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সেই খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই উল্লেখ করেছিলেন "মানুষের দীন বিচারশক্তি মৃত্যুকে ঠিকঠিক উপলব্ধি করতে পারে না।"

মধ্যযুগে তথা ইউরোপের ধর্মান্ধতার যুগে দেহে আত্মার অবস্থিতি সম্বন্ধে আরও বহু দার্শনিক মতবাদ প্রচারিত হয়! আত্মা খাঁচা ছাড়া হওয়ার পরেও যে পুনর্বার দেহে ফিরে আসতে পারে—এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছিল সে যুগে। তাই অনুরূপ চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে এক বিশেষ ধরনের কফিন বানিয়ে দু-একজন বেশ পয়সাও কামিয়ে নিয়েছিলেন। কফিনের ভেতরে মৃতদেহের হাতের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হতো দড়ির একটা প্রান্ত। দড়িটির অপর প্রান্ত কবরের বাইরে একটা ঘণ্টার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হতো। মৃতদেহ নড়ে উঠলে যাতে ঘণ্টাধ্বনি হয় তারই ব্যবস্থা।

মৃত্যু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক কারণ খোঁজা হয়েছে বিংশ শতাব্দীতেই। শতাব্দীর মধ্যভাগে নানাধরনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই বিজ্ঞানীদের ভাবতে প্রেরণা দিয়েছিল। সে সময় কেউ কেউ মনে করেছিলেন, শরীরে অক্সিজেন পরিবহণ ব্যাহত হলেই মৃত্যু আসে। অপর কিছু কিছু বিজ্ঞানী মনে করেছিলেন, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হলেই মৃত্যু অনিবার্য।

দুটি ধারণাই অল্প কিছুদিনের ভেতরে নস্যাৎ হয়ে যায়। শ্বাসক্রিয়াকে চালু রাখতে আবিষ্কৃত হলো রেসপিরেটার এবং হৃদযন্ত্রকে চালু রাখতে পাম্প। দেখা গেল মৃত্যু যাদের ছিল অবশ্যম্ভাবী তারাও প্রাণ পেল। এক্ষেত্রে প্রশ্ন এলো, আত্মা খাঁচা ছাড়া হতে চাইলে তাকে কি ফিরিয়ে আনা যায়? নাকি জোর করে আটকে রাখা যায়?

এদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের হলো দারুন উন্নতি। সদ্য মৃতের হৃৎপিণ্ড, চক্ষু, কিডনী ইত্যাদিকে সংগ্রহ করে রোগাক্রান্ত দেহে অধিরোপন করার পদ্ধতি

প্রচলিত হলো। মৃত্যু যাদের ছিল অবধারিত, তারা দিব্য বেঁচে উঠতে লাগলো এবং দীর্ঘ জীবনও লাভ করলো।

এবার অনেকেই দ্বিধায় পড়লেন। আত্মা যদি সত্যই থাকে, তাহলে তার অনুপস্থিতিতে দেহের সব অঙ্গই অচল হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তার কিডনী, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি বেঁচে থাকে কেমন করে?

মানুষের দীর্ঘ দিনের বদ্ধমূল সংস্কার সেই আত্মাকেও সনাক্ত করতে কেউ কেউ সেসময় সচেষ্ট হয়েছিলেন। মৃত্যু ঘটবে এমন অবস্থায় দেহকে একটা নিশ্ছিদ্র কাচের তৈরী বাক্সে স্থানান্তরিত করেছিলেন কেউ কেউ। যাতে আত্মা দেহ ছাড়া হলেও সহজে বাক্সছাড়া হতে না পারে। না, কিছু পাওয়া যায়নি। এমনকি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও কেউ দেখতে পায়নি কিছু। অপরদিকে মৃত্যুর আগে ও পরে বাক্সের উপাদানগুলোকে পরীক্ষা করেও কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়নি।

মৃত্যুকে নিয়ে আরও ব্যাপকভাবে গবেষণা হয় বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে। মৃত্যুর সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলে একটা অ্যাডহক কমিটি গঠিত হয়। ঐ কমিটি নানা ধরণের অনুসন্ধান চালিয়ে ১৯৬৮ সালে "জারনাল অব আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন" এর একটি সংখ্যায় লিখলেন, মস্তিষ্ক অকেজো হলেই মৃত্যু হয়।

শুরু হলো যাচাই করার পালা। তত দিনে মস্তিষ্কের বহু গোপন তথ্য বিজ্ঞানীদের হাতে এসে গেছে। লক্ষ কোটি স্নায়ুকোষ চতুর্দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে রেখেছে। তারা একই সঙ্গে বিকল হয়ে যায় কেমন করে।

১৯৭৩ সালে দুই মার্কিন স্নায়ুবিশেষজ্ঞ সিদ্ধান্তে এলেন, মস্তিষ্কের যে অংশের দ্বারা চেতনা জাগে, যা শরীরের সমস্ত কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই সামান্য অংশ তথা "ব্রেনস্টেম"-টুকু অকেজো হয়ে গেলে জৈবনিক সমস্ত কাজকর্ম ব্যাহত হয় এবং তখনই মৃত্যু আসে।

বিংশ শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে বেশ কিছু মনোবিজ্ঞানী আত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতেও প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁদের-মধ্যে জর্জিয়ার রেমণ্ড মুডি ডঃ কেনেথ রিং এবং ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সুসান ব্ল্যাকমোর অন্যতম। মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরে এসেছেন—এমন কিছু কিছু—ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছিলেন এঁরা। যেমন ধরা যাক, আত্মহত্যা করতে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল—পরে চিকিৎসকরা তাকে নিশ্চিত মৃতুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছেন, অথবা মৃত্যু ঘোষিত হওয়ার পর পুনর্জীবন লাভ করেছেন, ইত্যাদি।

অভিজ্ঞতা যাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন, তারা পরস্পর বিরোধী নানা কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তবে অনেকের জবানীতে অন্ধকার এক সুড়ঙ্গের কথা, হঠাৎ

অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার কথা, তারপরে দীপ্তিমান আলোক দর্শনের কথা ইত্যাদি কথাগুলো মিলে গেছে।

যাঁরা আত্মায় বিশ্বাসী উপরোক্ত কথাগুলো তাদের বিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ১৯৮২ সালে সেই সুসান ব্ল্যাকমোরই আত্মার যুক্তিকে উড়িয়ে দেন। তিনি নিজেও বহুজনের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছিলেন এবং অন্ধকার, আলো ইত্যাদি ও শুনেছিলেন। তথাপি তিনি আত্মার যুক্তিকে উড়িয়ে দেন। শুধু এইটুকুই বলেছেন, বহুজনে যখন একই কথা বলেছেন, তখন একটা কিছু আছে। তবে এটি ঐ মস্তিষ্কেরই ব্যাপার। এসব নিয়ে আরও গবেষণার দরকার। হয়ত ঐ গবেষণাই মস্তিষ্কের নতুন নতুন রহস্য উদ্ঘাটন করবে।

মানুষ আজ কৃত্রিম মগজ তৈরী করতে চাইছে, বিজ্ঞানীরা সদ্য মৃতের মস্তিষ্ক সংগ্রহ করে যন্ত্রমানবে স্থাপন করতেও চাইছেন। কৃত্রিম নিউরন তৈরীও করে ফেলেছেন। তাই তাজ মৃত্যুর ব্যাপারটাকে নিয়ে দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কবে যে এই রহস্যের সমাধান ঘটবে কে জানে!

মানুষের মগজ বা মস্তিষ্ক

জীবজগতের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান এই মানুষ জাতটা একটা বিস্ময় এবং সে বিস্ময় তার উন্নত মস্তিষ্কের জন্যই। প্রকৃতপক্ষে ঐ মস্তিষ্কটাই মানুষকে জীবজগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দিয়েছে।

মানুষের মস্তিষ্ককে নিয়ে তাই গবেষণার অন্ত নেই। সেই কবে অ্যারিস্টোটলের সময় থেকে এ পর্যন্ত তথা দুহাজার বছরের বেশী সময় ধরে চলছে গবেষণা। বহু তথ্য অবশ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তবু অনাবিষ্কৃত তথ্যের সংখ্যাও বড় কম নয়। তাই কালে কালে মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আরও কত কথা শোনা যাবে।

মস্তিষ্ক সম্বন্ধে প্রথম গবেষণার সূত্রপাত করেছিলেন সম্ভবতঃ সেই গ্রীক পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী অ্যারিস্টোটল। সেদিন তিনি উল্লেখ করেছিলেন, প্রাণিজগতে দেহের অনুপাতে একমাত্র মানুষের ঘিলুর পরিমাণই বেশী। আর ঐ কারণেই জীবজগতে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ।

সত্য কথাই বলেছিলেন অ্যারিস্টোটল। দেহের অনুপাতে যে প্রাণীর মগজের পরিমাণ যত বেশী, সে প্রাণী তত বুদ্ধিমান। এতবড় প্রাণী যে তিমি —যার ওজন মানুষের তুলনায় প্রায় দেড়শ গুণ—তার মাথায় মগজ বা ঘিলুর

পরিমাণ মানুষের ৬ গুণ মাত্র। (তিমির মগজের পরিমাণ ৯ কিগ্রা, আর মানুষের ১১/২ কিলোগ্রাম)।

মানুষের বুদ্ধি, বিবেক ইত্যাদির মূলে যে একমাত্র মগজ—এই সত্য মানুষ অতি প্রাচীনকালে আবিষ্কার করলেও, মস্তিষ্ক সম্বন্ধে প্রকৃত গবেষণা শুরু হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। কথিত আছে, এফ. জে. গল নামে জনৈক শারীর বিজ্ঞানী মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করতে মস্তিষ্কের কয়েকটি বিভাগের কথা বলেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যুতের কলাকৌশল আবিষ্কৃত হওয়ায় কোন কোন বিজ্ঞানী ইতর প্রাণীদের চেতনাশূন্য করিয়ে কম ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক শক প্রদান করেছিলেন। তাতেই প্রথম ধরা পড়ে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজ পৃথক পৃথক হলেও এক অংশ অপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং এক অংশের কাজের সম্পূর্ণতা নির্ভর করে অপর অংশের সহযোগিতার উপর এবং এই গুণটি সহজাত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মস্তিষ্ক সম্বন্ধে গবেষণা বেশ জোরদার হয়। কেবল মানুষ নয়, অন্যান্য প্রাণীর মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশকে উত্তেজিত ও পরে প্রশমিত করে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নানা ধরণের পরীক্ষা করেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানী ক্যাম্বেল তাঁর-পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করে মস্তিষ্ককে ২০ টি ভাগে ভাগ করেছিলেন এবং মস্তিষ্কের একটা ছবিও এঁকেছিলেন।

ক্যাম্বেলের পরীক্ষাকে অনুসরণ করেন বিজ্ঞানী ব্রডম্যান। তিনি ক্যাম্বেলের বিভাগীকরণে সন্তুষ্ট না হয়ে মস্তিষ্কের ৪৭টি বিভাগ নির্দেশ করেন।

ব্রডম্যানের পরে আরও অনেকে মস্তিষ্ককে আরও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করেছিলেন। সে সময় মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন এবং স্নায়ুতন্তুর সংখ্যাও নির্ণয় করা হয়। স্থিরীকৃত হয়, মস্তিষ্কের মোট ক্ষেত্রফল ২২০০০০ বর্গ মিলিমিটার এবং স্নায়ুতন্তুর সংখ্যা ২০ লক্ষ।

ক্যাম্বেল অবশ্য তখনও তার পরীক্ষা অব্যাহত রেখেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন, স্নায়ুতন্তুর সংখ্যা ২০ লক্ষের ঢের বেশী এবং এই স্নায়ুতন্তুরা মস্তিষ্কের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সংযোগ রক্ষা করে।

এর পর প্রায় ত্রিশ বছরের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন, মাথার খুলিটার তলায় যে এবড়ো খেবড়ো এবং আঁকাবাঁকা বস্তুটি থাকে, যাকে আমরা মস্তিষ্ক বলে থাকি—সেটি কয়েক কোটি স্নায়ুকোষ এবং ওর সঙ্গে সংযোগ-রক্ষাকারী স্নায়ুতন্ত্র ছাড়া অন্য—কিছু নেই। নাম সেরিব্রাল কর্টেক্স। সিঁথির মাঝখান বরাবর ডাইনে ও বাঁয়ে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। ডান দিকেরটা ডান হেমিস্ফিয়ার এবং বাম দিকেরটা বাম হেমিস্ফিয়ার। দুটি হেমি-স্ফিয়ারের সংযোগ রক্ষা করে চলে স্নায়ুতন্তু।

সেরিব্র্যাল কর্টেক্সের প্রধান চারটে ভাগ। খুলির ভেতরে কপালের দিকটায়

সামনের অংশ, মধ্যস্হলের অংশ, পেছনের অংশ এবং কানের মধ্যস্থল থেকে চার মিলিমিটার উপরের দিকের অংশ। এদের আরও বিভাগ করা হয়েছে এবং বিভাগগুলো ভিন্ন ভিন্ন অংশের কাজের ভিত্তিতে। যেমন সেনসারি কর্টেক্স মোটর কর্টেক্স ইত্যাদি।

বিজ্ঞানীদের আরও বহু পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকাশ পেয়েছে, মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য দায়ী এবং তাদের প্রত্যেকেরই এক একটা কেন্দ্র আছে। কাজের ভিত্তিতে কেন্দ্রগুলোর নামকরণও করা হয়েছে। যেমন স্পর্শানুভূতির কেন্দ্র, ঘ্রাণানুভূতির কেন্দ্র, শ্রবণানুভূতির কেন্দ্র, দর্শনানুভূতির কেন্দ্র, কথা বলার কেন্দ্র, ইত্যাদি। অংশগুলো আবার কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী পর পর সজ্জিত হয়ে আছে। যে অংশের গুরুত্ব যত অধিক সেই অংশ এবং তার কেন্দ্রটি মস্তিষ্কের তত গভীরে।

মস্তিষ্ক রাজা এবং যেখানটায় মস্তিষ্ক অবস্থান করছে সেটি যেন রাজধানী। টিভি প্লেটের উপর ভেসে ওঠা ছবির মত ধড়ের উল্টো প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে সব-সময় ভেসে থাকে। শরীর রক্ষার জন্য বিচার, বুদ্ধি, বিবেক ইত্যাদি সবকিছুই তার নিয়ন্ত্রণাধীনে।

মস্তিষ্ক শরীরকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেই বিস্ময়কর ব্যবস্থাও বিজ্ঞানীরা উদ্ঘাটিত করেছেন। এই কাজে মস্তিষ্ককে সহযোগিতা করে শরীরের স্নায়ু-ব্যবস্থা। স্নায়ুকোষগুলো আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। লক্ষকোটি স্নায়ুকোষ বা নিউরোন ছড়িয়ে আছে শরীরের সর্বত্র। বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে অনুভূতি—যাকে আমরা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ানুভূতি বলি, তা ঐ স্নায়ুব্যবস্থার মাধ্যমে মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হয়। তারপরে মস্তিষ্ক কর্তব্য নির্ধারণ করে ধরা যাক, চলার পথে কোন একটি বিপজ্জনক পরিস্হিতি চোখে পড়লো। নিউরোনের মারফত সেই পরিস্হিতির খবর গেল মস্তিষ্কের দৃষ্টি বোধক কেন্দ্রে। নিউরোনগুলো অবশ্য স্হান ত্যাগ করে না। শৃঙ্খলের মত অবস্হান করছে বলে একটা থেকে আর একটাতে বাহিত হয়—যেন রিলে রেসের মত। মস্তিষ্ক খবর পেয়ে বিচার করে এবং তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেয় পরিস্হিতির মোকাবিলা করবে, না পেছিয়ে আসবে। আর ঠিক তখনই সে পদযুগলকে নির্দেশ পাঠায়।

আসলে ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ সহজ নয়। ভয়ানক জটিল ব্যবস্হা। আজকের দিনে যদিও মস্তিষ্ক সম্বন্ধে গবেষণা বহুদূর এগিয়েছে তবু তার কর্মপদ্ধতির সবটা আবিষ্কার করতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে অ্যালান হজকিন, অ্যান্ড্রু হাক্সলে প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করেন, স্নায়ু কর্তৃক মস্তিষ্কে সঙ্কেত বহনের ক্ষমতা তড়িতাহিত কণার প্রবাহ, তথা তরঙ্গপ্রবাহ ছাড়া কিছু নয়।

প্রকৃত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহের খেলা কিনা—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য অনেক বিজ্ঞানী জীবজন্তুদের নিয়ে অনেক পরীক্ষা চালিয়ে ছিলেন।

বিজ্ঞানী ডেলগ্যাডো বানর, বেড়াল প্রভৃতির মস্তিষ্কের এক এক অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইলেকট্রোড বসিয়ে চালিয়েছিলেন পরীক্ষা। বোতাম টিপে সেই প্রাণীদের ভেতরে যেমন ক্রোধ, উত্তেজনা ইত্যাদি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তেমনই সমর্থ হয়েছিলেন উত্তেজনাকে প্রশমিত করতে। ষাঁড়কে নিয়েও কেউ কেউ পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। প্রত্যেকেই লক্ষ্য করেছেন, বৈদ্যুতিক তরঙ্গ মারফত মস্তিষ্কের ক্রোধ কেন্দ্রটিকে উদ্দীপ্ত করলে প্রাণী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। আর তখনই মস্তিষ্কের যে অংশটা ক্রোধ প্রশমনের কেন্দ্র—সেইখানে উত্তেজনা সৃষ্টি করলে সহসা প্রাণীটি শান্ত ও একান্তভাবে নিরীহ হয়ে পড়ে!

মস্তিষ্কে তড়িৎ প্রবাহের পদ্ধতিকে নিয়ে আরও অনেকে অনেক গবেষণা করেছেন। জাপানী বিজ্ঞানী সোশাকুনুমা বাহক হিসেবে বড় বড় প্রোটিন অণুকে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন। এরউইন, নাহার প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা সক্ষম হয়েছেন মস্তিষ্কে তড়িৎ প্রবাহের নিয়ম আবিষ্কার কয়তে। তবু মস্তিষ্কের সমূহ রহস্য এখনও উদ্ঘাটিত হয়নি।

মানসিক রোগ চিকিৎসা পদ্ধতি ই. সি. টি.

মানুষ নানা কারণে মানসিক রোগাক্রান্ত হয়। বর্তমানে আবার মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী এবং সামাজিক পরিবেশ জটিল থেকে জটিলতর হওয়ায় মানসিক রোগাক্রান্তদের সংখ্যা বেড়েও চলেছে। কোন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অহেতুক ভয় পাওয়া, চলার পথে বাধা বিঘ্নের উপস্থিতিতে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা, দুঃখ শোকে মুষড়ে পড়া, কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেকে অপরাধী মনে করা, ইত্যাদি মানসিক রোগের লক্ষণ। মানসিক রোগাক্রান্তরা দুর্বিসহ জীবন যাপন করে, কখনও আত্মহত্যার মত জঘন্য পথকে বেছে নিতে চেষ্টা করে, কখনও বা পাগল হয়ে যায়।

মানসিক রোগী চিরকালই আছে এবং চিকিৎসরা চিরকালই ভেবে এসেছেন এমন হতভাগ্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে। প্রাচীন চিকিৎসরাও কেমন করে যেন বুঝে নিয়েছিলেন, মানসিক রোগের ক্ষেত্রে একমাত্র মস্তিষ্কই দায়ী এবং এও লক্ষ্য করেছিলেন, কোনও প্রকারে রোগীর শরীরে যদি আক্ষেপ সৃষ্টি করা যায় তাহলে রোগী ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

প্রাচীন ভারত চিকিৎসাক্ষেত্রে সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সহস্র সহস্র গুণে উন্নত ছিল। সেকালে চিকিৎসকরা তাই আক্ষেপ সৃষ্টির জন্য জল চিকিৎসা করতেন (হাইড্রোপ্যাথি)। কিংবা ঠাণ্ডা লাগার জন্য মাথায় বিশেষ বিশেষ তেল

লেপন করতেন। তাতে সর্দি লাগতো এবং সর্দি লাগলে আক্ষেপ সৃষ্টি হতো।

প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসকরাও মানসিক রোগীদের আক্ষেপ সৃষ্টির দিকে ঝোঁক দিতেন। মধ্যযুগীয় চিকিৎসকরা আক্ষেপ সৃষ্টির জন্য কর্পূরের ব্যবস্থা করতেন।

মানসিক রোগীদের সুষ্ঠু চিকিৎসা পদ্ধতি বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে উদ্ভাবিত হয়েছে। মানসিক রোগ সম্বন্ধে ঐ সময়ে যাঁরা গবেষণা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রোমের দুই চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইওগো কারলেটি এবং লুসিও বিনি প্রধান। তাঁরা সেই প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাঁরা রোগীর দেহে সহজে এবং যন্ত্রণাবিহীনভাবে আক্ষেপ সৃষ্টির জন্য ভাবনা চিন্তা করেন।

প্রথমতঃ তাঁরা আক্ষেপ সৃষ্টির জন্য ওষুধের উপর গুরুত্ব দেন। কিন্তু তেমন কোন ওষুধের সন্ধান না পেয়ে বিকল্প পথ আবিষ্কারের জন্য চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। এমন সময় তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তড়িৎপ্রবাহের উপর। তাঁরা ভাবলেন, তীব্র তড়িৎপ্রবাহ মানুষের মৃত্যু ঘটায় বটে, কিন্তু সীমিত বিদ্যুৎশক্তি শরীরের কোন ক্ষতি করে না। মানসিক রোগীদের অল্প পরিমাণ বিদ্যুতের শক খাওয়ালে কেমন হয়?

এবার পরীক্ষার পালা। কার উপরে পরীক্ষা করা যাবে? ১৯১৮ সালে তাঁরা পেলেন তীব্র মানসিক বিকারগ্রস্ত এক রোগীকে। ভদ্রলোকের নাম স্কিজোফ্রেনিয়া। সব চিকিৎসাই সারা হয়ে গেছে। হাল ছেড়ে দিয়েছেন ডাক্তাররা। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ।

পরীক্ষার জন্য সেই উন্মাদকেই আনালেন কারলেটিও বিনি। তারপর চেতনা নাশক ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে সংজ্ঞাহীন করিয়ে ইলেকট্রোডের মাধ্যমে ১১০ ভোল্টের বিদ্যুৎশক্তিকে পাঠালেন। ইলেকট্রোড দুটি স্থাপন করেছিলেন মাথার দুপাশে। আর ঐ পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল, ওর বেশী পরিমাণ বিদ্যুৎকে প্রেরণ করলে হৃদপিণ্ডের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

বিদ্যুৎ প্রবাহ বেশীক্ষণ অব্যাহত রাখেন নি। অল্প কিছুক্ষণ দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ঐ সময় শরীরে তীব্র খিঁচুনি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় সাময়িকভাবে দেহের মাংসপেশীকে প্রসারিত করার জন্য ওষুধ প্রয়োগ করেছিলেন।

রোগীর সংজ্ঞা ফিরে এলে চিকিৎসকদ্বয় দেখলেন, বিদ্যুৎ প্রবাহের কথা সম্ভবতঃ টের পায়নি রোগীটি। কয়েক দিন নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখলেন, তারপর আবার সেই আগের মত স্বল্পকালের জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহ পাঠালেন। এবার দেখলেন, রোগীর মানসিক বিকার যেন অনেকটা দূরীভূত হয়েছে। তাতে তাঁরা উৎসাহিত হলেন এবং কয়েকদিন অন্তর অন্তর বেশ কয়েকবার বৈদ্যুতিক

শক প্রদান করলেন। অবশেষে রোগী পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে গেল।

খবরটা চিকিৎসক মহলে ছড়িয়ে পড়লো। অনেকে যেমন পরীক্ষার জন্য এগিয়ে এলেন, তেমনই অনেকে এই পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে কিনা—তার জন্য গবেষণায় রত হলেন। কেউ কেউ বললেন, অনুরূপ চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ অর্থে রোগীকে শাস্তিপ্রদান। তাছাড়া বার বার বিদ্যুতের শক দিলে শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। অপর দিকে বিদ্যুতের শক প্রদান করলে মস্তিষ্কে কী ধরণের প্রতিক্রিয়া হয় তা তো চিকিৎসকদ্বয় জানান নি!

যাই হোক সেদিন উক্ত চিকিৎসা পদ্ধতিকে নিয়ে যথেষ্ট তর্ক বিতর্ক হয়েছিল। সব বিতর্কের সমাধান এখনও হয়নি। তবু হতভাগ্য মানসিক রোগীদের কথা চিন্তা করে অচিরে এই চিকিৎসাপদ্ধতি প্রায় সর্বত্রই চালু করে দেন চিকিৎসাবিদরা। রোগীর আত্মীয় স্বজনরাও মানসিক হাসপাতালে রোগীদের দুর্বিসহ জীবনের পরিবর্তে অনুরূপ পদ্ধতিতে আরোগ্যলাভকে গুরুত্বও দিলেন। দেখতে দেখতে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো পদ্ধতিটি। নাম রাখা হলো ইলেকট্রোকনভালসিও থেরাপি বা সংক্ষেপে ই. সি টি।

বর্তমানে পদ্ধতিটির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ১১০ ভোল্টের পরিবর্তে এখন ১০০ ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহ পাঠানো হয়। উত্তম চেতনানাশক প্রয়োগের ফলে রোগী কষ্ট অনুভবও করে না।

ই. সি. টির কতকগুলো ক্ষতিকর দিকের কথা এখনও বিজ্ঞানীরা উল্লেখ করে থাকেন। তাই এখনও ওষুধ প্রয়োগের প্রতি আগে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভাল ভাল ওষুধ অবশ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। আর ওষুধেব মাধ্যমে রোগ নিরাময় নাহলে বাধ্য হয়ে ই. সি. টি করাতে হয়। এবং ই. সি. টি-তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়।

উক্ত কারণে ই. সি. টির কাল এখনও শেষ হয়নি। বরং মানসিক রোগাক্রান্তদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়ে চলায় এর চাহিদাও বেড়েছে। উক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে ৬ সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন অন্তর অন্তর মোট আট বারের মত বিদ্যুৎ প্রবাহ পাঠানো হয়। অন্য কোন উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত পদ্ধতিটি অব্যাহত থাকবে।

রোবট

মানুষের মগজ বা মস্তিষ্কটা বেজায় জটিল। নানান ব্যবস্থা সেখানে। তাই ঐ অঙ্গটার প্রতি মানুষের প্রচণ্ড অনুসন্ধিৎসা এবং সমস্ত জটিলতাকে ভেদ করে কৃত্রিম মগজ তৈরি করতে অনেকে প্রয়াসী হয়ে উঠেছেন। অবশ্য এই প্রয়াস শুরু হয়েছে মাত্র বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে।

প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্কের জটিল কর্মপদ্ধতিটা এখনও পুরোপুরি উদ্ঘাটিত হয়নি। তাই সব প্রশ্নের সমাধান হয়নি এখনও। যেমন ধরা যেতে পারে মাতৃগর্ভে এককোষী জাইগোট উৎপন্ন হওয়ার পর কোন্ যাদুমন্ত্র বলে সেখান থেকে হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং মস্তিষ্কটা গঠিত হয়ে যায় তা এখনও জিজ্ঞাসার বিষয় হয়ে আছে। অপরপক্ষে লক্ষ কোটি নিউরোন দ্বারা কেমন করে যে নানা ধরণের সঙ্কেত মস্তিষ্কে প্রবাহিত হচ্ছে সে জটিলতাও ভালভাবে ছিন্ন করা সম্ভব হয়নি। তাই অনুকরণ করতে গিয়েও নকল মস্তিষ্ক তৈরি করতে বিজ্ঞানীরা সমর্থ হননি এখনও। শুধু চেষ্টা চালাচ্ছেন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলোর অনুকরণে যন্ত্র বানাতে। অর্থাৎ যে সব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্কে বিভিন্ন অনুভূতির সঞ্চার হয় সেই প্রক্রিয়াগুলোকে অনুকরণ করছেন। অনেকটা সার্থকও হয়েছেন এবং তৈরি করেছেন যন্ত্রমানব বা রোবট।

রোবট কথাটি এসেছে চেকোশ্লোভাকীয় শব্দ "রোবিট" থেকে। শব্দটির বাংলা করলে হয় কাজ। তাই রোবট এখন এক যন্ত্র—যা মানুষের মত কাজ করতে সক্ষম।

"যন্ত্রমানব" কথাটা আজকে নতুন নয়। মানুষ অনেক আগেই এর কল্পনা করেছিল। শ্রম লাঘবের উদ্দেশ্যে যান্ত্রিক ক্রীতদাস তৈরি করা। এমন যন্ত্রমানব মানুষ সেদিন তৈরি করতে পারে নি। তার কল্পনা কল্পবিজ্ঞানের গল্পেই ছিল সীমাবদ্ধ। আজকের দিনে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছে।

যে সব যন্ত্রমানব বা রোবট এরই মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে, তাদের স্পর্শেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রখর। ফটো ইলেকট্রিক সেলের মাধ্যমে তাদের দৃষ্টি শক্তিও দান করেছেন বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে, কৃত্রিম তন্তু দিয়ে তাদের হাত-পায়ের পেশীর মত জিনিসও তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

রোবটকে যন্ত্রমানব বলার উদ্দেশ্য, এটি স্বয়ংক্রিয় এবং মানুষ যে ধরণের কাজ করতে পারে, এও সেই ধরণের কাজের উপযুক্ত। যে কোন যন্ত্র এমনকি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রও একই কাজ সব সময় করে। কিন্তু রোবট তার ব্যতিক্রম। ওকে যা যা শেখানো হয়, সে সেই সব করে এবং নিখুঁত ভাবে করে। মানুষের বরং ভুল হয় কিন্তু রোবটের ভুল হয় না।

রোবটকে শেখানোর জন্য একটি কম্পিউটার যন্ত্র যোগ করে দেওয়া হয়। যেহেতু কম্পিউটার যন্ত্রের দ্বারা প্রোগ্রাম করা সম্ভব, তাই প্রোগ্রাম অনুযায়ী রোবটের প্রয়োজনীয় অঙ্গ গতিশীল হয় এবং প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করে।

রোবটের কৃত্রিম মগজটা ঐ কম্পিউটার ছাড়া অন্য কিছু নয়। অথচ শেখানোর ফলে রোবট বুদ্ধি অর্জন করে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাই রোবট যান্ত্রিক ও কম্পিউটার উভয় প্রযুক্তির সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। যদিও কম্পিউটার প্রযুক্তি যান্ত্রিক প্রযুক্তিরই শাখা।

মানুষ তার নিজের পরিবেশে অভ্যস্ত। পরিবেশ পরিবর্তিত হলে কাজ করাতো দূরের কথা, জীবন নিয়েও টানাটানি পড়ে। কিন্তু যান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য সমুদ্রের তলদেশে, মহাকাশে, ধাতু ঢালাই-ওয়েল্ডিং প্রভৃতি উচ্চ তাপমাত্রার সংস্পর্শে মানুষ যেখানে ব্যর্থ হয় সেখানে রোবট আশ্চর্যভাবে কাজ চালিয়ে যায়। যেখানেই রয়েছে বিপদ সেখানেই এখন ডাক পড়ছে রোবটের। এমনকি অস্ত্রচিকিৎসায় এবং যন্ত্র সংক্রান্ত বিপদের সম্ভাবনা যেখানে অধিক সেখানেও রোবট তুলনাহীন। তাই আজকে বহু জায়গায় ঐ মুস্কিল আসান রোবটের ডাক পড়েছে।

রোবটকে কাজ করার জন্য এবং চলৎশক্তি দান করার জন্য হস্তপদাদিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য রোবটের হাত-পা গুলো ধাতব উপাদানে গঠিত। কঙ্কালের কাঠামোর মত জোড়া লাগানো। জোড়া দেওয়া হয়ে থাকে, অসংখ্য নাট-বোল্টের দ্বারা। মানুষ হাতেনাতে কোন কিছু করতে গেলে মানুষের দৃষ্টি শক্তি, স্পর্শেন্দ্রিয় যেমন একসঙ্গে কাজ করে এবং সেই সঙ্গে প্রয়োগ করে বিবেচনা শক্তি, তেমনই রোবটে দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিযন্ত্র যুক্ত হওয়ায় বিবেচনাসহ কাজ করতে সক্ষম হয়েছে।

অংক কষার ব্যাপারে এবং যে কোন জটিল গণনার ব্যাপারে রোবটের প্রচণ্ড ক্ষমতা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, এবং জটিল সমীকরণের সমাধান বিদ্যুৎগতিতে সম্পন্ন করে ফেলতে পারে। যা মানুষকে করতে গেলে দিনের পর দিন এমনকি মাসের পর মাস চেষ্টা চালাতে হতো। এক্ষেত্রে মানুষের মস্তিষ্ককে হার মানিয়েছে রোবট অর্থাৎ মানুষকেও পরাজিত করেছে মানুষের তৈরি রোবট। আর এর মূলে আছে সুপার কম্পিউটার ব্যবস্থা।

১৯৬০ সালে বিজ্ঞানী আর্থার ক্লার্ক ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন ২০০০ সালের দিকে মানুষ যন্ত্রমানব গড়তে পারবে। ক্লার্কের সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। মাত্র তিনটি দশক অতিক্রম করতে না করতে আশাতীত উন্নত হয়েছে যন্ত্র মানব। মাথায় পুরে দেওয়া হয়েছে কম্পিউটার, পরিবেশ থেকে সঙ্কেত গ্রহণের জন্য অসংখ্য, এমনকি মাংসপেশীর মত জিনিসেরও উদ্ভাবন করা হয়েছে। হাঁটে-চলে, কথা বলে, যে-কোন ভাষাকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারে, বুদ্ধি-বিবেচনাও প্রয়োগ করতে পারে। সোভিয়েত

ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশ নানা ধরণের রোবট তৈরী করেছে। বাহিরে ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদিকে পরিষ্কার করছে, শ্রমিকেরা যেখানে কাজ করতে অক্ষম সেখানে যন্ত্রমানব অতি সহজে কাজ করতে পারছে, দুর্গম স্থানে পরিভ্রমণ করতে পারছে। অথচ এরা জীব নয়, জড়। এমনও হতে পারে ২000 সালের দিকে এমন সব রোবট তৈরি হবে—যাতে থাকবে কম্পিউটারের পরিবর্তে মগজ। সেদিন হয়ত জড়ের মধ্যে প্রাণের লক্ষণ পুরোপুরি দেখা যাবে।

বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় মাত্র ত্রিশ বছরে চার প্রজন্ম অতিক্রম করে গেছে রোবট। প্রথম প্রজন্মে সে ছিল কম্পিউটার প্রোগ্রামের উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এখন বাহির থেকে তথ্য গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করতে পারছে, এবং তথ্যকে বিশ্লেষণ করছে।

বিজ্ঞানীরা এইখানে থেমে যান নি। এখনই আরও উন্নত রোবট তৈরি করতে চাইছেন। চাইছেন প্রকৃত মগজওয়ালা রোবট উপহার দিতে। গবেষণা চলেছে বিস্তর। তাঁদের হাতে শারীর বিদ্যা, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি সবকিছু যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের দ্বারা প্রাণিদেহের অঙ্গের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং যন্ত্রাংশের ও অঙ্গ নিয়ন্ত্রণের কৌশল সম্বন্ধে তুলনামূলক বিজ্ঞান আজকের রোবট তৈরির মূল উপাদান। এটি একটি বিজ্ঞানের নতুন শাখা। শাখাটির নাম সাইবার নেটিকস্।

সাইবার নেটিকসের আবার দুটি দিক (১) নিউরোসাইবার নেটিকস্ এবং (২) সেমিওটিক। আর এই দুটি দিক নিয়েই শত শত গবেষক গবেষণায় মেতে আছেন। উন্নতিও চরমে উঠেছে। নিউরোসারনেটিকসের মাধ্যমে রোবটের মাথায় পুরে দেওয়া হচ্ছে, কৃত্রিম মগজ বা নিউরোণের মত জিনিস। এতে রোবট মানুষের মত উপলব্ধি করতে পারছে এবং একটা ধারণাও তৈরি করে নিতে পারছে। দ্বিতীয় সেমিওটিক পদ্ধতিতে রোবট বাহির থেকে লাভ করা তথ্যকে বিশ্লেষণ করতে পারছে।

কৃত্রিম মগজের পরিবর্তে স্বাভাবিক মগজের কথাও একদল বিজ্ঞানী চিন্তা করছেন। এক্ষেত্রে সদ্য মৃত মানুষের মগজকে রোবটের মাথায় স্থানান্তরিত করণের পরিকল্পনাও কেউ কেউ করেছেন এবং বসিয়েছেনও।

এই পরিকল্পনার বিরোধিতাও করছেন কেউ কেউ। কেননা মানুষের মগজ পূর্ব অভিজ্ঞতাকেই বেশী করে কাজে লাগায়। এমন রোবট কোন গ্রহে কিংবা উপগ্রহে পাঠালে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরি হবে। কিন্তু সেখানে তো দেরি করলে চলবে না। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তাই এক্ষেত্রে মানুষের মগজ যথোপযুক্ত নয়। বিদ্যুতের মত চকিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভাবা হচ্ছে "সাইবারনেটিক ডাবল" এর কথা। অর্থাৎ কোন একটি কাজে বিশেষভাবে দক্ষ এক অভিজ্ঞ মানুষের মস্তিষ্ক অপেক্ষা হবে উন্নত কৃত্রিম

মগজ। আগামী দিনে মঙ্গলে অভিযান প্রেরণের কালে এই ধরণের সুদক্ষ রোবটকে পাঠানোর জন্য বেশ তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে।

রোবটের ভবিষ্যৎ ভেবে এখনই মানুষের হিংসে করতে ইচ্ছে হচ্ছে। যন্ত্র-মানুষের মত কাজ করবে অথচ খাওয়া দাওয়া, বিশ্রাম কোন কিছুর প্রয়োজন হবে না। সে কুটিল, হিংসুটে, সমাজ বিরোধী এবং এবং স্বার্থপরও হবে না। তার থাকবে স্বচ্ছ-দৃষ্টিভঙ্গী, ন্যায়নিষ্ঠ ও সুবিচারক। কারও কিংবা কোন দল বা মতের অন্ধ সমর্থক হবে না বা সহজ সরল পথকে বক্র দেখবে না। অপরদিকে তার রোগ-শোক-জরা কিছুই থাকবে না। ইচ্ছা মৃত্যুর অধীন হবে। ইচ্ছে করলে তারই অনুরূপ নতুন যন্ত্রমানব তৈরি করে ফেলতে পারবে। কেউ কেউ আবার রোবটকে প্রজননক্ষম করা যায় কিনা সেজন্যও ভাবনা চিন্তা করছেন।

আপাততঃ রোবট সম্বন্ধে অনুরূপ ভাবনাকে কল্পবিজ্ঞানের গল্প বলে অনেকে উড়িয়ে দিতে পারেন, অবিশ্বাসের হাসি হাসতে পারেন কিংবা পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়েও দিতে পারেন। কিন্তু না, বিজ্ঞানের কাছে কোন কিছু অবিশ্বাস্য নয়। "অবিশ্বাস" নামক শব্দটিকে বিজ্ঞানীরা বহু আগেই মুছে দিয়েছেন তাঁদের অভিধান থেকে। অপরদিকে যন্ত্রমানবের যেভাবে দিন দিন উন্নতি ঘটছে তাতে কয়েক দশকের মধ্যে সে মানুষের উপর টেক্কা দিতে পারবে। কী জানি, মানবের রাজত্বের পরে যন্ত্রমানবের রাজত্ব আসবে কিনা?

কম্পিউটার

কম্পিউটার প্রযুক্তি আজকের দিনে সবচেয়ে বড় বিস্ময়। এখন সর্বত্রই ওর আনাগোনা। বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে শুরু করে শিল্প-বাণিজ্যে, সরকারী প্রশাসনে, যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থায়, শিক্ষা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে, সঙ্গীত ও খেলাধূলার আসরে, কোথায় নয়? অপরদিকে মহাকাশ বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির মূলে রয়েছে কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই কম্পিউটারকে অবলম্বন করে রোবটও তৈরি হচ্ছে। সত্য কথা বলতে কী, কম্পিউটারের উন্নতি না হলে মহাকাশ অভিযান সম্ভবই হতো না। গাণিতিক গণনার ক্ষেত্রেও কম্পিউটার যুগান্তর আনয়ন করেছে। যে গণনায় একজন গণিতজ্ঞের কয়েক বছর সময় লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা সেখানে একটি কম্পিউটারের লাগে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড।

এ হেন এক বিস্ময়কর জিনিস আবিষ্কার এবং উন্নতির পেছনে রয়েছে সহস্র সহস্র বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের দীর্ঘকালের অধ্যবসায়। এর উন্নতির ইতিহাস অতি অল্পকালের হলেও, তথা মাত্র ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের হলেও পরিকল্পনাটা অনেক আগেকার। কথিত আছে, খ্রীষ্টজন্মের কয়েকশ বছর আগে চীন ও গ্রীক পণ্ডিতরা এক ধরনের যন্ত্রগণক আবিষ্কার করেছিলেন। যন্ত্রটির নাম ছিল "আবাকাস" বা গণনার ফ্রেম। তার সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ দিব্যি কষা যেতো। তারপরে এই ধরনের যন্ত্রগণকের পরিকল্পনা সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত কেউ করেননি।

১৬৪২ সালে এক নতুন ধরনের যোগ করার যন্ত্র উদ্ভাবন করেন অসামান্য গাণিতিক প্রতিভার অধিকারী ব্লেইজ প্যাস্কেল। আরও জানা গেছে, যোগ করার পরিশ্রমকে লাঘব করতে মাত্র ১১ বছর বয়সেই আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। প্যাস্কেলের পরে আর এক গণিতজ্ঞ লাইবনিটজ ১৬৭১ সালে অনুরূপ আর এক ধরণের যন্ত্রগণক আবিষ্কার করেছিলেন—যার সাহায্যে দ্রুত যোগ ও গুণ করা যেতো।

আধুনিক কম্পিউটারের প্রথম পরিকল্পনা করেছিলেন চার্লস ব্যাবেজ নামে এক প্রতিভাধর প্রযুক্তিবিদ। ১৮০০ সালে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন নামে একটি যন্ত্রগণক—তৈরী করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তিনি। দ্রুত গাণিতিক বিষয়গুলো সমাধান করতে সব রকমের পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর পরিকল্পনার কথা জেনে অনেকে তাঁকে উপহাস করেছিলেন। এমনকি অনেকে তাঁকে উন্মাদ বলে আখ্যাও দিয়েছিলেন। সেদিন পর্যন্তও যেন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, মানুষের বুদ্ধির ধারে পাশে যন্ত্র ভিড়তে পারেনা।

চার্লস ব্যাবেজ কিন্তু কারও কথার কর্ণপাত করেননি। তিনি নিজের খেয়ালেই গবেষণা চালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের প্রতিটি পর্যায় কীভাবে কাজ করবে এবং কেমন করে প্রোগ্রাম বানাতে হবে তাঁর খুঁটিনাটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

কথিত আছে, ব্যাবেজ তার অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের প্রোগ্রাম তৈরীর ভার অর্পন করেছিলেন কবি বায়রনের কন্যা "অ্যাডার" উপর। অ্যাডাও বেশ দক্ষতার সঙ্গে প্রোগ্রাম তৈরি করেছিলেন।

ব্যাবেজের মৃত্যুর প্রায় ৫০ বছর পরে তাঁর অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন হারম্যান হেলরিথ নামে জনৈক মার্কিন প্রযুক্তিবিদ। তিনি অ্যাডার প্রদর্শিত পথকে অবলম্বন করে পাঞ্চকার্ডের সাহায্যে প্রোগ্রাম তৈরি করে উপহার দেন এক যন্ত্রগণক বা ক্যালকুলেটর। উক্ত যন্ত্রগণকের সাহায্যে নিমেষেই সম্পন্ন হলো কঠিন কঠিন যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ। মানুষ এই প্রথম বিস্মিত হলো। ১৯২২ সালে আমেরিকার জনসংখ্যা গণনার কাজে ওকে ব্যবহারও করা হলো।

এবার বিজ্ঞানীরা উঠে বসলেন। খতিয়ে দেখতে শুরু করলেন এককালের উপহাসের পাত্র চার্লস ব্যাবেজের পরিকল্পনা গুলোকে। আর তখনই তাঁরা বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। দেখলেন, কম্পিউটার তৈরীর সব ব্যবস্থাই পাকা করে রেখে গেছেন ব্যাবেজ। তখনই তাঁরা ব্যাবেজকে কম্পিউটারের জনক আখ্যায় ভূষিত করেন এবং অ্যাডাকে দান করেন পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামারের সম্মান। অ্যাডার নামকে চিরস্মরণীয় করার জন্য আজকের দিনে এক ধরণের কম্পিউটার প্রোগ্রামের ডাটাকে বলা হয় অ্যাডা।

প্রকৃতপক্ষে কম্পিউটারকে জনপ্রিয় করিয়েছেন হেলরিথ। তিনি যন্ত্রটির উন্নতি সাধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং একটি কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যন্ত্রগণক বানাতে শুরু করেন। পরে ঐ কোম্পানী আরও কয়েকটা কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রস্তুত করেন ইনটারন্যাশনাল বিজনেস মেসিন বা আই. বি এম নামে একটি বিশেষ ধরণের যন্ত্রগণক। কিন্তু ঐ যন্ত্রগণকের প্রতি বিশেষ উৎসাহ ছিলনা কারও। বিক্রিও বড় একটা হোতনা। দেশের সৈন্যবিভাগই কিনতো ওকে। আরও পরে ১৯৫১ সালের দিকে আই. বি এমের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং ঐ ধরণের মেসিন আরও অনেক কোম্পানী বানাতে শুরু করেন।

কম্পিউটার তৈরির ক্ষেত্রে বিপ্লব আসে ট্রানজিস্টার আবিষ্কারের পরে। আগে এক একটা যন্ত্রগণকের জন্য প্রয়োজন হতো বহু সামগ্রী এবং সেগুলোর আয়তন এত বড় ছিল যে, সবগুলোকে একত্রিত করে গণনার কাজ সুসম্পন্ন করতে গেলে একটা বিরাট হলঘরের প্রয়োজন হতো। দামও পড়তো প্রচুর। তাই সাধারণে ওকে কিনতো না। ওকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা যেতোনা বলে বড় বড় সংস্থাও কেনার আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। ট্রানজিস্টারকে কাজে লাগানোর ফলে যন্ত্রটা অস্বাভাবিকভাবে ছোট হয়ে গেল এবং দামেও হলো সস্তা। প্রকৃতপক্ষে এতদিনেই জনসাধারণের দৃষ্টি পড়লো ক্যালকুলেটারের উপর এবং অনেকেই কিনতে শুরু করলেন।

ট্রানজিস্টার আবিষ্কারের পূর্বে ইলেকট্রনিক ভালভ ব্যবহার করা হতো। অনুরূপ ব্যবহার মাধ্যমে কম্পিউটারকে ধরা হয় কম্পিউটারের প্রথম প্রজন্ম। ট্রানজিস্টার আবিষ্কার হওয়ার পরে ইলেকট্রনিক ভালভের আর প্রয়োজন হলোনা। বিদ্যুতের খরচ কমলো এবং আয়তনে ছোট হয়ে গেল। দ্রুত কাজ করতেও সক্ষম হলো। তাই ট্রানজিস্টার ব্যবহৃত কম্পিউটারকে ধরা হয় কম্পিউটারের দ্বিতীয় প্রজন্ম।

এরপর আবিষ্কৃত হয় ইন্টিগ্রেটেড সারকিট। ফলে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে কম্পিউটার আরও উন্নত হলো। আয়তনে হলো আরও ছোট। এক একটি ইনটিগ্রেটেড সারকিটের টুকরো, যাকে আই সি চিপ বলা হয়—যে একই সঙ্গে অনেকগুলো উপাদানের কাজ একাই করতে সমর্থ হলো। ফলে কম্পিউটার দ্বিতীয় প্রজন্মকে অতিক্রম করে তৃতীয় প্রজন্মে পদার্পন করলো।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু আই. সি. চিপকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। আরও আরও উন্নত চিপ তৈরির কথা চিন্তা করলেন। একে একে আত্মপ্রকাশ করলো লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন বা এল. এস আই এবং ভেরি লার্জস্কেল ইন্টিগ্রেশন বা ভি এল. এস. আই।

এল এস আই সক্ষম হয়েছিল কয়েক হাজার উপাদানের কাজ এক সঙ্গে করতে। কিন্তু ভি. এল. এস. আই সক্ষম হলো লক্ষ উপাদানের কাজকে একসঙ্গে করতে। ফলে কম্পিউটার চতুর্থ প্রজন্মে পা দেয়।

চতুর্থ প্রবন্মের কম্পিউটার অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এত ক্ষুদ্র যে, ওকে মাইক্রো-কম্পিউটার বলা হয়। এতে ব্যবহার করা হয় একটিমাত্র চিপ বা টুকরা। ঐ একটি টুকরাই গাণিতিক গণনা থেকে বুদ্ধির কাজ সবকিছুই সম্পন্ন করতে সমর্থ হলো। ওজনে হলো মাত্র ৫০০ গ্রামের মত। অথচ প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারের ওজন ছিল ৩০ টনের কাছাকাছি। অপরদিকে আয়তনও অবিশ্বাস্যভাবে কমে গেল। প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারের আয়তন ছিল ৮০ ঘন মিটার। এবার আয়তনে দাঁড়ালো এক ঘনমিটারের চার হাজার ভাগের এক ভাগ। যে গণনার কাজ সম্পন্ন করতে লক্ষ লক্ষ হিসাবের প্রয়োজন হয়- -যেমন মহাকাশে গ্রহ ও নক্ষত্রদের গতিবিধি কিংবা একটি জ্যোতিষ্কের উপর অপরাপর জ্যোতিষ্কদের প্রভাব, ইত্যাদির ক্ষেত্রে সুপার কম্পিউটারের সময় লাগে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড।

একটি কম্পিউটারের সাধারণতঃ পাঁচটে ধাপ। অন্তর্দ্বার বা ইনপুট, স্মৃতি বা মেমারি, নিয়ন্ত্রণ বা কণ্ট্রোল, পাটিগণিত ও ন্যায় বা এরিথমেটিক ও লজিক এবং নির্গম বা আউটপুট।

কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রথমে একটা কর্মসূচী তৈরি করতে হয়। ওকেই বলা হয় প্রোগ্রামিং। প্রয়োজনীয় তথ্য বা নির্দেশাবলী অনুপ্রবেশ ঘটানোর পর স্মৃতিতে সঞ্চিত হয়। তারপর কাজ শুরু করে নিয়ন্ত্রণ বিভাগ। নির্দেশগুলোকে একটার পর একটা সাজিয়ে বিভিন্ন নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। এবং নির্দেশগুলোকে বিশ্লেষণও করে। অবশেষে চূড়ান্তফল বহির্দ্বারের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়।

বর্তমানে বহুল প্রচলিত কম্পিউটার যন্ত্রকে বলা হয় ইলেকট্রিক ডিজিটাল কম্পিউটার। এতে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করা হয়। এবং ইলেকট্রন প্রবাহই কাজ করে। সমূহ তথ্যকে প্রকাশ করতে হয় মাত্র দুটি অঙ্ক বা ডিজিটের মাধ্যমে। অঙ্ক দুটি যথাক্রমে ০ এবং ১। দুটি অঙ্ক বলে বলা হয় বাইনারি ডিজিট বা বিট। ১ বলতে "হাঁ" বোঝায় এবং ০ বলতে 'না' বোঝায়। এনালগ কম্পিউটার, হাইব্রিড কম্পিউটার প্রভৃতি আরও কয়েকধরণের কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়েছে। চন্দ্রপৃষ্ঠের অথবা কোন গ্রহের উপরিভাগের ছবি সংগ্রহ করা হয় হাইব্রিড কম্পিউটারের সাহায্যে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা আলোক কম্পিউটার তৈরির জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

প্রচলিত সমস্ত কম্পিউটারই ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তৈরি। অর্থাৎ এসব কম্পিউটারের পরিবহনের দূত (ইনফরমেশন সিগন্যাল) হলো ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের গতিবেগ আলোকের গতিবেগ অপেক্ষা কম। তাই পরিবহণের দূত হিসেবে আলোককে ব্যবহার করলে প্রতি সেকেণ্ডে $১০^{১৩}$ টি গণনা সম্পন্ন করা যাবে। যা বর্তমানের সুপার কম্পিউটার পারে না। আর এইটেই হবে কম্পিউটারের পরবর্তী প্রজন্ম।

ইলেকট্রনিকস্

বর্তমান যুগটাকে যেন ইলেকট্রনিকসের যুগ বলে অভিহিত করতে হয়। ইলেক্‌ট্রনিক্‌সকে কেন্দ্র করে শিল্পক্ষেত্রে যেন বিপ্লব এসেছে।

ইলেকট্রনিকস পদার্থবিদ্যায় বিদ্যুৎ সংক্রান্ত একটি প্রধান উপশাখা। উক্ত শাখায় শূন্য মাধ্যম, গ্যাস অথবা অর্ধপরিবাহী কোন পদার্থের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে ওর পরিধিটা এত বিস্তৃত হয়ে উঠেছে যে, একে একটি স্বতন্ত্র বিভাগরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ইলেকট্রনিকস্ কথাটির উদ্ভব ইলেকট্রন থেকে, ইলেকট্রন হচ্ছে পরমাণুর ঋণাত্মক আধানযুক্ত অতি ক্ষুদ্র মৌলিক কণিকা। বিভিন্ন উপায়ে ইলেকট্রনদের উত্তেজিত করালে যে শক্তির উদ্ভব হয় তারই নাম ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, কোন পরিবাহীর ভেতর দিয়ে ইলেকট্রন কণিকার নিরবচ্ছিন্ন গতিস্রোতই বিদ্যুতের প্রবাহ বা ইলেকট্রিক কারেণ্ট।

ইলেকট্রন সম্বন্ধে মানুষ জ্ঞানলাভ করেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। আগে মনে করা হতো, পদার্থের অন্তিম কণার নাম পরমাণু। পরমাণুকে ভাঙ্গাও যায় না এবং গড়াও। বিজ্ঞানীদের সেই ভুল ধারণা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্যাথড রশ্মিকে নিয়ে পরীক্ষার কালে। ১৮৯৭ সালে বিজ্ঞানী টমসন পরীক্ষার মাধ্যমে স্থির করেন, ক্যাথড রশ্মি প্রকৃতপক্ষে ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার প্রবাহ। ১৯১১ সালে বিজ্ঞানী মিলিকান ওর আধান ও ভর নির্ণয় করেন। এর ভর স্থির করেন, একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের $\frac{১}{১৮৩৫}$ ভাগ মাত্র।

যে কোন পরমাণুর কেন্দ্রে নিউক্লিয়াসে থাকে ধনাত্মক প্রোটন কণিকা, তড়িৎ নিরপেক্ষ নিউট্রন কণিকা এবং কেন্দ্রের চারদিকে বিভিন্ন কক্ষে পরিভ্রমণ করে

ইলেকট্রনরা। কেবল ব্যতিক্রম হাইড্রোজেন পরমাণুর বেলায়। ওর নিউ-ক্লিয়াসে মাত্র একটি প্রোটন থাকে এবং কেন্দ্রের বাহিরে পরিভ্রমণরত একটি ইলেকট্রন।

বর্তমানে অবশ্য উপরোক্ত তিন ধরণের কণিকা ছাড়া অন্যান্য বহু কণিকার সন্ধান পাওয়া গেছে। আরও জানা গেছে, প্রোটন এবং নিউট্রনরা মৌলিক কণিকা নয়। এখনও পর্যন্ত ইলেকট্রনকে স্থায়ী মৌলিক কণিকা বলে ধরা হয়ে আসছে।

ইলেকট্রনরা বায়ুস্তর, পাতলা ধাতব পাত, এমনকি কাচের ভেতর দিয়েও প্রবাহিত হতে পারে। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুতে ইলেকট্রণের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন। দেখা গেছে, ২২০ ভোল্টে ৬০ ওয়াটের বাল্ব জ্বালালে প্রতি সেকেন্ডে ঐ বাল্বের ফিলামেন্টের ভেতর দিয়ে ২৩×১০^{১৮}টি ইলেকট্রন কণিকা প্রবাহিত হয়।

ধাতুকে উত্তপ্ত করলেও ইলেকট্রন স্রোত বহির্গত হয়। এমন ইলেক্‌ট্রনকে বলা হয় থার্মো ইলেকট্রন। অপরপক্ষে কোন ধাতুর উপর আলো ফেললেও ইলেকট্রনকে পাওয়া যায় এবং এই ইলেকট্রণকে বলা হয় ফটো ইলেকট্রন।

যাইহোক, পদার্থের মধ্যে ইলেকট্রন কণিকার গতিবিধিকে সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত করেই গড়ে উঠেছে ইলেকট্রনিকস নামক শাখাটি। এর শুরু এডিসন প্রভাব নামে শূন্য মাধ্যমে তড়িত প্রবাহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সেই থেকে তৈরি হয়েছিল ইলেকট্রন টিউব। ট্রানজিস্টার ও ডায়োড আবিষ্কার হলে ইলেকট্রন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তর সূচিত হয়। আজকেও ওদের সাহায্যে হরেক রকমের যন্ত্র তৈরি হচ্ছে। সামান্য ঘড়ি থেকে শুরু করে রেডিও, টেলিভিসন, রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, এক্সরে উৎপাদন, যন্ত্রগণক বা ক্যালকুলেটার, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ প্রভৃতি সব কিছুর মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের উক্ত শাখাটি। ইলেকট্রনিকসের উন্নতির ফলে খুব কম আয়তনে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার তৈরী হয়েছে। বর্তমানে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন এক অবস্থার সূচনা হয়েছে, যাতে ওর সব শাখায় ডাক পড়েছে ইলেকট্রনিকসকে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলোর এমনই বৈশিষ্ট্য যে, ওরা অত্যন্ত কম বিদ্যুতে চালিত হতে পারে।

কোষ

অনেকদিন আগেকার কথা। তখন গ্রীকরা ছিলেন ভারি পণ্ডিত। তাঁরা বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখাতেই গবেষণার সূত্রপাত করেছিলেন এবং বহু তথ্যও

আবিষ্কার করেছিলেন। তাদের মধ্যে আবার অ্যারিস্টোটল ছিলেন সর্বযুগের এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরদের মধ্যে অন্যতম। জীববিদ্যাকে নিয়ে তিনি দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন এবং জীববিদ্যার গোড়াপত্তনও করেছিলেন। তাই তাঁকে বলা হয় জীববিদ্যার জনক।

অ্যারিস্টোটলের আগে জীব ও উদ্ভিদ দেহের কোন এককের কথা কেউ কল্পনা করেননি। অ্যারিস্টোটলই প্রথম উল্লেখ করেন—জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে আকারগত যত পার্থক্য দৃষ্ট হোক না কেন, ওদের দেহ গঠনের ক্ষেত্রে একটা সমতা আছে এবং জীব ও উদ্ভিদ উভয়ের দেহের ভেতরে একই ধরণের গঠনগত এককের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

অ্যারিস্টোটল অবশ্য ঐ একক সম্বন্ধে কোন কথা বলেননি। তাঁর উক্তিটি ছিল অনুমানভিত্তিক। সেই অনুমান সত্যে পরিণত হয়েছে প্রায় ১৮০০ বছর পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হলে।

অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার প্রকৃতপক্ষে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই প্রথম খালি চোখে দেখা যায় না—এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব বা বস্তুকে সনাক্ত করা গেল। তাই সেদিন চারদিকে যেন একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বহু বিজ্ঞানী মেতে উঠেছিলেন অনুবীক্ষণ যন্ত্রকে নিয়ে। কিন্তু এত যন্ত্র পাওয়া যাবে কোথায়? সেই কারণে বহু বিজ্ঞানী নিজে নিজেই তৈরি করে নিয়েছিলেন এবং যন্ত্রটির উন্নতি সাধনে সর্বাঙ্গীন চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এমনই একজন বিজ্ঞানী ছিলেন রবার্ট হুক। চিররুগ্ন ছিলেন তিনি। তবু গবেষণার মত শ্রমবহুল কাজকেই বেছে নিয়েছিলেন এবং তৈরি করেছিলেন তাঁরই মনোমত একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্র।

যন্ত্র তৈরির পর তাঁর একরকম খাস কাজ ছিল এটা ওটা পরীক্ষা করা। যেহেতু ঐ যন্ত্রের মাধ্যমে ছোট ছোট জিনিসকে বড় দেখায় এবং নানা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, তাই ছোট ছেলের মত যেন মজা পেতেন। একদিন বোধ হয় খেয়ালের বশবর্তী হয়েই বোতলে ব্যবহৃত শোলার ছিপি বা কর্কের একটা টুকরো কেটে পেতে দিলেন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায়। চোখ ঠেকাতে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। আশ্চর্য তো! এর মধ্যে মৌচাকের কুঠুরির মত এত অজস্র প্রকোষ্ঠ কেন?

খুব করে দেখলেন, শুধু কর্ক নয় অপরাপর গাছের নরম নরম কাণ্ডকে কেটে বার বার পরীক্ষা করলেন, সবশেষে সিদ্ধান্তে এলেন, সব উদ্ভিদের দেহে রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠযুক্ত একক। সেই এককের তিনি প্রথম নামকরণ করেন "সেল" বা কোষ।

রবার্ট হুকের পরে মারশেলো ম্যালপিঘি অনুরূপ পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তিনি কেবল উদ্ভিদদেহের নয়, প্রাণিদেহের এককের কথাও উল্লেখ করেন। নেহেমিয়ান গ্রু নামে আর এক বিজ্ঞানী উদ্ভিদকোষ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য আহরণ করেন এবং উদ্ভিদকোষের ছবিও আঁকেন।

রবার্ট হুকের পরে প্রায় একশ বছর ধরে বহু বিজ্ঞানী উদ্ভিদ ও প্রাণী-কোষকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে। কিন্তু খুব বেশী তথ্য তাঁরা আহরণ করতে পারেননি। কেবল উলফ., দ্য মিরবেল, ও কেন, ল্যামার্ক প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা যৎসামান্য তথ্য পরিবেশন করেছিলেন।

কোষকে আরও সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্রকে আরও উন্নত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন অনেকে। সফলও হয়েছিলেন। উন্নত যন্ত্রের মাধ্যমে অর্কিডের কোষকে পরীক্ষা করতে গিয়ে রবার্ট ব্রাউন প্রথম কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীনের সন্ধান পান। তার ঠিক একবছর পরে ডুমোর-টিয়ার নামে এক বিজ্ঞানী শেওলাকে নিয়ে পরীক্ষা করেন এবং শেওলার কোষ-বিভাজন পদ্ধতির উল্লেখ করেন।

ডুজাডিন নামে এক বিজ্ঞানীও পরীক্ষা করতেন উদ্ভিদকোষ সম্বন্ধে। তিনিই একদিন আকস্মিকভাবে সন্ধান পেলেন কোষের ভেতরে থকথকে জেলির মত পদার্থ। ঐ পদার্থটির তিনি নামকরণ করেন সারকোড।

ডুজাডিনের পরীক্ষার কথা ছড়িয়ে পড়লে অনেক বিজ্ঞানী সত্যতা যাচাই করতে এগিয়ে আসেন এবং তাঁরাও সনাক্ত করলেন সেই জেলির মত পদার্থটিকে। কিন্তু তরলটির চরিত্র দেখে অনেকে সারকোড নামটি অপছন্দ করেন এবং নামকরণের জন্য চিন্তা ভাবনা করেন। ১৮৪৬ সালে হুগো ভন মোল নামে এক বিজ্ঞানী সারকোডের পরিবর্তে প্রোটোপ্লাজম নাম রাখেন। তবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কারও কারও মতে প্রোটোপ্লাজম নামটির স্রষ্টা বিজ্ঞানী পারকিনজি।

প্রকৃতপক্ষে কোষ সম্বন্ধে সব জিজ্ঞাসার সমাধান করেন দুই জার্মান বিজ্ঞানী স্লাইডেন এবং থিওডোর স্বোয়ান। সেল থিওরি বা সেল ডকট্রিন নামে একটি মতবাদ প্রচার করেছিলেন তাঁরা। ঐ মত অনুযায়ী উদ্ভিদকোষ এবং প্রাণি-কোষের মধ্যে আকারগত ভিন্নতা থাকলেও গঠনগত সমতা আছে এবং সমস্ত জীবিত বস্তুর গঠনের একক কোষ। তাঁরা আরও উল্লেখ করেন, প্রত্যেকটি জীব ও উদ্ভিদের জীবন শুরু হয় একটিমাত্র কোষের মাধ্যমে এবং পূর্ব সৃষ্ট কোষ থেকে অন্য কোষের সৃষ্টি হয়। কোষ তাই বংশগতির একক।

প্রকৃতপক্ষে কোষের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে স্লাইডেন এবং স্বোয়ান অমর হয়ে আছেন।

ভ্রূণের উৎপত্তি রহস্য

টেস্ট টিউব বেবি

মাতৃজঠরে শিশু যখন স্থান লাভ করে তখন তার অবস্থান এবং আকৃতি কেমন থাকে এই নিয়ে চিন্তা ভাবনা অনেক কালের। সম্ভবতঃ অ্যারিস্টোটলের আমলেই এই নিয়ে দুটি মতবাদ জন্মগ্রহণ করেছিল। এবং ভ্রূণ আখ্যাটিও প্রদান করা হয়েছিল সেই সময়!

মতবাদ দুটির নাম (১) প্রিফরমেশন মতবাদ এবং (২) এপিজেনেসিস মতবদ। প্রিফরমেশন মতবাদ অনুযায়ী প্রাণী মাত্রেই প্রথমে তার ডিম্বের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র আকারে অবস্থান করে। একটা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীকে দেখতে যেমটি, ঠিক তেমনটি ভ্রূণের আকার। তার হাত, পা, চোখ, নাক, কাণ, মাংসপেশী, কঙ্কাল, ও অন্যান্য অঙ্গ সবই থাকে। তফাৎ শুধু আকারের। ভ্রূণ অতি ক্ষুদ্র—এই পর্যন্তই।

দ্বিতীয় এপিজেনেসিস মতবাদের স্রষ্টা অ্যারিস্টোটল নিজেই। উক্ত মতবাদ অনুযায়ী মায়ের ডিম্বানু পিতার শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত হওয়ার পর ভ্রূণের জন্ম হয় তারপর কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে ভ্রূণ ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গের দিকে এগিয়ে যায়।

দুই মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে বিতর্ক ছিল যথেষ্ট। তবে প্রথম মতবাদ তথা প্রিফরমেশন মতবাদের সমর্থকদের সংখ্যাই ছিল অধিক। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হলে বিতর্কের অবসানের জন্য এগিয়ে আসেন বহু বিজ্ঞানী। আবিষ্কর্তা লিউয়েনহোয়েক নিজেই সচেষ্ট হয়েছিলেন শুক্রাণুকে সনাক্ত করতে এবং তিনি শুক্রাণুকে দেখতে সমর্থও হয়েছিলেন।

লিউয়েনহোয়েকের আবিষ্কার প্রিফরমেশন মতবাদের সমর্থকদের কিছুটা ভাবনায় ফেলে দেয়। যাঁরা ছিলেন অন্ধ সমর্থক, তারা এবার ভাবতে শুরু করলেন, ভ্রূণটা মায়ের ডিম্বকের ভেতরে থাকে কিংবা শুক্রাণুর ভেতরে?

সেই সময় একটা মজার ঘটনাও ঘটেছিল। হার্টসিফার নামে এক ব্যক্তি দাবী করলেন, তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শুক্রাণুকে পরীক্ষা করেছেন এবং শুক্রাণুতে একটা মানব শিশুর পূর্ণ অবয়ব প্রত্যক্ষ করেছেন।

হার্টসিফার তাঁর বিবরণ শুধু প্রচার বা লিপিবদ্ধ করে ক্ষান্ত হলেন না, শুক্রাণুর ভেতরে মানবশিশুর অবয়ব এঁকেও প্রচার চালালেন। সেই ছবি অনেককেই বিভ্রান্ত করে এবং কিছু জনে হার্টসিফারের কথা মেনেও নেন। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ঐ প্রিফরমেশন মতবাদটাই প্রাধান্য লাভ করেছিল।

প্রিফরমেশন মতবাদের প্রথম প্রতিবাদ জানালেন বিজ্ঞানী উলফ্ ১৭৫৯ সালে। তিনি বললেন, প্রিফরমেশন ঠিক হতে পারে না। পারে না প্রথম থেকে আস্ত একটা প্রাণী মাতৃগর্ভে স্থান লাভ করতে। এপিজেনেসিস মতবাদটিই সঠিক মতবাদ।

এবার বিতর্ক উঠে চরমে এবং সে বিতর্ক চলে এসেছিল আরও ১৩০ বছর-কাল। অবশেষে বিতর্কের অবসানের জন্য ১৮৮৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী রৌক্স পরীক্ষার পরিকল্পনা করেন।

রৌক্স গ্রহণ করেন একটা নিষিক্ত ব্যাঙের ডিম। কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় যখন কোষটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল তখনই তিনি একটা অংশকে সূক্ষ্ম অগ্রভাগ বিশিষ্ট একটা উত্তপ্ত শলাকা দিয়ে নষ্ট করে দিলেন। তারপর সেটিকে বাড়বার সুয়োগ করে দিলেন। শেষে দেখলেন, একটা ভ্রূণের কেবল অর্ধাংশই উৎপন্ন হলো।

রৌক্স তার বাস্তব পরীক্ষা থেকে প্রমাণ করতে চাইলেন, ডিমের ভেতরে প্রথম থেকেই আস্ত একটা প্রাণী স্থানলাভ করে। তা না হলে অর্ধ ভ্রূণের জন্ম হতো না। অর্থাৎ প্রিফরমেশন মতবাদটিকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন তিনি।

ড্রিস নামে রৌক্সের সমসাময়িক বিজ্ঞানী এপিজেনেসিস মতবাদের সমর্থক ছিলেন। তিনি সহজে মেনে নিলেন না রৌক্সের মতবাদ। ড্রিস রৌক্সের পরীক্ষাটিকে অন্যভাবে অনুসরণ করলেন। গ্রহণ করলেন সেই ব্যাঙেরই ডিম। তারপর যখনই ডিমটি দুটি কোষে বিভক্ত হয়ে গেল তখনই খুব সাবধানে দুটিকে পৃথক করে নিলেন এবং দুটিকেই পৃথক পৃথকভাবে বাড়বার সুযোগ করে দিলেন। দুটি পৃথক অংশ থেকে ড্রিস লাভ করলেন, দুটি ভ্রূণ। তখনই তিনি প্রচার করলেন, ডিম্বের ভেতরে আগে থেকে ভ্রূণ স্থান-গ্রহণ করে না। কোষ বিভাজনের ফলেই ভ্রূণের সৃষ্টি হয়।

পুনরায় বিতর্ক উঠলো! উভয় মতের সমর্থক নিজেদের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন এবং এই প্রচেষ্টা চলেছিল বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। শেষে ঐ বিতর্কের অবসান ঘটাতে এগিয়ে এলেন আধুনিক ভ্রূণতত্ত্ববিদরা। তাঁরা নানা ধরণের পরীক্ষা করলেন, উভয় মতবাদের সপক্ষে যুক্তি গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। শেষে সিদ্ধান্তে এলেন, এপিজেনেসিস মতবাদটিই ঠিক। শুক্রাণুর কিংবা ডিম্বাণুর মধ্যে ভ্রূণ তৈরি অবস্থায় থাকে না! শুক্রাণুর দ্বারা ডিম্বক নিষিক্ত হওয়ার পর কোষ বিভাজন চলে। অবশেষে ভ্রূণের জন্ম হয়।

তাই বলে প্রিফরমেশন মতবাদটিকে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে পারলেন না। কেননা জীব তার বংশগতি সম্পর্কিত সমুহ গুণাবলী লাভ করে নিষিক্ত ডিম্বক থেকে। মানুষের বেলায় কালো কিংবা ফর্সা, বেঁটে কিংবা লম্বা, ইত্যাদি সব গুণই বংশগত। পিতার কাছ থেকে পাওয়া ২৩টি এবং

মায়ের কাছ থেকে পাওয়া ২৩টি—মোট ২৩জোড়া তথা ৪৬টি ক্রোমোজোম যুক্ত হয়ে জোড়ায় জোড়ায় সজ্জিত হয় এবং ঐ ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোই বংশগতির নিয়ামক।

যাইহোক আধুনিক বিজ্ঞানীরা এপিজেনেসিস প্রক্রিয়ায় প্রতিটি জীবের যেভাবে ডিম্বক নিষিক্ত হয়ে পুরোপুরি ভ্রূণে পরিণত হয় তার ধাপগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। যে কোন মেরুদণ্ডীর ক্ষেত্রে ধাপগুলো যথাক্রমে (১) প্রস্তুতি, (২) নিষেকের ফলে জাইগোট গঠন, (৩) কোষ বিভাজন, (৪) মরুলা, (৫) ব্লাস্টুলা এবং (৬) গ্যাস্ট্রুলা।

প্রথম প্রস্তুতি পর্বে পুরুষ প্রাণীর অণ্ডকোষে শুক্রাণু এবং স্ত্রীর ডিম্বকোষে ডিম্বাণু তৈরি হয়। দ্বিতীয় পর্বে ডিম্বক শুক্রাণুর দ্বারা নিষিক্ত হয় এবং একটি মাত্র কোষ গঠন করে। সেই কোষটির নাম জাইগোট। তৃতীয় পর্বে জাইগোট কোষ বিভাজিত হতে শুরু করে। এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, চার থেকে আট, আট থেকে ষোল—ঠিক এইভাবে বিভাজিত হতে হতে কোষগুলো উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। চতুর্থ মরুলা স্তরে কোষগুলো অনেকটা আঙ্গুরের থোকার মত সজ্জিত হয়। পঞ্চম ব্লাস্টলা পর্বে বিভাজনের ফলে উৎপন্ন কোষগুলো একটা ফাঁপা গোলকের আকার প্রাপ্ত হয়। ষষ্ঠ গ্যাস্ট্রুলা পর্বে ফাঁপা গোলকটার এক প্রান্ত চেপে ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং বিপরীত প্রান্তকে স্পর্শ করে। একটা বায়ুপূর্ণ বেলুনের পিঠে আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিলে যেমনটি হয়।

গ্যাস্ট্রুলা ধাপের পর তিনটি কোষস্তর সৃষ্টি হয়। স্তর তিনটি যথাক্রমে বহিস্তক বা এণ্ডোডার্ম, মধ্যস্তক বা মেসোডার্ম এবং অন্তস্তক বা এণ্ডোডার্ম। এণ্ডোডার্ম থেকে দেহের ত্বক ও স্নায়ুতন্ত্র, মেসোডার্ম থেকে অস্থি ও যোগকলা এবং এণ্ডোডার্ম থেকে পৌষ্টিক নালী ইত্যাদি তৈরি হয়। আর এইটেই ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থা।

মাতৃগর্ভে ভ্রূণের উৎপত্তি রহস্য আজ বিজ্ঞানীদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। ঐ আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এসেছে যুগান্তর। সম্ভব হয়েছে মাতৃগর্ভে শিশুর ভ্রূণটিকে যুক্ত করা এবং বিজ্ঞানীদের আশা, অচিরে ভ্রূণের সমূহ ত্রুটিকে দূর করে সম্পূর্ণ নীরোগ ও প্রতিভাবান শিশুকে পৃথিবীতে অনয়ন করবেন। অপরদিকে এখনই যে সব মায়েরা বন্ধ্যা, যাঁদের ডিম্বনালী সন্তান ধারণের পক্ষে উপযুক্ত নয়, তাঁদেরও চিকিৎসার মাধ্যমে মাতৃত্বের অধিকারী করে তোলা হচ্ছে।

এমন ক্ষেত্রে মাতৃজঠর থেকে ডিম্বাণুকে এবং পিতার কাছ থেকে শুক্রাণুকে গ্রহণ করে সংরক্ষণ করা হয়। তারপর মাতৃ জঠরের বাহিরে নিষিক্ত করা হয়। যখনই নিষিক্ত হয়ে জাইগোট কোষটি তৈরি হয়ে যাচ্ছে তখন তাকে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে মাতৃজঠরে। কোষ বিভাজন হতে হতে সেটি এক সময় ভ্রূণে পরিণত হয় এবং মাতৃগর্ভে স্বাভাবিক নিয়মেই বাড়তে থাকে।

অবশেষে যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হয় শিশু। মাতৃজঠরের বাহিরে টেস্টটিউবের ভেতরে নিষিক্ত করানো হয় বলে অনুরূপ শিশুকে টেস্টটিউব বলা হয়।

টেস্টটিউব বেবি উৎপাদনের কথা ১৯৬৫ সালে ডঃ রবার্ট এডওয়ার্ডস নামে কেম্ব্রিজের এক চিকিৎসাবিজ্ঞানী প্রথম ঘোষণা করেছিলেন, একটা নামকরা বৈজ্ঞানিক পত্রিকায়। প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন উঠেছিল বিতর্কের ঝড়। অনেকেই অসম্ভব বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু প্রবন্ধ প্রকাশের ঠিক ১৫ বছর পরে এডওয়ার্ডস এবং তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানী ডঃ প্যাট্রিক স্টেপলার এই অসম্ভবকে সম্ভব করেন। জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর প্রথম টেস্টটিউব বেবি লুইজি ব্রাউন। তারপর থেকে অনেকে এ কাজে হাত দিয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন। সফল চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক ভারতীয়ও আছেন।

বায়োনিক্স

মানুষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান। কিন্তু প্রকৃতিতে এমন কোন কোন জীব ও উদ্ভিদকে দেখা যায়—যাদের বৈশিষ্ট্যকে মানুষ বুদ্ধি দিয়ে সহজে ব্যাখ্যা করতে পারে না। প্রথমে উদ্ভিদের কথা ধরা যেতে পারে। সূর্যমুখী ফুল সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে, পদ্ম দিনের বেলায় ফোটে—শাপলা শালুক ফোটে রাতে, শিরীষ—তেঁতুল প্রভৃতির পাতা মেঘলা দিনে ও বিকেলের দিকে একটা বিশেষ সময়ে পাতাকে কুঁচকে ফেলে। সীম গাছ ঠিক ১২ ঘণ্টা অন্তর অন্তর পাতাকে খুলে ও বন্ধ করে। যেন জীবন্ত এক ঘড়ি এবং সময়জ্ঞানে মানুষকে হার মানায়।

ইতর প্রাণিদের মধ্যেও কী কম বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়? পিঁপড়েরা ভূমিকম্প ও ঝড়ের পূর্বাভাস ভালভাবেই টের পায়। মৌমাছিরা বাসা ছেড়ে মাইলের পর মাইল ছুটে যায় এবং দিগ্‌নির্ণয় যন্ত্র ছাড়াই পুনরায় বাসায় ফিরে আসে। যাযাবর পাখিরা সহস্র সহস্র মাইল ছুটে যায় এবং ফিরেও আসে। এমনকি সদ্যোজাত যাযাবর পাখীর শাবককে বিজ্ঞানীরা আটকে রেখে দল চলে যাওয়ার পর ছেড়ে দিয়েও দেখেছেন ঠিক পথে গিয়ে দলের সঙ্গে ভিড়ে গেছে। বাদুড়, ডলফিন প্রভৃতিরা শব্দোত্তর তরঙ্গকে কাজে লাগিয়ে রেডার ব্যবস্থার মত দূরের সংবাদ সংগ্রহ করে নেয়। সামুদ্রিক বহু প্রাণী জোয়ার ভাটার

সময় এবং ভরা কটাল ও মরা কটালকে নির্ভুলভাবে নির্ণয় করে নেয়। র‍্যাটেল-সাপ বায়ুর চাপ ও তাপমাত্রার সামান্যতম পরিবর্তনও ধরতে পারে। গঙ্গাফড়িং কম্পিউটারের মত মুহূর্তে শিকার থেকে তার দূরত্বকে নির্ণয় করে নিতে পারে এবং কত গতিতে লাফাতে হবে তাও ঠিক করে নেয়। এমনই কত অজস্র উদাহরণ আছে। মানুষ জাতটাও কম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। বিশেষ-করে তার মস্তিষ্কটা।

জীব ও উদ্ভিদের আশ্চর্য সব ক্রিয়াকলাপকে নিয়ে গবেষণা এবং তাদের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাগুলোকে অনুকরণ করে যন্ত্র নির্মান একেবারে হাল আমলের ব্যাপার। যদিও এদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহু আগেই বহু চিন্তাশীল মাথা ঘামিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় ইতালীয় রেনেসাঁস যুগের চিত্রকর লিওনার্দো দা ভিঞ্চির। ভিঞ্চিই প্রথম পাখীদের ডানার অনুকরণে কৃত্রিম ডানা বানিয়ে আকাশে ওড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও জীবের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে অনুকরণ করার এই প্রথম প্রয়াস।

প্রাণীদের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে অনুকরণ করার প্রচেষ্টা জোরদার হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীদের হাতে অজস্র বৈজ্ঞানিক তথ্য আসার ফলে। মানুষ এই বিদ্যায় অবিশ্বাস্যভাবে উন্নতি ঘটিয়েছে। যার ফলে অধিকাংশ জীব ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো তার জানা হয়ে গেছে। আর জানা হয়ে গেছে বলেই তাদের অনুকরণে নানা যন্ত্র বানিয়েছে এবং এই বিদ্যার চরম বিকাশ ঘটেছে কম্পিউটার ও রোবটের বেলায়।

জীব ও উদ্ভিদের স্বাভাবিক ক্ষমতার অনুসন্ধান এবং সেই ক্ষমতার অনুকরণে যন্ত্র নির্মাণ বায়োনিক্স নামক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের একটি শাখার অন্তর্গত। এই শাখায় জীববিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যা তো বটেই, পদার্থবিদ্যা, গণিত প্রভৃতি বিজ্ঞানের অপরাপর শাখাও জড়িত।

মানুষ যে আজ জীবজগতের সমূহ রহস্যকে ভেদ করেছে, তা নয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। মনে হয় এই অনুসন্ধানের শেষ কোন কালেই হবে না। অপরদিকে যেসব জীব ও উদ্ভিদের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া গেছে তাদের সবার ক্ষমতা অনুকরণে যে যন্ত্র বানানো হয়েছে এমন নয়। যেমন পিঁপড়ে কিম্বা গবাদি পশু ভূমিকম্পের কয়েকদিন আগে থেকেই আসন্ন ভূমিকম্পের কথা টের পেয়ে যায়। তাদের সেই ক্ষমতাকে এখনও মানুষ অনুকরণ করতে পারেনি। চেষ্টা অনেকে চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছু কিছু তথ্যও আহরণ করা হয়েছে। কিন্তু ভূমিকম্পের পূর্বাভাষ প্রদান এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এটি আছে ভাবী-কালের বিজ্ঞানীদের জন্য।

পেসমেকার

পেশমেকার নামক যন্ত্রটির কথা আজকে প্রায় অনেকের মুখেই শুনতে পাওয়া যায়। এটি একটি ছোট যন্ত্র এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ব্যাহত হলে বা অনিয়মিত হলে চিকিৎসকরা এটিকে রোগীর দেহে বসিয়ে দেন।

হৃদপিণ্ডটা আমাদের বুকের মাঝখানে সামান্য একটু বামে অবস্থান করছে। শিরার ভেতর দিয়ে দেহের রক্ত হৃদপিণ্ডে ফিরে আসে এবং সেই রক্ত ধমনীর মাধ্যমে সারা দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ রক্তটা শরীরে চক্রাকারে আবর্তিত হয় হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে।

আমাদের দেহে রক্ত আবার সীমিত। এবং এই সীমিত পরিমাণ রক্তকে অবিরাম অসংখ্য কাজকে সম্পন্ন করতে হচ্ছে। হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমেই রক্ত পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে আমাদের শরীরে যে পরিমাণ রক্ত থাকে তা ১২০০ মিলিলিটার পর্যন্ত অক্সিজেনকে বহন করতে সমর্থ হয়। অথচ এই পরিমাণ অক্সিজেন মাত্র পাঁচ মিনিটেই নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই রক্তকে অবিরাম হৃদপিণ্ডের মাধ্যমে সঞ্চালিত হতে হয় এবং ফুসফুস থেকে অক্সিজেনকে বহন করে দেহের প্রতিটি কোষে পেঁাছে দিতে হয়।

হৃদপিণ্ডকে তাই সব সময় একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সংকুচিত ও প্রসারিত হতে হয়। এটি যেন ছন্দোবদ্ধ একটি প্রক্রিয়া। স্বাভাবিক সুস্থ শরীরে একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির হৃদস্পন্দনের হার মিনিটে প্রায় ৭২ বার। বয়স বাড়লে স্পন্দন হার কমে। নবজাতদের ক্ষেত্রে একটু বেশী—সেকেণ্ডে ৮০ থেকে ৯০ বার। তবে স্পন্দন হার সব সময় নির্দিষ্ট থাকে না। কাজের অনুপাতে বাড়ে কিংবা কমে। দৌড়ানো এবং শ্রমবহুল কাজের সময় বেড়ে যায় ঘুমানোর সময় কম হয়।

এই ছন্দোবদ্ধ প্রক্রিয়া এক বিশেষ ধরণের রূপান্তরিত হৃৎপেশী, হৃৎস্পন্দন উৎপাদন এবং দ্রুত বিস্তারে এক উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করে। এই রূপান্তরিত হৃৎপেশীগুলোকে বলা হয় সংযোগী কলা। এদের পাঁচটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি সাইনোএট্রিয়াল নোড বা এস. এ. নোড। এই পর্ব থেকে তড়িৎবিভব উৎপন্ন হয় এবং এই তড়িৎবিভব তরঙ্গের আকারে সমস্ত হৃৎপিণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। আর তখনই সৃষ্টি হয় হৃৎস্পন্দন।

স্পন্দন হার নিয়ন্ত্রিত হয় সমবেদী বা সিমপ্যাথিটিক ও পরা সমবেদী বা প্যারাসিমপ্যাথিটিক ভেগাস নার্ভের দ্বারা। এদের প্রভাব পরস্পর বিরোধী। সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত ও অধিকতর সক্রিয় করে তোলে কিন্তু ভেগাস নার্ভ প্রক্রিয়াকে মন্দীভূত করে। তাই তড়িৎবিভবের উৎপত্তি এবং

তার নিয়ন্ত্রণ হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতাকে আমরা স্বাভাবিক পেসমেকার বলতে পারি। ১৯০৭ সালে কিথ এবং ফ্ল্যাক নামে দুজন শারীরবিজ্ঞানী সাইনোএট্রিয়াল পর্বে তড়িৎবিভবের কথা প্রথম উল্লেখ করেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা অনেক আগে থেকেই হৃদযন্ত্র সম্বন্ধে ভেবে আসছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া অনিয়মিত হলে কঠিন হৃদরোগের সৃষ্টি হয় এবং রোগীকে বাঁচানো যায় না। কিথ এবং ফ্ল্যাকের গবেষণা থেকে যখন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হলো, তখন বিজ্ঞানীরা এগিয়ে এলেন পেসমেকারের বিকল্প অনুসন্ধান করতে। ১৯৫৩ সালে সর্বপ্রথম পেসমেকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হলো। প্রাথমিক সেই পেসমেকারটি ছিল এক্সটারন্যাল পেসমেকার। কঠিন রোগে অথবা কোন দুর্ঘটনায় হৃদযন্ত্রের স্পন্দন অনিয়মিত হলে হৃদযন্ত্রের ভেতরে একটা শিরার সঙ্গে পেসমেকারের নল লাগিয়ে দেওয়া হতো। তাতে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ নিলয়কে উত্তেজিত করতো এবং হৃৎস্পন্দন নিয়মিত হতো।

কিন্তু এই ধরণের পেসমেকারের একটা মস্তবড় অসুবিধা ছিল। এতে হৃৎস্পন্দনের হার সব সময় একই থাকতো—মিনিটে ৭০ বার। ঘুমাতে গেলে স্পন্দনের হার কম হওয়া উচিত এবং ভারি কাজের সময় বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। তা কিন্তু হতে পারতো না এই পেসমেকারের দ্বারা। তাই এই অসুবিধাকে দূর করতে সচেষ্ট হলেন প্রযুক্তিবিদরা। ফলে ১৯৫৮ সালে জার্মানীর "সিমেন্স এলিয়া" নামে একটি কোম্পানী ইনটারন্যাল পেসমেকার আবিষ্কার করেন। ওজন নিতান্ত কম—২৫গ্রাম থেকে ৫৫ গ্রাম। কাঁধের আশেপাশে অথবা পেটের ভেতরে ওকে স্থাপন করে চিকিৎসকরা ভাল ফল পেলেন। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ঐ পেসমেকারই ব্যবহার করা হচ্ছিল। তারপর ঐ বছরই উন্নত ধরণের পেসমেকার আবিষ্কৃত হয়েছে। ওতে প্রয়োজন অনুযায়ী হৃৎপন্দনের হার বাড়ে কিংবা কমে।

পেসমেকার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র। বুকের মাংসপেশীর তলায় বসিয়ে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে সংযুক্ত করা হয় এবং এই যান্ত্রিক ব্যবস্থায় হৃৎস্পন্দন নিয়মিত হয়।

ইণ্টারন্যাল পেসমেকার—যা ১৯৫৮ সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল, তা শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় স্থাপনের সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন আকারের করা হতো। সেই যন্ত্রটি একটা ইলেকট্রোডের বিকশিত রূপ ছাড়া অন্য কিছু নয়। ওকে চালানো হতো পারদ দিয়ে তৈরি এক ধরণের ব্যাটারি দিয়ে। কয়েক বছর পরে ব্যাটারিকে পরিবর্তন করতে হতো। পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত পেসমেকারের জন্য আরও উন্নত ব্যাটারি আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ ব্যাটারি সারা জীবনে পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন হয় না।

বর্তমানের উন্নত পেসমেকার যন্ত্র সব বয়সে এবং সব কাজের বিভাগ অনুযায়ী হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের হার বাড়াতে কিংবা কমাতে সক্ষম হয়েছে।

তবে ওর একটি মাত্র অসুবিধা আছে। রক্তে অক্সিজেনের প্রবাহকে স্বাভাবিক পেসমেকারের মত এতখানি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। হয়ত পরের দিকে তাও সম্ভব হয়ে উঠবে।

স্পেয়ার পার্টস সার্জারী

মনুষ্যদেহের বিকল অঙ্গকে বাদ দিয়ে তার জায়গায় নতুন অঙ্গ সংস্থাপনের যে শল্যচিকিৎসা তাকেই বলা হয় স্পেয়ার পার্টস সার্জারী। চিকিৎসাক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আধুনিক হলেও ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছিল রবার্ট বয়েলের আমলে।

রবার্ট বয়েলের আগে অনুরূপ ব্যবস্থা যে আদৌ ছিলনা এমন নয়। ভারতীয় প্রাচীন শল্যচিকিৎসার গ্রন্থ সুশ্রুত সংহিতাতে চক্ষু অধিরোপনের কথা আছে। এমন কি ঋগ্‌বেদেও কর্তিত অঙ্গের পুনর্গঠনের উল্লেখ দেখা যায়। তবু শরীরের প্রধান প্রধান যন্ত্রপাতি যেমন লিভার, হৃৎপিণ্ড, কিডনী, ইত্যাদির সংযোজন একেবারে নতুন পদ্ধতি।

স্পেয়ার-পার্টস সার্জারী নামকরণের মূলে আমাদের চিরাচরিত প্রযুক্তি-বিদ্যার কথা উল্লেখ করতে হয়! কোন যন্ত্র—তা সে ভারি ইঞ্জিন হতে পারে অথবা সাধারণ ব্যবহার্য আসবাবপত্রও হতে পারে। বিকল হয়ে গেলে বা ব্যবহারের অনুপযোগী হলে পুরোটাকে বাদ না দিয়ে বিকল অংশটুকু বাদ দিয়ে নতুন যন্ত্রাংশকে সংযোজন করা হয়। এতে পুনর্বার কাজের উপযোগী হয় যন্ত্র।

তেমনই মানুষের শরীরও নানা জটিল যন্ত্রপাতি নিয়ে তৈরি। চোখের মত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইন্দ্রিয়, হৃৎপিণ্ড, কিডনী, ফুসফুস এমনকি মানুষের মস্তিষ্ক—সবারই রয়েছে যত জটিল ক্রিয়াকলাপ। এগুলো বিকল হয়ে গেলে মৃত্যু অবধারিত। তাই এই জটিল অঙ্গগুলোকে পরিবর্তন করতে অনেকেই প্রথম থেকে সচেষ্ট ছিলেন। তবে এটা অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে একেবারে আধুনিক কালে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা জটিল অঙ্গগুলোকে সদ্যমৃত মানুষের দেহ থেকে গ্রহণ করে থাকেন এবং অন্যের দেহে অধিরোপন করেন। কারণ, চিকিৎসকরা লক্ষ্য করেছেন, মৃত্যুর কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত অঙ্গগুলো কার্যক্ষম থাকে। ঐটুকু সময়ের মধ্যে যদি মৃতের দেহ থেকে সংগ্রহ করে বিকল অঙ্গবিশিষ্ট অসুস্থ কোন মানুষের দেহে যুক্ত করা যায় তাহলে যে সুস্থ হয়ে উঠবে।

ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ সহজ নয়। একদিকে মৃতদেহ থেকে প্রয়োজনীয় অঙ্গ সংগ্রহ করা যেমন কষ্টকর, অপরদিকে তেমনই রোগীর চাহিদার সঠিক মুহূর্তেও পাওয়া দুষ্কর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃতের আত্মীয় স্বজনরা মৃতের অঙ্গ দান করতে সম্মত হন না আদৌ। তাই শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হলেও চিকিৎসকদের কোন কিছু করার থাকে না। ঠিক সময়ে অঙ্গ না পাওয়া গেলে রোগীকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়।

উপরোক্ত অসুবিধা দূর করতে প্রয়োজনীয় অঙ্গসমূহকে সদ্যমৃতের দেহ থেকে সংগ্রহ করে জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। আবার কোথাও কৃত্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন ডায়ালিসিস করা, পেসমেকার বসানো, ইত্যাদি।

জমিয়ে রাখার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখনও পুরোপুরি সফল হতে পারেন নি। চক্ষুর ক্ষেত্রে অবশ্য পেরেছেন। যার জন্য স্থাপন করা হয়েছে আই ব্যাঙ্ক। অন্যান্য অঙ্গগুলোকে জমিয়ে রাখার পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট আছেন বহু বিজ্ঞানী। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা কিডনীকে ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পেরেছেন। হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির ক্ষেত্রে এতটা সক্ষম হতে পারেননি। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়ে তাঁরা সাফল্য অর্জন করবেন।

অঙ্গ সংরক্ষণ

মানুষের প্রয়োজনীয় অঙ্গ—যেগুলো কোন রুগ্ন দেহে অধিরোপন করা সম্ভব, সেগুলোকে হিমঘরে জমিয়ে রাখার প্রচেষ্টা একেবারে আধুনিককালের। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা আজও তেমন আশার বাণী না শোনালেও তাঁদের চেষ্টার বিরাম নেই। নানা সাধ্যসাধনার পর সদ্যমৃতের দেহ থেকে কোন কোন অঙ্গকে সংগ্রহ করে মাত্র ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পেরেছেন। ভবিষ্যতে সংরক্ষণের সময়কাল আরও বাড়াতে পারবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রচেস্টাটি একেবারে অভিনব। কোন কোন উৎসাহী গবেষক কেবল বিশেষ বিশেষ অঙ্গ নয়, আস্ত মানুষকে আপাততঃ জমিয়ে রেখে পরে তার পুনর্জীবন দানেরও কথা ভাবছেন। যেমন ধরা যাক কোন মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষ—যে আত্মহত্যার মত ঘৃণ্য ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রয়াসী, তাকে যদি সাময়িকভাবে জমিয়ে রাখা যায় তাহলে তার আত্মহত্যার প্রবণতা লুপ্ত হয়ে যাবে। অপরপক্ষে কোন দুরোরোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত মানুষকে আরও কিছুকাল চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য জমিয়ে রাখলে সুফল আসবে। কিংবা প্রাচীন কিমিয়াবিদদের অমৃত অনুসন্ধানের মত মৃত্যুকে কিছুকাল

ফাঁকি দেওয়ার প্রয়াসও বলা যেতে পারে।

এমন অসম্ভব ঘটনা কল্প-বিজ্ঞানের কাহিনীতে শোভা পায় বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু না, বিজ্ঞানীরা আদৌ কল্পনা বিলাসী নন। যদিও বিজ্ঞানীদের অনুরূপ ধারণার মূলে উডি অ্যালেনের "স্লিপার" নামক একটি ছায়াছবির কাহিনী আছে বলে অনেকের ধারণা। কাহিনীর নায়ক জরা ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করতে নিজে অনন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। পরে জেগে ওঠে একেবারে দ্বাবিংশ শতাব্দীতে।

এও সত্য যে, উডি অ্যালেনের গল্পের নায়কের মত দলে দলে মানুষ বৃদ্ধ-বয়সে যদি নিজেদের জমিয়ে রেখে পরে পুনর্জীবন লাভ করেন তাহলে মানব সভ্যতায় এক বিপর্যয় নেমে আসবে। বিজ্ঞানীরাও জানেন সে কথা। তবু এই অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য অনেকে সচেষ্ট আছেন।

মানুষকে জমিয়ে রাখার প্রচেষ্টা আগেও কেউ কেউ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে জন হাণ্টার নামে এক চিকিৎসকের নাম করতে হয়। মরা জীবকে হিমঘরে জমিয়ে রাখাটা কোন ব্যাপারই নয়। কিন্তু জীবন্ত অবস্থায়। জীবন থাকবে অথচ হিমঘরে জমানো অবস্থায়। সম্ভবতঃ জন হাণ্টার জীবন্ত মানুষকে কিছুকাল জমিয়ে রাখার পদ্ধতি আবিষ্কারে যত্নবান হয়েছিলেন অর্থ রোজগারের ধান্দায়। মাছকে নিয়ে দীর্ঘকাল পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এ বিষয়ে কোন তথ্যই তিনি আবিষ্কার করতে পারেননি।

বর্তমানে মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে বরফের ভেতরে জমাট হয়ে থাকা এবং পরে পুনর্জীবন প্রাপ্তির একটি প্রাকৃতিক নজির বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন। মেরু দেশে—যেখানে বছরের একটা দীর্ঘসময় বরফে বরফে আচ্ছাদিত থাকে, সেখানে কয়েক প্রজাতির ব্যাঙ এমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও বাস করে। ভারি অদ্ভুত ঐ ব্যাঙরা। শীতকালে ওরা শীত ঘুম দেয় ঐ বরফের চাঁইর ভেতরে। যখন শীতঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তখন তাদের দেহে প্রাণ আছে কিনা বাহির থেকে বোঝা যায় না। কিন্তু বরফ গলে গেলেই দিব্য প্রাণ ফিরে পায়। খায়, দায়, লাফায়, বংশবিস্তার করে। আবার শীতের প্রাক্কালে শীত ঘুমের জন্য প্রস্তুত হয়।

মেরুদেশের সেই সব ব্যাঙদের কাণ্ডকারখানা জীববিজ্ঞানীদের বিস্মিত করে ঃ তাঁরা সেই সব ব্যাঙদের ল্যাবোরেটারিতে এনে রীতিমত পরীক্ষাও করেছেন। দেখেছেন, মাইনাস আট ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডেও ওদের মৃত্যু হয় না। অথচ অন্য কোন জীব এত ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না।

বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তাঁরা স্থির করেছেন, ওদের দেহের গঠনটা এমনই যে, দীর্ঘকাল বরফের তলায় অবস্থান করা সত্ত্বেও দেহ কোষের অভ্যন্তরে কিছুতেই বরফ জমতে পারে না। বরফটা জমে কেবল কোষের বাহিরের দিকটায় এবং রক্তেও। উক্ত কারণে তাদের দেহ কোষগুলোর প্রাচীর আদৌ

নষ্ট হতে পারে না।

অপরদিকে রক্তটা জমাট বাঁধার দরুন শীতঘুমের সময় দেহে রক্ত চলাচলের কাজ পুরোপুরি বন্ধ থাকে, এটিও একটা তাজ্জব ব্যাপার। রক্ত চলাচল না হলে কোষে কোষে অক্সিজেন সরবরাহ হতে পারে না। এমন ক্ষেত্রে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। তবু ওরা বেঁচে থাকে এবং বেঁচে থাকে মাসের পর মাস। আশ্চর্য ও অভিনব এক ব্যবস্থা বটে।

তুষার ব্যাঙদের জীবন ধারণের ঐ আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্যের কিছুটা হদিস অবশ্য বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন! পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন, শীতঘুম দেওয়ার সময় হলে ওদের রক্তে প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। অবশ্য এমন অবস্থা মানুষের দেহে ঘটালে চরম অবস্থার সৃষ্টি হতো। কিছুতেই বাঁচতে পারতো না মানুষ। কিন্তু ওরা বাঁচে। বাঁচিয়ে রাখে ঐ গ্লুকোজ, যা মানুষের বেলায় অতি ভয়াবহ। ব্যাঙদের দেহে শীতঘুমের সময় প্রচুর গ্লুকোজ উৎপন্ন হওয়ায় ওদের কোষগুলোকে খাদ্যের অভাবে মরতে হয় না। অপরদিকে গ্লুকোজ দেহস্থ প্রোটিনের কাজকর্মে বাধা দেয় বলে কোষের উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বজায় থাকে।

ঐ গ্লুকোজ ব্যাঙদের দেহে আর একটি আশ্চর্য ক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। ঐ ক্রিয়ার ফলে কোষগুলোর ভেতরে বরফ জমতে পারে না। উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথেই দ্রুত কোষের অভ্যন্তরে সঞ্চারিত হয়। যেহেতু গ্লুকোজ জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়, তাই কোষ মধ্যস্থ জলে মিশে যেতে ওদের কোন অসুবিধা হয়না। উক্ত অবস্থায় কোষের ভেতরে যে দ্রবণ উৎপন্ন হয় তার হিমাঙ্ক জলের হিমাঙ্ক তথা শূন্য ডিগ্রী তাপমাত্রা অপেক্ষা কম। তাইতো কোষ মধ্যস্থিত জল সহজে কঠিন বরফে পরিণত হতে পারে না। এবং এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে যায় তুষার ব্যাঙদের শীতঘুম দেওয়ার পূর্বাহ্ণে।

মেরু দেশের তুষার ব্যাঙদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এ বিষয়ে মনে হয় প্রথম গবেষণা করেন বিজ্ঞানী সীগ্যাল এবং বিজ্ঞানী স্টানবার্গ। কিন্তু তাঁরা কোন সুবিধা করতে পারেন নি। ইঁদুরকে নিয়েই শুরু করেছিলেন গবেষণা। সবক'টি ইঁদুরকে মরতে হয়েছিল।

সীগ্যাল ও ষ্টানবার্গের পরে গবেষণা হয় কালিফোর্ণিয়ার বার্কলে গবেষণাগারে। এইখানে গবেষকরা একটা কুকুরকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে জীবিতাবস্থায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল জমিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। এক ঘণ্টা পরে তাকে জীবনদানও করেছিলেন।

সময়কালটা যদিও নিতান্ত কম, তবু বিজ্ঞানীদের কাছে এটি একটি বিরাট সাফল্য। এক ঘণ্টা ধরে হিমশীতল পরিবেশে জীবনকে ধরে রাখা—কম কথা নয়। আর ঐ কারণে সেদিন কুকুরটির নামকরণ করা হয়েছিল "ডিপফ্রীজ জন"। গবেষকরা মনে করছেন, উপরোক্ত সূত্রকে অবলম্বন করে গবেষণা

করলে অদূর ভবিষ্যতে সময় সীমা আরও বাড়াতে পারবেন। শুধু জীব-জন্তুদের ক্ষেত্রে নয়, মানুষের বেলায়ও।

বিজ্ঞানীরা আশাবাদী। বর্তমানে পুরো একটা জীবকে হিমঘরে জমিয়ে রাখার প্রচেষ্টার পরিবর্তে জীবের শুক্রাণু ও ডিম্বাণুকে জমিয়ে রেখে দীর্ঘ-কাল সংরক্ষণ করা যায় কিনা—সেই কথাই বেশি করে ভাবছেন। তাঁদের ধারণা, আপাততঃ এই ব্যবস্থাটা কার্যকর হলে ভবিষ্যতে কোন জীবকে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতে হবেনা।

বিজ্ঞানের এই শাখাটি তথা আস্ত জীব থেকে শুরু করে জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শুক্রাণু, ডিম্বাণু ইত্যাদিকে সংরক্ষণ করার গবেষণা আজ বিজ্ঞানী-দের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বহু বিজ্ঞানী লিপ্ত হয়েছেন এই গবেষণায়। তাই জীববিজ্ঞানের একটি নতুন শাখাও গড়ে উঠেছে। ঐ শাখাটির নামকরণ করা হয়েছে ক্রায়োনিক্স—যার অর্থ অধিরোপন যোগ্য অঙ্গ-সমূহকে জমিয়ে সংরক্ষণ করার বিজ্ঞান।

অস্ত্রোপচারের আধুনিক যন্ত্রপাতি

মানুষের বোধশক্তি পরিবেশের অপরাপর জীবজন্তুদের তুলনায় অনেক—অনেক বেশী উন্নত। মৃত্যু তার কাছে একটা আতঙ্ক—মরতে কেউ চায়না। তথাপি জীবনের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যুকে কেউ আটকাতেও পারেনা। হয়ত চিরকাল এই সুন্দর পৃথিবীর জল হাওয়াকে ভোগ করার পরিকল্পনা করেছিলেন কিমিয়াবিদরা। তাঁরা ব্যর্থ। আজকের উন্নত বিজ্ঞান অমৃতের খোঁজ অবশ্য করেনা। তবু পরিণত বয়সে যাতে মৃত্যুকে বরণ করতে পারে এবং পরমায়ুকে যাতে আরও কিছুটা বাড়াতে পারে তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। যদিও এ প্রচেষ্টা অতি প্রাচীনকালেই ছিল। তা নাহলে সে আমলে চিকিৎসাশাস্ত্র গড়ে উঠতোনা।

মানুষকে দীর্ঘায়ু দান করার জন্য প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রথম দু—ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল। কায়চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা। দেহাংশের সমূহ ত্রুটিকে ওষুধের দ্বারা সারানো যায় না। তাই শল্য-চিকিৎসার উদ্ভব হয়েছিল এবং এ বিষয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানী সুশ্রুতই কালজয়ী খ্যাতি লাভ করেছিলেন খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ৫০০ বছর আগে। তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ সুশ্রুত সংহিতায় নানা ধরণের যন্ত্রপাতির বিবরণ আছে। তবে চেতনা নাশক পদার্থের কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

সুশ্রুতের আমল থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের হাতে এসেছে উন্নত মানের চেতনা নাশক দ্রব্য, ওষুধ ও নানা ধরণের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। তাই শল্যচিকিৎসা এখন অনেকখানি সহজ হয়েছে এবং যন্ত্রণাবিহীন অবস্থায় কিডনী, চক্ষু, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে নতুন অঙ্গ যোজনা করা হচ্ছে। এমনকি মাথার খুলির ভেতরে ব্রেনেও হচ্ছে অস্ত্রোপচার। আলট্রাসনিক লেসার প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে শরীরের আভ্যন্তরীণ বিকল যন্ত্রপাতি, ক্ষত, টিউমার প্রভৃতিকে সনাক্ত করতে পারছেন। তার উপর বর্তমানে আবার কম্পিউটারকে কাজে লাগানো হচ্ছে। বিজ্ঞানের সব শাখা আজ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। চিকিৎসাবিজ্ঞান তাই আজ এক বিস্ময় এবং এই বিস্ময় প্রধানতঃ শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে।

শল্যচিকিৎসার উন্নতির মূলে আছে কাটা ছেঁড়া করার যন্ত্রগুলোর অভাবনীয় উন্নতি। দীর্ঘকাল তীক্ষ্মধার ছুরি, কাঁচি ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। এখন তার স্থান গ্রহণ করতে চলেছে জেটনাইফ।

জেট নাইফের আবিষ্কারক কয়েকজন মার্কিন শল্যচিকিৎসক। শরীরের কোন অংশে বড় রকমের অস্ত্রোপচার করতে গেলে চিকিৎসকদের বিব্রত হতে হয় রক্তপাত বন্ধ করার জন্য। প্রচুর রক্তপাতও ঘটে। তাই অস্ত্রোপচারের সময় রক্তদানের ব্যবস্থাও রাখতে হয়। ফলে অস্ত্রোপচার করতে গেলে শুধু রক্তপাত বন্ধ করতেই কেটে যায় সময়ের একটা বড় অংশ।

শল্যচিকিৎসকরা তাই চিন্তা করতে থাকেন, বিনা রক্তপাতে অস্ত্রোপচার করা যায় কিনা! তাহলে সময়ও বাঁচবে এবং রোগীর অযথা রক্তপাত ঘটবেনা।

তাঁদের সেই চিন্তারই ফলশ্রুতি জেটনাইফ। আসলে জেটনাইফ বিশেষ উপায়ে নির্মিত কোন ছুরি নয়। ছুরির মত কাটা ছেঁড়া করতে পারে বলে অনুরূপ নাম। এটি একটি নলের মত জিনিস এবং অগ্রভাগ জেটের মত ছুঁচালো। সেই ছুঁচালো অগ্রভাগে অতি সূক্ষ্ম একটা ছিদ্র থাকে। অস্ত্রোপচারের সময় যেখান থেকে বার করানো হয় উচ্চ তাপমাত্রার তীব্র গ্যাস প্রবাহ। যে জায়গায় অস্ত্রোপচার করা হবে তারই উপরে অতি অল্পক্ষণ ধরে রাখলে মাংসপেশী তো বটেই, হাড়ও কেটে যায়। কাটার সময় যেটুকু রক্ত বেরিয়ে আসে তা উচ্চ তাপমাত্রায় শুকিয়ে কাটা অংশের দুপাশে জমাট বেঁধে যায়। ফলে রক্ত বার হতে পারে না। কাটাও যায় অতি সূক্ষ্মভাবে।

মার্কিন শল্যচিকিৎসকরা এই ধরণের আরও একটি উন্নত অস্ত্র আবিষ্কার করেছেন। নাম লেসার নাইফ। অস্ত্রটি পূর্বের অনুরূপ। তবে এতে উত্তপ্ত গ্যাস প্রবাহের পরিবর্তে লেসারের সাহায্যে তীব্র আলোকরশ্মিকে পাঠানো হয়। নামটা তাই লেসার নাইফ। এতে শল্যচিকিৎসকরা শরীরের

ক্যানসার দুষ্ট কোষগুলোকে অতি সহজে কেটে বাদ দিতে পারেন এবং অনুরূপ অস্ত্রোপচারে সুস্থ কোষগুলোর কোন ক্ষতি হয় না।

তীব্র আলোক রশ্মি এবং উত্তপ্ত গ্যাস প্রবাহের পরিবর্তে জেট নল দিয়ে অতি শীতল কোন তরলকে পাঠিয়ে পূর্বের মত অস্ত্রোপচারের আর এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন নিউইয়র্কের এস, কুপার নামে জনৈক শল্য-চিকিৎসক। এতে সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় মাইনাস ১৮০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার তরল নাইট্রোজেন। তরল নাইট্রোজেন-গতিবেগের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণও করা যায়। অতি শীতল পদার্থ ব্যবহার করা হয় বলে যন্ত্রটির নাম আইস নাইফ।

আইস নাইফের সাহায্যে অস্ত্রোপচার করলে রোগী আদৌ যন্ত্রণা অনুভব করে না। মস্তিষ্কের টিউমার অপসারণে এই পদ্ধতি বেশ ভাল ফল প্রদান করে। প্রথমে মাথার খুলিতে ছিদ্র করে দেওয়া হয়। তারপর ছিদ্রপথে তীব্রবেগে প্রেরণ করা হয় অতি শীতল নাইট্রোজেন। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় গোটা টিউমারটাই ধ্বংস হয়ে যায়। কাঁটা ছেঁড়া করতে হয়না। ধ্বংসপ্রাপ্ত টিউমারের অবশেষ শরীর তার নিজের নিয়মে অপসারিত করে ফেলে।

এবার শরীরের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা টিউমারের কথায় আসা যাক। ভেতরের টিউমারের অস্তিত্ব সহজে ধরা পড়ে না। ডাক্তারদের সন্দেহ হলে সন্দেহযুক্ত স্থানটাকে কেটে দেখতেন প্রকৃত টিউমার গজিয়ে উঠেছে কিনা এবং টিউমারের চরিত্রটা কেমন! এটি বেশ যন্ত্রণাদায়ক ব্যবস্থা পরের দিকে লেসারের সাহায্যে ত্রিমাত্রিক ফটো গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয় এবং ব্রেন ইত্যাদিকে স্ক্যান করারও ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এগুলো যন্ত্রণাদায়ক না হলেও খরচ বহুল অপরদিকে টিউমার ধরা পড়লে টিউমার থেকে অল্প মাংস কেটে নিয়ে পরীক্ষা করা হতো—টিউমার ক্যানসারে রূপান্তরিত হয়েছে কিনা। এই পদ্ধতি আজও আছে এবং এর অসুবিধাও বড় কম নয়। যদি ক্যানসারের রূপ নিয়ে থাকে তাহলে মাংস কেটে নেওয়ার পর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং কাটতে গেলে অস্ত্রোপচারের ব্যথা রোগীকে সহ্য করতে হয়। তবে এমন ক্ষেত্রে রেডিও আইসোটোপেরও ব্যবহারের সুযোগ আছে।

বর্তমানে এক অভিনব উপায়ে টিউমারকে সনাক্ত করা হচ্ছে। এটি উন্নত পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতিতে আলট্রাসনিকসের ব্যবহার করা হয়। কাণে শোনা যায় না এমন উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দকে শরীরের সন্দেহমূলক জায়গায় পাঠানো হয় এবং যন্ত্রের সাহায্যে ওর প্রতিধ্বনিকে পরীক্ষা করা হয়। রেডিও আইসোটোপ অপেক্ষা অনেক ভাল এবং নিরাপদ এই ব্যবস্থা। কারণ, রেডিও আইসোটোপ ব্যবহার করলে তেজস্ক্রিয়তার দরুন শরীরের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আলট্রাসনিকের বেলায় সে সম্ভাবনা আদৌ নেই। লিভার, প্লীহা, কিডনী ইত্যাদি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি অনন্য পদ্ধতি। হৃৎপিণ্ডের রোগ নির্ণয়ে আলট্রাসনিক

ক্যামেরারও আবিষ্কার হয়েছে। মস্তিষ্কের রোগ নির্ণয়েও আলট্রাসনিক ব্যবহার করে ভাল ফল পাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

আরও আরও উন্নত যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য এখনও বিজ্ঞানীরা গবেষণায় রত। ভবিষ্যতে আরও কত অত্যাশ্চর্য যন্ত্র আবিষ্কার হবে—তা ভাবী-কালের চিকিৎসকরাই বলতে পারবেন।

অস্থির বিকল্প

দেহের অকেজো অঙ্গকে মেরামত করে পুনরায় সচল করার চেষ্টা আজকের নয়—বহু কাল আগের। মেসিনের যন্ত্রাংশ খারাপ হয়ে গেলে খারাপটাকে সরিয়ে ফেলে নতুন যন্ত্রাংশ পরিয়ে দিলে সচল হয়। সামান্য কারিগরও এ ব্যবস্থা করে নেন। কিন্তু মানুষের শরীরটা তো আর মেসিনের মত নয়! সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ জৈব বস্তু। এমনকি নিষ্প্রাণ বলে যাকে মনে হয় সেই ভ্রূণেরও জীবন আছে। অসংখ্য কোষ দিয়ে গড়া একটি কলাতন্ত্র। মেসিনের যন্ত্রাংশের মত-হুট করে পাল্টানো যায় না। গেলেও সেই জৈব-বস্তুকে তৈরি করাও সম্ভব নয়।

হাড় ভাঙ্গে। জোর আঘাত লাগলে ফেটেও যায়। তবে জৈব বস্তু বলে নিজের নিয়মে সে জোড়াও লেগে বায়। তার জন্য ক্ষত স্থান যাতে কিছুদিন পুরোপুরি বিশ্রামে থাকতে পারে তার জন্য প্লাস্টারের ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু শরীরের এমন বিশেষ বিশেষ হাড় আছে, যেখানে প্লাষ্টার করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে? তাছাড়া হাড়ের অন্য কোন ত্রুটিতে—যেখানে প্লাস্টার কার্যকর হবেনা বলে চিকিৎসকরা মনে করেন, তার বেলায়!

এমন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা আজকাল ক্ষতস্থানের হাড়ের উপর ধাতব পাত পরিয়ে দিয়ে আঁটিয়ে রাখার ব্যবস্থা করছেন। এই পরিকল্পনাটা প্রথম শল্য চিকিৎসক ডাঃ হানসম্যানের। ১৮৮৬ সালে তিনিই প্রথম হাড়ের বিকল্প খুঁজতে গিয়ে ধাতব পাতকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তৈরি করেছিলেন বোন প্লেট।

হানসম্যান বোনপ্লেট-তৈরি করেছিলেন বটে কিন্তু-রোগীর দেহে প্রয়োগ করে আদৌ সফল হতে পারেননি। তবে তাঁর-পরিকল্পনাটা অনেককে অনুপ্রাণিত করেছিল। ফলে অনেকেই তৈরি করেছিলেন বোনপ্লেট এবং হাড়ের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ক্ষত হাড়কে জোড়া দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ল্যাম্বোট। ১৯০৯ সালে উন্নত মানের বোনপ্লেট তৈরি করে

তিনি বেশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। ল্যাম্বোটের পদ্ধতি আরও উন্নত করেছিলেন শেরম্যান ও লেন নামে আরও দুজন শল্যচিকিৎসক। যার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে-ধাতব বোনপ্লেট বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, সে সময় পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশ হামেশাই বোনপ্লেট ব্যবহার করতেন।

সাময়িকভাবে রোগী অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করলেও পরের দিকে বোনপ্লেট ব্যবহারকারীরা যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে লাগলেন। প্রকাশ পেতে লাগলো নানা ধরণের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া। কখনও কখনও রোগীর ক্ষতস্থান বিষিয়ে উঠে রোগীকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকেও ঠেলে দিত। অপর দিকে মেরামতের কাজ যতই নিখুঁত হোকনা কেন, হাড় ধাতব প্লেটকে ঠিক ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারতো না। তাছাড়া ঘর্ষণের ফলে হাড়ের ক্ষয়ও হতো।

উপরোক্ত অসুবিধাগুলোকে দূর করতে পুনরায় শুরু হলো গবেষণা। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, জীবাণু সংক্রমণের ফলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। পেনিসিলিন আবিষ্কার হতেই বিজ্ঞানীরা ভরসা পেলেন। পেনিসিলিনের কৃপায় জীবাণু সংক্রমণ রুদ্ধ হলো বটে, কিন্তু হাড়ের ক্ষয়! ওকে রোধ করা যাবে কেমন করে?

পুনরায় শুরু হলো গবেষণা। ক্ষয় নিরোধক ধাতু বা ধাতু সংকর চাই। এটা ওটা নানা ধাতু ও সংকরকে নিয়ে চললো পরীক্ষা। অবশেষে তাঁরা বুঝতে পারলেন, এ ব্যাপারে স্টেনলেস স্টীল এবং ভিটালিয়ানই বিশেষ উপযোগী। এদের সঙ্গে হাড়ের বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়না। যদি বা হয় তা অতি অল্প। ১৯৫২ সালে কুসার নামে এক শল্য চিকিৎসক অনুরূপ পাত গ্রহণ করেন। তারপর পায়ের হাড়ের সঙ্গে পাতদুটোকে আচ্ছা করে পেরেক দিয়ে আঁটিয়ে দিলেন। পরের বছর এগারস নামে এক শল্য চিকিৎসক পেরেকের পরিবর্তে স্ক্রু দিয়ে আঁটালেন।

এবার দেখা গেল, পেরেক অপেক্ষা স্ক্রুই অধিক কার্যকর হলো। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তখন ঐ স্ক্রুকে নিয়েই শুরু করলেন ভাবনা চিন্তা। এক নতুন ধরণের স্ক্রু আবিষ্কার করে চিকিৎসা বিজ্ঞানী-ডেনিস উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করায় বেশীর ভাগ শল্য চিকিৎসক-ডেনিস আবিস্কৃত স্ক্রুকেই গুরুত্ব দিলেন। ঐ স্ক্রু দিয়ে বোনপ্লেটদ্বয়কে যুক্ত করার ফলে হাড়ের ভাঙ্গা অংশগুলোর ভেতরে যে চাপ সৃষ্টি হলো তাতে হাড়ের জোড়া লাগা আরও সহজ হলো। কিন্তু গবেষণা বন্ধ হলো না। চাই আরও ভাল প্লেট এবং ভাল স্ক্রু। শেষে ১৯৬১ সালে শল্য চিকিৎসক মুলার তৈরি করেন এক বিশেষ ধরণের বোন প্লেট এই প্লেট পূর্বের আবিষ্কৃত সমূহ প্লেট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হাওয়ায় পরিচিত হলো "মুলারের প্লেট" নামে। চিকিৎসকদের বহু দিনের আশা এতদিনে সফল হলো।

বর্তমানে ধাতব প্লেট বড় একটা ব্যবহার করা হয় না। ধাতব প্লেটের স্থান দখল করেছে কারবন ফাইবার প্লেট, গ্লাস ফাইবার প্লেট ইত্যাদি। ধাতুর ক্ষেত্রে

কমবেশী বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করায় এ জাতীয় প্লেটের উদ্ভব। তবে এইসব প্লেটও সম্পূর্ণ নির্দোষ কিনা—যে বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

রক্তের জমাট বাঁধা

রক্ত তরলপদার্থ। তরল অবস্থাতেই সে সবসময় নিরবচ্ছিন্নভাবে রক্ত জালিকার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতে আছে। তাই কোথাও কেটে গেলে রক্ত পাত ঘটে। কিন্তু রক্তপাত দীর্ঘস্থায়ী হয়না। অল্পসময়ের ভেতরে রক্তটা জমাট বেঁধে থকথকে জেলির মত পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং রক্তপাত বন্ধ হয়।

রক্তের ঐ বৈশিষ্ট্যটুকু লক্ষ্য করে বহু শারীরবিজ্ঞানী চিন্তাভাবনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ম্যালীপিখি নামে এক বিজ্ঞানী ছিলেন অন্যতম। তিনি ১৬৬৬ সালে জমাট বাঁধা রক্তকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করেছিলেন। দেখতে পেয়েছিলেন, জমাট বাঁধা রক্তের ভেতরে কতকগুলো তন্তুময় জালিকা অবস্থান করছে। ঐ জালিকাগুলো যে প্রকৃতপক্ষে কী—তা তিনি নির্ণয় করতে পারেননি। ধরে নিয়েছিলেন, এই প্রক্রিয়া রক্তের একটা স্বাভাবিক ধর্ম।

ম্যালপিঘির পরীক্ষার কথা শুনে অনেকেই পরীক্ষাটি হাতেনাতে করে দেখেছিলেন এবং কারণ নির্ণয়ে যত্নবান হয়েছিলেন। অনেকে অনেক ব্যাখ্যাও প্রদান করেছিলেন। কিন্তু সে ব্যাখ্যাগুলো সবাই স্বীকার করে নিতে পারেননি।

পরবর্তীকালে জমাট বাঁধা রক্তকে নিয়ে আরও অনেক পরীক্ষা হয়েছিল। তাতে অনেকে স্থির করেন, রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষেত্রে শ্বেত কণিকা এবং লোহিত কণিকারা কোন ভূমিকা পালন করেনা। একমাত্র অনুচক্রিকারাই একাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে।

১৯০৫ সালে মোরাউইজ নামে এক বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন, রক্তের জমাট বাঁধার ব্যাপারে একমাত্র ক্যালসিয়াম আয়নই মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে এবং তিনিই প্রথম রক্তের জমাট বাঁধার ব্যাপারে একটি মতবাদ খাড়া করেন। সেই মতবাদ অনুযায়ী রক্তের মধ্যে থাকে প্রোথ্রম্বিন, ক্যালসিয়াম আয়ন এবং ফ্রাইবিনোজেন। শরীরের ভেতরে শিরায় শিরায় রক্ত যখন প্রবাহিত

হতে থাকে তখন হেপারিন নামে বিশেষ একটি উপাদান প্রোথ্রম্বিনের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এবং হেপারিনই স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তকে জমাট বাঁধতে বাধা প্রদান করে। কোন কারণে ক্ষত সৃষ্টি হলে এবং ক্ষত স্থান থেকে রক্ত বাহিরে-বেরিয়ে আসতে শুরু করলে সেখানকার বিনষ্ট অনুচক্রিকা এবং বিনষ্ট কলাকোষগুলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করে ফেলে থ্রম্বোপ্লাস্টিন নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ। সেই থ্রম্বোপ্লাস্টিন ক্যালসিয়াম আয়নের সহায়তায় প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে রূপান্তরিত করে। অপরদিকে রক্তের ফ্লাইব্রিনোজেনকে রূপান্তরিত করে দেয় ফাইব্রিনে। ঐ ফাইব্রিন অনেকটা সূক্ষ্ম জালিকার মত। ঐ জালিকায় লোহিত কণিকা ও শ্বেত কণিকারা জড়িয়ে পড়ে এবং রক্ত জমাট বেঁধে যায়।

মেরাউইনের মতবাদকে নিয়ে এবার শুরু হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ১৯৩১ সালে হাওয়েল নামে এক বিজ্ঞানী প্রোথ্রম্বিন সম্বন্ধে একটা নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। তিনি মন্তব্য করেন, রক্তের মধ্যে অবস্থানকরী প্রোথ্রম্বিনরা দু-রকমের। প্রোথ্রম্বিন A এবং প্রোথ্রম্বিন B। হেপারিন ছাড়া রক্তকে জমাট বাঁধতে বাঁধা দেয় এমন আরও কয়েকটি পদার্থের উল্লেখ করেন তিনি। তাদের মধ্যে হিরুডিন ও অক্সালেট অন্যতম।

হলওয়েলের মতবাদ অনুযায়ী প্রোথ্রম্বিন A, প্রোথ্রম্বিন B এবং ক্যালসিয়াম আয়নের দ্বারা উৎপন্ন থ্রম্বিন ফাই-ব্রিনোজেনের সঙ্গে-ক্রিয়ার ফাইব্রিন তন্তুজাল গঠন করে।

হলওয়েলের মতবাদের পরেও বহুবিজ্ঞানী রক্তের জমাট বাঁধার কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। গবেষকদের মধ্যে বিজ্স, ডাভি, র‍্যাটনফ, ম্যাক-ফারলন, ক্যাসকেড প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করার মত। সুদীর্ঘ গবেষণার পর ১৯৫৭ সালে ম্যাকফারলন এবং ক্যাসকেড একত্রে গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করেন, রক্তের জমাট বাঁধার ব্যাপারটা উৎসেচক সক্রিয় রাসায়নিক পর্যায়ক্রম ছাড়া অন্য কিছু নয়। রক্তপাত ঘটলে প্রতি মুহূর্তে এক একটা নিষ্ক্রিয় উৎসেচক সক্রিয় উৎসেচকে রূপান্তরিত হয়। এই মতবাদটি আবিষ্কারকদের নামানুসারে ম্যাকফারলন ক্যাসকেড মতবাদ নামে পরিচিত। একে জলপ্রপাত মতবাদও বলা হয়। ম্যাকফারলনদের পরে ১৯৬৫ সালে রট নফ এবং ড্যাম্ভি নামে দুজন বিজ্ঞানী আরও গবেষণা করেন এবং উপরোক্ত মতবাদটিকে স্বীকার করে নেন। তবে একথাও উল্লেখ করেন যে, রক্তের জমাট বাঁধা প্রক্রিয়াটা স্ব-আশ্রয়ী এবং পরাশ্রয়ী দু ধরণের প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়।

আকুপাংচার

আকুপাংচার হচ্ছে এক বিশেষ ধরণের সরল শল্যচিকিৎসা পদ্ধতি। ইনজেকশন দেওয়া সূচের চেয়েও অনেক-অনেক সরু এবং বিভিন্ন মাপের সূচ শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে ফুটিয়ে রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

আকুপাংচারের মূল উদ্দেশ্য ওর নামের ভেতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। ল্যাটিন 'অ্যাকাস' এবং ইংরেজী 'পাংচার' শব্দ যোগে আকুপাংচার। অ্যাকাস অর্থে সূচ এবং পাংচার অর্থে ছিদ্র করা। যদিও এই চিকিৎসাপদ্ধতি অতি পুরাতন। সম্ভবতঃ খৃীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে চীন দেশে ওর প্রচলন হয়েছিল এবং সেই থেকে চীনের মধ্যে চিকিৎসাপদ্ধতিটি সীমাবদ্ধ ছিল। বিংশ শতাব্দীতেই চিকিৎসকরা চীনের ঐ প্রাচীন পদ্ধতিটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন এবং ওর উপযোগিতা সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করেন। অনেক গবেষণার পর তাঁরা বুঝতে পারেন, আকুপাংচার পদ্ধতি—তথা রোগীর লোমকূপে সূচ ফুটিয়ে রোগ দূর করার পদ্ধতি নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক নয়। পদ্ধতিটিকে সুষ্ঠু-ভাবে প্রয়োগ করতে পারলে বহু জীবাণু ও ভাইরাস ঘটিত রোগের উপশম হতে পারে।

উক্ত পদ্ধতিতে শরীরের কোন কোন অংশে সূচ ফোটানো হবে, তা আগে থেকে নির্ধারণ করা হয়। অংশগুলোকে বলা হয় আকুপাংচার পয়েণ্ট। বর্তমানে চিকিৎসকদের প্রচেষ্টায় বেশ কয়েক'শ আকুপাংচার পয়েণ্ট আবিষ্কৃত হয়েছে এবং চিকিৎসা পদ্ধতিটিরও উন্নতি ঘটেছে।

আকুপাংচারের উন্নতির মূলে বর্তমানের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা। বিজ্ঞানীদের মতে দেহে যে স্বাভাবিক রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বিদ্যমান, তাকেই কাজে লাগানো হয় আকুপাংচার পদ্ধতির মাধ্যমে। অর্থাৎ উক্ত পদ্ধতির সাহায্যে রোগ প্রতিহত করার ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলা হয়। সূচ ফুটিয়ে উদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে।

বিজ্ঞানীরা আরও লক্ষ্য করেছেন, আকুপাংচার পদ্ধতির সঙ্গে অপরাপর চিকিৎসা পদ্ধতির কোন বিরোধ নেই। তাই অনেকের প্রচেষ্টায় নানা ধরণের আকুপাংচার পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে। সেইসব পদ্ধতির মধ্যে ইলেকট্রো-পাংচার অন্যতম। এই পদ্ধতিতে সূচের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ পাঠানো হয়। আবার কখনও কখনও সূচ ব্যবহার না করে কেবলই পাঠানো হয় বিদ্যুৎ প্রবাহকে। আকুপাংচার পয়েণ্ট উদ্দীপনা জাগাতে অনেকে লেসার রশ্মিকেও ব্যবহার করছেন। এই পদ্ধতির নাম লেসার পাংচার! আবার কোন কোন চিকিৎসক সূচের মাধ্যমে শব্দোত্তর তরঙ্গকেও ব্যবহার করছেন।

তবু বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, আকুপাংচারের ফলে দেহে কিছু কিছু বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়াও হয়ে থাকে (সব ক্ষেত্রে নয়)। অপরদিকে উক্ত পদ্ধতি প্রয়োগে যে প্রক্রিয়ায় রোগ নিরাময় হয় সেই প্রক্রিয়ার যথাযথ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। যদিও অনেকে অনেক রকমের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। উক্ত কারণে আকুপাংচার সম্বন্ধে এখনও বিজ্ঞানীরা গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি বহু দেশের বিজ্ঞানী লিপ্ত আছেন উক্ত গবেষণায়।

এইডস রোগ

এইডস নামক রোগটির সঙ্গে অতি সাম্প্রতিককালে মানুষের পরিচয়। কিন্তু রোগটির প্রাদুর্ভাব আজকের নয়। আফ্রিকার তানজানিয়া, কেনিয়া, উগাণ্ডা, জাইতি প্রভৃতি অঞ্চলের বাসিন্দারা দীর্ঘকাল এই রোগ ভোগ করে আসছে এবং বহুজনে এই রোগের শিকার হয়েছে। সভ্যসমাজ থেকে আফ্রিকা দীর্ঘকাল দূরে থাকায় ঐ রোগটি সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে পূর্বে কোন পরিচয় ঘটেনি।

আফ্রিকা সভ্য মানুষের সংস্পর্শে এসে যাওয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে ছুটেছিলেন সুযোগসন্ধানীরা। সেদিন বিভিন্ন অঞ্চলে গঠিত হয়েছিল উপনিবেশ। পাশ্চাত্যের মানুষ সেইসব উপনিবেশ থেকে একদিকে যেমন বহন করে আনলেন প্রভূত সম্পদ, অপরদিকে সঙ্গে করে আনলেন একটি দুরারোগ্য ব্যাধিকে। হ্যাঁ, প্রাকৃতিক নিয়মে ভালর সঙ্গে খারাপটা যেমন মিশে থাকে। অমৃতের সঙ্গে গরলের মত।

বিশেষ করে মার্কিনরা—যাঁরা হাইতি অঞ্চলে যাতায়াত করতেন তাঁদের মধ্যেই প্রথম রোগটির লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। রোগের লক্ষণ ছিল পেটের গোলমাল, পায়খানার সঙ্গে রক্তপড়া, শুকনো খকখকে কাশি হওয়া, বগল ও কুচকি ফুলে ওঠা, রাতে শরীর থেকে অঝোরে ঘাম ঝরা, সপ্তাহব্যাপী জ্বর না কমা এবং পরের সপ্তাহে জ্বর না আসা, মুখে ও দাঁতে কালো কালো দাগ ধরা, নখ ও চুলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়া, ইত্যাদি যত অদ্ভুত অদ্ভুত উপসর্গ। আকস্মিকভাবে রোগী মারাও যেতো।

এই রোগ অত্যন্ত ছোঁয়াচে। উপনিবেশিকরা—যাঁরা বাণিজ্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পোন্নত নগরীতে যাতায়াত করতেন, তাঁদের কাছ থেকে ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীর শিল্পনগরীগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। আরও

দেখা গেছে, পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদের মধ্যেই রোগটির প্রকোপ বেশী। অনেকের বিশ্বাস, অস্বাভাবিক যৌন বিকৃতি রোগটির সংক্রমণের মূলে দায়ী এই কারণে শিশু, কিশোর, বয়স্ক সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

ভয়ংকর এই রোগটির জন্য প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই গবেষণা শুরু করেছিল। ১৯৮৪ সালে মার্কিন গবেষক রবার্ট সি. গ্যালো রোগীর দেহে লাভ করেন এক জাতীয় ভাইরাস। উক্ত ভাইরাসের সঙ্গে জীবাণুতত্ত্ববিদদের ধারণা না থাকায় গ্যালোই ভাইরাসটির নামকরণ করেন "হিউমেন টি সেল লিম্ফোট্রপিক ভাইরাস—টাইপ থ্রি"। সংক্ষেপে HTLY—3। রোগটিরও তখন নামকরণ করা হলো "অ্যাকোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম"। দাঁতভাঙ্গা এই নামটির সংক্ষিপ্ত নাম এইডস (AIDS)! বলাবাহুল্য রোগটির নামের আদ্যক্ষরগুলোকে একত্রিত করেই অনুরূপ নামকরণ।

রোগটিকে সনাক্ত করার পর ওর উৎসেরও খোঁজাখুঁজি শুরু হলো। কোথা থেকে সংক্রমিত হয় এই রোগটি। এখানকার বাসিন্দাদের আগে তো এমন রোগ হতো না! আফ্রিকায় যাঁরা যাতায়াত করেন সেই সব মার্কিন, জার্মান ও ফরাসীদের মধ্যে এ রোগ কেন? তবে কী আফ্রিকার অধিবাসীদের মধ্যে এই রোগ আছে। এবং আফ্রিকা থেকে আমদানি হয়েছে। তাই যদি হয় তাহলে সেই অন্ধকারচ্ছন্ন মহাদেশের কোথায় কোন অন্ধকারে লুকিয়ে আছে রোগটির উৎস!

হাইতির বাসিন্দাদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হওয়ায় এবার সেইখানকার অধিবাসীদের নিয়েও শুরু হলো গবেষণা। সত্যি, যা ভেবে ছিলেন গবেষকরা, তাইই হলো। দেখা গেল, এইডস রোগটা তাদেরই এক চেটিয়া। এবং ভয়ানক সংক্রামক রোগ এটি। রোগাক্রান্তদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ট হলে, এমনকি সামান্য করমর্দনটুকু করলেও রোগের আশংকা শতকরা একশ ভাগ। এমন সাংঘাতিক এর ভাইরাস। কিন্তু ভাইরাসটির আমদানি কোথা থেকে?

অনেক অনুসন্ধানের পর গবেষকরা টের পেলেন, উক্ত ভাইরাসটির পোষক একধণের নীল বানর। স্থানীয় অধিবাসীরা ঐ বানরের মাংস খায় এবং এর ফলেই সংক্রামিত হয় সুস্থ দেহে। সেখানকার অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসতে হয় বলেই বিদেশীরা আক্রান্ত হচ্ছেন।

এবার ওর প্রতিষেধক খোঁজার পালা শুরু হলো। কিন্তু এ পর্যন্ত এইডস এর কোন ভাল প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি। শুধু A. T. Z. নামে একটি প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে। মোটামুটি সুফল পাওয়া যায় এতে।

ভারতে যে সব জায়গায় বিদেশীদের আনাগোনা বেশী, সেই মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে এইডস-এর প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। কলিকাতায় এখনও এইডস আসেনি। তবে আসতে কতক্ষণ! অতএব সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে।

ম্যালেরিয়ার জীবাণু

গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে এককালে ম্যালেরিয়া ছিল একটি আতঙ্ক। এই রোগে যারা আক্রান্ত হতো তাদের সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হতে হতোনা সত্য, তবে দীর্ঘকাল দুর্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হতো। ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ যথেষ্ট ছিল।

সেকালে অনেকের ধারণা ছিল, জলাভূমি থেকে উৎপন্ন দূষিত গ্যাস মানুষের গায়ে লাগলে ম্যালেরিয়া হয়। ঐ ধারণা থেকেই ম্যালেরিয়া শব্দটির উৎপত্তি। অর্থাৎ ম্যালেরিয়া অর্থে দূষিত বাতাস।

ম্যালেরিয়া এক একটা এলাকায় অতি ভয়ঙ্কর ভাবে আত্মপ্রকাশ করতো। তাইতো ভাবিয়ে তুলেছিল বহু চিকিৎসাবিজ্ঞানীকে। আগে ওর জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু সন্দেহ করা হয়েছিল, রোগটি জীবাণুঘটিত। তাই অনেকে ওর জীবাণু আবিষ্কারে যত্নবান হয়েছিলেন। ১৮৭৭ সালে স্যার প্যাট্রিক ম্যানসন নামে এক ইংরাজ চিকিৎসক ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত এক রোগীর দেহে একরকম আকস্মিকভাবেই আবিষ্কার করেন ফাইলেরিয়ায় জীবাণু। ঐ জীবাণুকে লাভ করার পর ম্যানসন গবেষণা করেন। দীর্ঘ গবেষণার পর বুঝতে পারেন, এক জাতীয় মশার কামড়েই মানবদেহে ফাইলেরিয়া রোগটি সংক্রমিত হয়। তখনই তাঁর মনে সন্দেহ ঘনীভূত হয়, ম্যালেরিয়া রোগটির মূলে আছে কোন না কোন জাতের মশার দংশন।

ল্যাভেরন নামে এক চিকিৎসাবিজ্ঞানী সে সময় বিভিন্ন রোগে আক্রান্তদের নিয়ে নানা ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতেন। ১৮৮০ সালে ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে লাভ করলেন এক ধরণের জীবাণু। ঐ জীবাণু প্রকৃত ম্যালেরিয়ার জীবাণু কিনা—যে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য সুস্থ দেহে ওর অনুপ্রবেশ ঘটালেন। সুস্থ ব্যক্তিটি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলো। আবিষ্কৃত হলো ম্যালেরিয়ার জীবাণু।

ল্যাভরন জীবাণুটিকে সনাক্ত করলেন এবং চিনিয়ে দিলেন সবাইকে। বললেন, রক্তে পরজীবীর উপস্থিতির জন্য ম্যালেরিয়া রোগ হয়। জলাভূমির দূষিত বাতাস ম্যালেরিয়া রোগের কারণ নয়।

প্যাট্রিক ম্যানসন তখনও সমানে গবেবণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কৃত হলে তাঁর মনে প্রশ্ন এলো, ম্যালেরিরার জীবাণু আসে কোথা থেকে? কেমন করেই বা সংক্রামিত হয় সুস্থ দেহে! নতুন উদ্যমে আবার গবেষণা চালালেন। কিন্তু পারলেননা ম্যালেরিয়া রোগের কারণ নির্ণয় করতে। শুধু অনুমান করলেন, রোগটির মূলে আছে মশার ভূমিকা। এবং

তাঁর অনুমানটি একটি প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করেন।

প্যাট্রিক ম্যানসন জনৈক তরুণ ইংরাজ চিকিৎসকের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন আপন মনোভাব। তরুণটির নাম রোনাল্ড রস। ভারতে আলমোড়ায় তাঁর জন্ম হয়েছিল। তবে লেখাপড়া করেছিলেন ইংলণ্ডে। কর্মসূত্রে যখন পুনরায় ভারতে এলেন, তখনই এখানকার ম্যালেরিয়ার ভয়াবহতা দেখে ব্যথিত হলেন। প্যাট্রিক ম্যানসনের কথনও মনে এলো তাঁর। শুরু করলেন ম্যালেরিয়ার রোগজীবাণুকে নিয়ে গবেষণা। গবেষণাস্থল কলিকাতার শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতাল।

ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত বেশ কিছু সংখ্যক রোগীর রক্ত পরীক্ষা করলেন রস। সবারই দেহে লাভ করলেন একই ধরণের জীবাণু। কর্মোপলক্ষে ভারতের বহু জায়গা ঘুরতে হয়েছিল বলে ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে মশার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করেছিলেন। তাই ম্যানসনের মত তাঁরও মনে সন্দেহ আসে, ম্যালেরিয়া রোগের পেছনে ঐ মশারাই রয়েছে।

ম্যানসন ও রস উভয়ের সন্দেহ সত্যে পরিণত হলো ১৮৯৭ সালে—ম্যালেরিয়া রোগজীবাণু আবিষ্কারের ছয় বছর পরে। এনোফেলিস জাতীয় স্ত্রী মশকের লালাস্রাবী গ্রন্থিতে রোনাল্ড রস লাভ করলেন ম্যালেরিয়ার জীবাণু এবং সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন তাঁর আবিষ্কারের কথা।

এবার সিদ্ধান্তকে যাচাই করার পালা। ভারত ছাড়া অন্যান্য যে সব দেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে সেসব জায়গায় রোগীদের ও মশাদের নিয়ে গবেষণা শুরু করার জন্য প্রস্তুত হলেন রস। কিন্তু তখন তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে কর্মরত। গবেষণার জন্য বাধ্য হয়ে চাকরি ছাড়তে হলো তাঁকে। প্রথমে গমন করলেন পশ্চিম আফ্রিকা। সেখানেও সেই একই তথ্য লাভ করলেন। অর্থাৎ পশ্চিম আফ্রিকাতেও এনোফিলিস মশকীর লালাস্রাবী গ্রন্থিতে লাভ করলেন ম্যালেরিয়ার জীবাণু।

এতদিনে নিঃসন্দেহ হলেন রস। তাঁর গবেষণার ফলাফলও প্রকাশিত হলো। অতঃপর ম্যালেরিয়া বিতাড়নের অভিযান হলো শুরু।

কলেরার জীবাণু

খুব বেশীদিনের কথা নয়, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও এমন মানুষ একজনও ছিল না—যে কলেরার ভয়ে শিউরে উঠতো না। কলেরা মানেই

তখন ছিল সাক্ষাৎ মৃত্যু। তাই বলে বর্তমানে ভয় যে একেবারে কেটে গেছে এমন নয়। উন্নত চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ায় উপযুক্ত সময়ে রোগী সুচিকিৎসা লাভ করলে মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই বা যথাসময়ে টিকা গ্রহণ করলে ভয় দূরীভূত হয়, এই মাত্র।

কলেরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহের রোগ। আফ্রিকা, মিশর ও ভারতবর্ষে মাঝে মাঝে অঞ্চলবিশেষে অতি ভয়াবহ আকার ধারণ করতো। গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর একেবারে উজাড় হয়ে যেতো।

কলেরা আজকে আন্ত্রিক রোগসমূহের আওতায় পড়ে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মানুষ কলেরার কারণ নির্ণয় করতে পারেনি। এর পেছনে "ঈশ্বরের রোষ" বলে অনেকেই মনে করতেন এবং কোথাও কলেরা আত্মপ্রকাশ করলে রোষশান্তির জন্য পূজা অর্চনা করতো। আমাদের দেশে কলেরার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরও কল্পনা করা হয়েছিল। তিনি শীতলা। আজও তাঁর পূজা প্রচলিত আছে।

জেনার, পাস্তুর প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে একদিন প্রমাণিত হয়, রোগের পেছনে রয়েছে অদৃশ্য জীবাণুদের হাত। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে নানাজাতের জীবাণুদের সনাক্ত করা সম্ভব হলো এবং তখনই বিজ্ঞানীদের ধারণা হলো, কলেরা নামক ভয়াবহ রোগটির পেছনেও রয়েছে কোন না কোন জীবাণুর ভূমিকা।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময় বিভিন্ন জাতের জীবাণুদের সনাক্ত করার জন্য একটা প্রবল সাড়া পড়ে গেছে চারদিকে এবং এর শুরু পাস্তুরের হাতে। পাস্তুর নিজেই অ্যানাথ্রাক্স এবং জলাতঙ্ক রোগের কারণ ও প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছিলেন। পাস্তুরের যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলো বহু বিজ্ঞানীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ফলে বহুজনেই এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রবার্ট কোখ ছিলেন অন্যতম। ১৮৮২ সালে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে যক্ষ্মার জীবাণু আবিষ্কার করে জগৎজোড়া সুনামের অধিকারী হলেন। অধ্যাপনা করতেন জার্মানীর স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে। সেই সময় তিনি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ভয়াবহ রোগ কলেরার কথা অবগত হন এবং এ বিষয়ে গবেষণার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু জার্মানীতে বসে গবেষণার কোন সুযোগ ছিল না। কারণ সেসব দেশে কলেরা হতো না। কোখ বুঝতে পারলেন, তাঁর উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করতে হলে তাঁকে যেতে হবে প্রাচ্যের দেশসমূহে। এটি সম্ভব একমাত্র সরকারি সাহায্য লাভ করলে।

সুযোগ খুঁজতে লাগলেন কোখ এবং সে সুযোগ খুব তাড়াতাড়ি লাভ করলেন। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন তাঁকে প্রদান করলেন গবেষণামূলক বৃত্তি এবং কলেরা রোগের কারণ অনুসন্ধানের জন্য পাঠিয়ে দিলেন মিশরে।

মিশরে বেশ কিছুকাল অবস্থান করলেন কোখ। প্রাথমিক কিছু কিছু তথ্য লাভ করার পর কলেরার প্রকোপ যেখানে বেশী—সেই ভারতবর্ষে

আসার চেষ্টা করলেন। কর্তৃপক্ষ সম্মত হওয়ায় তিনি কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে শুরু করলেন গবেষণা।

কলিকাতায় অবস্থানকালে কোথ হাসপাতালে ছাড়াও কলেরায় আক্রান্ত অঞ্চলসমূহে ছুটতেন। রোগীদের পরীক্ষা করতেন, সেবাও করতেন। আর এইসব করতেন গিয়ে তিনি বহুবার নিজের জীবনকেও বিপন্ন করেছিলেন। অবশেষে বেশ কয়েকবছর কলিকাতায় গবেষণা চালাবার পর পুনরায় গমন করেন মিশরে। সেইখানেই তিনি সনাক্ত করেন কলেরার জীবাণুকে। গবেষণা থেকে তিনি প্রমাণ করেন, এটি জলবাহিত জীবাণু। দূষিত জল এবং দূষিত খাদ্য থেকে এটি মানবদেহে সংক্রামিত হয়। এই আবিষ্কারের পেছনে তাঁকে ব্যয় করতে হয়েছিল সুদীর্ঘ দশ বছর কাল।

কলেরার জীবাণু ও সংক্রামিত হওয়ার কারণ আবিষ্কারের পর রোগটিকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা হয়। পরে পরে বহু সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে এবং কলেরা প্রভৃতি আন্ত্রিক রোগসমূহের টিকাও আবিষ্কৃত হয়েছে। তথাপি কলেরা যে সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেছে এমন নয়। আজও আমাদের দেশে চিকিৎসার অভাবে বহুজনে ওর শিকার হচ্ছে। ধরা পড়ছে নতুন নতুন জীবাণু। ভিব্রিও কলেরা এবং ক্ল্যাসিক্যাল কলেরা ভিব্রিও নামক জীবাণু ছাড়াও এলটর ভি· কলেরা নামে অতি ভয়ংকর এক কলেরার জীবাণু সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ জীবাণু সহসা ধ্বংস হয় না। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় ৯৪টি দেশে ওর প্রকোপ দেখা গেছে। আরও হয়ত কতরকমের অনাবিষ্কৃত কলেরার জীবাণু রয়েছে। তাই কলেরা সম্বন্ধে গবেষণা এখনও শেষ হয়নি।

ক্যানসারের কারণ ও প্রতিরোধ

মানব সভ্যতার আদিপর্ব থেকে আজও পর্যন্ত ক্যানসার মানুষের কাছে এক আতংক হয়ে আছে। উক্ত রোগের লক্ষণ প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র চরকসংহিতায়ও বর্ণিত হয়েছে। চরকে ওর নাম কর্কট রোগ। এবং এর চিকিৎসা নেই বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

চরকের আমল থেকে কতকাল গত হয়ে গেছে। চিকিৎসা রাজ্যে এসেছে প্লাবন। তথাপি আজও ক্যানসারের প্রকৃত কারণ এবং এর প্রতিষেধক আবিষ্কার হতে পারেনি। আরও দুঃখের বিষয়, এই রোগটির প্রাদুর্ভাব

ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। আগে যেখানে এক লক্ষ মানুষের মধ্যে ৫ থেকে ৭ জন আক্রান্ত হতো, এখন সেখানে হাজারে প্রায় ৭ জনের মত। তার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা আজকের দূষিত পরিবেশ তথা জলদূষণ, মাটিদূষণ, শব্দদূষণ কৃষিক্ষেত্রে অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক প্রয়োগ, ধূমপান, মদ্যপান ইত্যাদিকে দায়ী করছেন।

ক্যানসার সম্বন্ধে গবেষণা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু হলেও বিংশ শতাব্দীর পূর্বে বিশেষ কিছু তথ্য জানা যায়নি। প্রথম প্রথম মনে করা হয়েছিল ক্যানসারের মূলে কোন জীবাণু নেই, এটি বংশগত নয়, এবং শরীরের কোন অংশে অস্বাভাবিক ও অনিয়মিতভাবে কোষবৃদ্ধি ঘটলে শরীরের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় এবং টিউমারের সৃষ্টি হয়। অবশেষে টিউমারটি ক্যানসারে রূপান্তরিত হয়।

বর্তমানে অনিয়মিত কোষবৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলেও বিজ্ঞানীরা জীবাণুর আক্রমণকে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। বংশগতও যে নয়, তাও জোর দিয়ে বলছেন না। সাম্প্রতিক গবেষণাবলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ক্যানসারের মূলে আছে কোষমধ্যস্থিত কয়েক প্রকার জিনের মুখ্য ভূমিকা। জিনরা ডি. এন. এ. অণুর পাশে সুতার মত জড়িয়ে থাকে এবং প্রতিটি কোষে ওদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষের মত। ক্যানসার সৃষ্টিকারী কোন মাধ্যম তথা কোন রাসায়নিক পদার্থ যেমন ধূমপায়ীদের বেলায় নিকোটিন, অথবা কদাচিৎ কোন ভাইরাস কোষ মধ্যস্থিত ডি. এন. এ.-র উপর যদি আক্রমণ চালায় তাহলে কিছু কিছু জিন ক্যানসার সৃষ্টির মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত প্রায় ১৫টির মত মাধ্যমকে আবিষ্কার করেছেন। এক একটি মাধ্যম এক এক ধরণের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক ক্যানসারের সৃষ্টি করে থাকে।

বিজ্ঞানীরা আরও লক্ষ্য করেছেন, মাধ্যমরা কোষে সৃষ্টি হয়ে অচল অবস্থায় থাকলে ক্যানসারের সম্ভাবনা নেই। সক্রিয় বা সচল হলেই সর্বনাশ। প্রাথমিক অবস্থায় এদের দমন করতে শরীর অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু পান-জর্দা, বিড়ি-সিগারেট, মদ-গাঁজা ইত্যাদি সেবন করলে অথবা বিষাক্ত কীটনাশক বিষের পরিবেশে কিংবা তেজস্ক্রিয় রশ্মির পরিবেশে এলে, শরীর তাদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারায় এবং তখনই অনিয়ন্ত্রিতভাবে কোষ বাড়তে শুরু করে।

দুরারোগ্য ব্যাধি এই ক্যানসারের কোন ভাল প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। ক্যানসার বহু রকমের। এবং শরীরের যে কোন জায়গায় ক্যানসার সৃষ্টি হতে পারে। বাহিরে এবং ভেতরে উভয় জায়গায়। এর আরও বৈশিষ্ট্য প্রাথমিক স্তরে ধরা পড়ে না। আর যখন ধরা পড়ে তখন চিকিৎসকদের আয়ত্তের বাহিরে চলে যায়। তবে বাহিরের টিউমার হলে ভয়ের কিছু থাকেনা। ক্যানসার সৃষ্টির আগে টিউমারটিকে অপসারণ করে ফেললেই

হলো। অথবা বাহিরের অঙ্গে ক্যানসার সৃষ্টি হলেও অস্ত্রোপচার ও তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রদানের দ্বারা রোগীকে বেশ কিছুকাল বাঁচিয়ে রাখা যাচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে দেহের অভ্যন্তরে যথা গলনালী, পাকস্থলী, মস্তিষ্ক, ফুসফুস প্রভৃতি স্থানে টিউমার হলে তাদের উন্নত যন্ত্রপাতি প্রাথমিক অবস্থায় সনাক্ত করতে পারছে। এই উদ্দেশ্যে সুস্থ শরীরকে অতি অল্পায়াসে পরীক্ষা করারও সুযোগ আছে। সাধারণতঃ নির্দোষ শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে অনুরূপ পরীক্ষা করা হয়। এবং সময় এত কম লাগে যে, অফিসে যাওয়ার পথেও পরীক্ষাটা করিয়ে নেওয়া যায়। আর এও সত্য প্রাথমিক অবস্থায় ক্যানসার ধরা পড়লে ভয়ের কিছু থাকে না।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের। এখানকার বড় বড় হাসপাতালগুলোতেও অনুরূপ যন্ত্র বিরল। ক্যানসার সনাক্তকরণের যেসব পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাও আগেকার পদ্ধতি। অপরদিকে ক্যানসারে আক্রান্তদের সংখ্যা এমন ভয়াবহভাবে বেড়ে চলেছে যে, যে কয়েকটা মুষ্টিমেয় হাসপাতাল আছে তারা ঠিক সময়ে রিপোর্ট দাখিল করতে পারেন না। যখন রিপোর্ট আসে তখন দেখা যায়, ক্যানসার অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে। তবু কিছু কিছু প্রাইভেট সংস্থা কাজগুলোকে ত্বরান্বিত করছেন। কিন্তু সেখানে প্রয়োজন হয় প্রচুর অর্থব্যয়ের। অনেকের সামর্থ্যের বাহিরে।

বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস· কিছুটা সচেতন হতে পারলে প্রাথমিক অবস্থায় ক্যানসার ধরা পড়তে পারে। তার জন্য তাঁরা কতকগুলো প্রাথমিক লক্ষণ এবং ক্যানসার সহায়ক ও ক্যানসার নিরোধক কতকগুলো পদার্থের নাম করেছেন।

ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ ঃ

কতকগুলো সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, (১) যে কোন বয়সে ক্যানসার হতে পারে। (২) ছেলেদের অপেক্ষা মেয়েদের ক্যানসার বেশী। (৩) প্রাথমিক অবস্থায় ক্যানসার ধরা পড়লে শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে ক্যানসার নিরাময় হয়। (৪) স্ত্রীলোকের স্তনের ক্যানসার ও জরায়ুর ক্যানসার প্রাথমিক স্তরে ধরা পড়লে শতকরা একশ জনকে সুস্থ করানো যায়।

প্রধান প্রধান লক্ষণগুলো,

(১) কোথাও ক্ষত সৃষ্টি হলে যদি সহজে আরোগ্য না হয়,

(২) শরীরের কোন জায়গায় আব বা টিউমার সৃষ্টি হলে টিউমারটি যদি বাড়তে শুরু করে,

(৩) শরীরের আঁচিল, তিল, জড়ুল ইত্যাদির রঙের পরিবর্তন ঘটলে, চুলকালে কিংবা আয়তনে প্রসারিত হলে,

(৪) হঠাৎ স্বরভঙ্গ ঘটলে, গলায় খসখসেভাব ও জ্বালাজ্বালা ভাব লক্ষ্য

করলে (অনেক সময় ঠাণ্ডা লাগলেও হয়, যদি দু-একদিনে সেরে না ওঠে তাহলে পরীক্ষা করতে হবে,)

(৫) কিছুকাল ধরে হজমের গোলমাল চলতে থাকলে,

(৬) অম্ল, অজীর্ণতে আক্রান্ত হলে,

(৭) মেয়েদের বেলায় অনিয়মিত স্রাব ও স্তনে শক্ত মাংসের ঢ্যালা দেখা দিলে (মেয়েরা নিজেরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একা একা পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারেন। স্তনে জ্বালা জ্বালা ভাব এবং মাংসের শক্ত ঢ্যালা লক্ষ্য করলেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন। এমনটি করলে ভয়ের আদৌ সম্ভাবনা নেই) !

(৮) মুখের ভেতর ফুস্কুড়ি গজানো এবং দুচারদিনের ভেতরে নিরাময় না হলে।

ক্যানসারের সহায়ক :

(১) ভারতীয়রা বিড়ি, তামাক, জর্দা প্রভৃতি ব্যবহার করেন বলে তাঁদের জিভে ও গলনালীতে বেশী ক্যানসার হয়।

(২) সিগারেট, খৈনি, মদ প্রভৃতি সেবনকারীদের মধ্যে ক্যানসারের হার অন্যান্যদের চেয়ে বেশি।

(৩) জাপানীরা প্রচুর চিংড়ি মাছ খান বলে তাঁদের পাকস্থলীর ক্যানসার বেশী হয়ে থাকে।

(৪) মার্কিনরা চর্বিজাতীয় পদার্থ অধিক গ্রহণ করেন বলে তাঁদের পাকস্থলীর ক্যানসার বেশী।

(৫) ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা পান-জর্দা সেবন করেন তাঁদের মধ্যে ঠোঁটের ও জিভের ক্যানসার বেশী।

(৬) কীটনাশকের অবশেষ যুক্ত তরিতরকারী ও ফল ক্যানসারের সহায়ক। (উল্লেখ করতে হয় যে, আজকাল এমন কোন ফসল, ফল বা শাকশব্জী নেই, যাতে কীটনাশকের অবশেষ থাকে না। এক্ষেত্রে খাদ্যনির্বাচন করা উচিত যাতে কীটনাশকের অবশেষ অতি অল্প পরিমাণে থাকে। যেমন আমন ধানের মোটা চাল, মাটির ভেতরের সব্জি, পেঁপে, কাঁচকলা, লোনামাছ· ছাগলের মাংস ইত্যাদি। পোলট্রির মুরগী ও ডিমে বিস্তর থাকে। স্যালাত অতীব বিপজ্জনক। আর বিপজ্জনক শশা, আপেল আঙ্গুর প্রভৃতি দামী ফলের খোসা।)

(৭) যে কোন রঙীন খাদ্য পাকস্থলীর ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে।

(৮) প্রসাধন সামগ্রীর রাসায়নিক বিষ চামড়ার ক্যানসারের জন্য দায়ী।

ক্যানসার নিরোধক :

(১) আমিষ ভোজী অপেক্ষা নিরামিষ ভোজীদের ক্যানসার অপেক্ষাকৃত কম।

(২) তেল, ঘি প্রভৃতি চর্বিজাতীয় খাদ্য, চর্বিওয়ালা মাছ ও মাংস খাওয়া সীমিত করলে ক্যানসারের সম্ভাবনা কম হয়। সম্ভাবনা কমে যায় কোন নেশার বশীভুত না হলে।

(৩) রঙীন শাকসব্জী ও ফল ক্যানসার নিরোধক। (দুঃখের বিষয়, আজকের সমূহ রঙীন শাকসব্জী ও ফল কীটনাশক বিষে জর্জরিত। ওখানেও নির্বাচনের প্রশ্ন আসে।)

(৪) বিশুদ্ধ গরু মহিষের দুধ থেকে প্রস্তুত ঘি-তে বিদ্যমান "আন্টি কার্সিনো জেনিক পদার্থ" ক্যানসার প্রতিরোধক।

(৫) ভারতীয় বনৌষধি গবেষক সংস্থা জানিয়েছেন, হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে "মহর্ষি অমৃত কৈলাস" নামে ভেষজটি স্ত্রীলোকের স্তনের ক্যানসার রোধ করে।

অতি সম্প্রতি সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, কলকারখানার ধোঁয়া, তামাক, নানা ধরণের রাসায়নিক পদার্থ, সূর্যের অতি বেগুণী রশ্মি প্রভৃতি যাদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় "কার্সিনোজেন" বলে—তারা দেহ কোষের স্বাভাবিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা দেয় এবং অনিয়ন্ত্রিত কোষ গুলোর বাড়ার সুযোগ করে দেয়। আরও তাঁরা বলেছেন, কনকোভাইরাস নামে একধরণের ভাইরাস দেহকোষে ক্যানসারগ্রস্ত জীনের সৃষ্টি করে। ২০০০ সালের মধ্যে ক্যানসারের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হবে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস।

রিম্যান জ্যামিতি

অনেক—অনেকদিন আগেরকার কথা। ১৮৫৪ সালে জার্মানীর গোত্তিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অঙ্কের অধ্যাপকের প্রয়োজন হলো। উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে যোগদান করা একটা কঠিন সমস্যা ছিল বলতে হবে। বিদগ্ধ পণ্ডিতদের সামনে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ—করতে হতো। নিজের পছন্দমত কোন বিষয় বেছে নিয়ে তার উপর বক্তব্য রাখতে হতো বলা বাহুল্য সে বক্তৃতা নিজের মৌলিক গবেষণা ছাড়া অন্য কিছু হলে চলতো না।

ঐ কারণে সেদিন অধ্যাপক পদের জন্য একজন মাত্র প্রার্থী ছিলেন। প্রার্থী একজন তরুণ জার্মাণ। নাম তাঁর বার্ণহার্ড রিম্যান। সদ্য পাশ করেছেন এবং বাল্যাবধি অঙ্কের উপর গবেষণা করে আসছেন।

পরীক্ষার দিন স্থির হয়েছে। রিম্যান জানিয়ে দিলেন, তিনি সমান্তরাল

সরল রেখার উপর আপন গবেষণালব্ধ ফলাফল সম্বন্ধে বক্তব্য রাখবেন। সে সময় গোত্তিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন কার্ল গাউস—বিশ্বের সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ অঙ্কবিদ। তাঁরই নেতৃত্বে অঙ্কের পণ্ডিত-মণ্ডলী তরুণটিকে পরীক্ষা করবেন স্থির হলো। কিন্তু যখনই পণ্ডিতেরা শুনলেন, তরুণটি সমান্তরাল সরললেখার উপর বক্তব্য পেশ করবেন, তখনই তাঁরা নাসিকা কুঞ্চন করলেন। তাঁরা মনে মনে ভাবলেন, সামন্তরাল সরলরেখার উপর নতুন কোন্ তথ্য প্রদান করবেন রিম্যান। ইউক্লিডের জ্যামিতি থেকে প্রায় দু-হাজার বছর কাল মানুষ এ বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে আসছে। এবং সমান্তরাল সরলরেখা সম্বন্ধে ইউক্লিডের বর্ণনাই চূড়ান্ত—তার উপরে আর কোন কিছু যুক্ত হতে পারেনা। এর একটি মাত্র নিয়ম, যে কোন সরলরেখার বাহিরে কোন বিন্দু দিয়ে ঐ রেখার সমান্তরাল মাত্র একটি রেখাকে টানা যায়।

তাঁরা গাউসকে বললেন—এমন এক সাধারণ জিনিসের উপর পরীক্ষা গ্রহণ করে রিম্যানকে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করা চলেনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এতে দুর্নামই হবে।

গাউস তাঁদের কথা শুনলেন। নিজেও যে না ভেবেছেন এমন নয়। তবু তমুণটি নতুন কী তথ্য পরিবেশন করেন—তা শোনার জন্য তরুণটিকে অবহেলা করলেন না। পরীক্ষার জন্য ডেকে পাঠালেন।

বক্তৃতা গৃহে গাউস এবং মাত্র কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য কেউ নেই। বিশেষজ্ঞরা বাধ্য হয়েই এসেছেন। গাউসের কথা ফেলতে পারেননি বলে। উৎসাহ আদৌ ছিলনা তাঁদের মধ্যে।

তরুণটি শুরু করলেন বক্তৃতা। প্রথমেই উল্লেখ করলেন, ইউক্লীডিয় জ্যামিতিতে সমান্তরাল সরলরেখা সংক্রান্ত যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা পৃথিবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য হতে পারেনা।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন বিশেষজ্ঞরা। একি! তরুণটি কী বলতে চাইছেন! বক্তৃতায় ত্রুটি ধরার জন্য এবার সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু নির্বিকায় রইলেন গাউস। তিনি শুধু মন দিয়ে শুনে যেতে লাগলেন তরুণটির বক্তৃতা।

তরুণ তাঁর নিজের মতের সমর্থনে নানা যুক্তির অবতারণা করলেন। শেষে বললেন, পৃথিবীতে জ্যামিতির যে নিয়ম ঘটে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রে সে নিয়ম প্রযোজ্য হতে পারেনা। বিশ্বব্রহ্মান্ডের কোন রেখাই সমান্তরাল নয়। এবং কোন বিন্দু থেকে ঐ রেখার সমান্তরাল কোন রেখা টানা ও সম্ভব নয়।

বক্তৃতার অভিনবত্ব দেখে অনেকেই মুগ্ধ হলেন। কিন্তু গাউস ছাড়া কেউ আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। তাঁরা গাউসকে জিজ্ঞাসা করলেন—তরুণটিকে কেমন মনে হচ্ছে আপনার!

গাউস শুনলেন—মন দিয়ে ওর বক্তৃতাটা শুনেছি।

—ওকে কী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করা যাবে?

গাউস অল্পক্ষণ নীরব থেকে বললেন—শুধু নিয়োগ নয়, ওর প্রতিভাকে কী ভাবে যে সম্বর্ধনা জানাবো—সেই কথাই ভাবছি।

বিশেষজ্ঞরা যেন রুখে উঠলেন। বললেন—সে কী! এমন অবান্তর ও ও অবান্তব উক্তি—যা পাগলের প্রলাপ ছাড়া অন্য কিছু নয়, তাকে সম্বর্ধনা জানাবেন?

গাউস মৃদু মৃদু হাসলেন। বললেন—না, ও পাগলা নয়। ওকে নিয়োগ করলে গোত্তিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অনেক—অনেক ছড়িয়ে পড়বে। ও এমন এক জ্যামিতির ভিত্তি স্থাপন করতে চলেছে—যা একেবারে নতুন। এই পথ অবলম্বন করে বিশ্বের বহু সমস্যার একদিন সমাধান হবে।

গাউসের কথা কিন্তু মিথ্যে হয়নি। এই তরুণটির হাতে একদিন যে জ্যামিতির উদ্ভব হয়েছিল তা আবিষ্কারকের নামানুসারে নাম দেওয়া হয়েছে রিম্যান জ্যামিতি। ঐ জ্যামিতিকে অবলম্বন করেই বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আইনস্টাইনের সেই যুগান্তকারী তত্ত্ব রিম্যান জ্যামিতি ছাড়া সম্ভব হতোনা বলে পণ্ডিতদের বিশ্বাস। আইন স্টাইনের সেই তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্থান ও কাল বক্র। এখানে কোন সরলরেখা নেই, সবই বক্ররেখা!

π এর মান

শিক্ষার্থী মাত্রেই জানে, বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাত একটি নিত্য সংখ্যা বা ধ্রুবক। হাতে নাতে প্রমাণও করা যায়। মোটা কাগজের ছোট-বড় নানা আকারের কয়েকটা বৃত্ত এঁকে এবং বৃত্তগুলোর পরিধি বরাবর সুন্দর ভাবে কেটে পৃথক করে নেওয়া যেতে পারে। এবার প্রত্যেকটি বৃত্তের এবং ব্যাস সুতো দিয়ে মেপে আলাদা আলাদা ভাবে খাতায় লেখা যেতে পারে। তারপর প্রতিটি বৃত্তের পরিধিকে তার ব্যাস দিয়ে ভাগ করলে দেখা যাবে সব ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা আসবে। খালি হাতে বৃত্তদের কাটা এবং পরিধি ও ব্যাস মাপার ক্ষেত্রে এক আধটু ত্রুটি অবশ্য থেকে যেতে পারে। তা হলেও দেখা যাবে, অন্ততঃ দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত মিলে যাচ্ছে।

উপরোক্ত সত্যটি প্রথম স্থির করেছিলেন প্রখ্যাত গ্রীক গণিতজ্ঞ আর্কি-

মিদিস। আর্কিমিদিকে অবশ্য উদস্থিতিবিদ্যার জনক বলা হয়, তথাপি অঙ্কের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান বড় কম নয়। এখনও মনে করা হয়, পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞদের ভেতরে তিনিও একজন।

আর্কিমিদিসের গণিতে আছে অবিস্মরণীয় অবদান। তিনিই প্রথমে বৃত্তের ক্ষেত্রফল এবং গোলকের ঘনফল নির্ণয় করেছিলেন (এবং তিনিই আবিষ্কার করে গেছেন বৃত্তের পরিধিও ব্যাসের অনুপাত ধ্রুবক। সেই ধ্রুবককে তিনিই চিহ্নিত করেছিলেন গ্রীক অক্ষর π (পাই) দিয়ে।

আর্কিমিদিস 'পাই'র মান ভারি অদ্ভূত উপায়ে বার করেছিলেন। প্রথমে তিনি একটা বিশেষ ব্যাসার্ধের বৃত্ত অঙ্কন করেছিলেন। তারপর বৃত্তের বাহিরে ও ভেতরে বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করেছিলেন। ক্ষেত্রফল নির্ণয় করেছিলেন ভেতরের ও বাহিরের দুটি বর্গক্ষেত্রের।

এর পর বর্গক্ষেত্রের পরিবর্তে বৃত্তের বাহিরে ও ভেতরে সুষম ষড়ভূজ, অষ্টভুজ এইভাবে একের পর এক বহুভুজ এঁকে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ওদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করেছিলেন। আরও আরও বাহুসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করেছিলেন। তিনি বাহুসংখ্যা এমনভাবে করতে চেয়েছিলেন যাতে বৃত্তের পরিধির বক্ররেখার সঙ্গে খাহিরের ও ভেতরের বহুভূজের এক একটি বাহু প্রায় যেন মিলে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত বৃত্তের ভেতরে ও বাহিরে এমন দুটি বাহুভুজ এঁকে ছিলেন যাদের বাহুসংখ্যা ছিল ৯৬।

অবশ্য এভাবে মিলিয়ে নিতে গেলেও কোন কালে পরিধির বক্ররেখার সঙ্গে বাহুভুজের বাহুগুলো মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবেনা। আর্কিমিদিসও জানতেন। তারজন্য কিছুটা অনুমানও খাড়া করতে হয়েছিল। অনুরূপ উপায়ে তিনি বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করেছিলেন। এবং বারবার বিভিন্ন আকারের বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন, যে কোন বৃত্তের ক্ষেত্রফল = সেই বৃত্তের ব্যাসার্ধের বর্গ × একটি বিশেষ সাংখ্য-মাণ। সেই সাংখ্য মানটি ধরে ছিলেন ৩ $\frac{১}{৭}$। $\frac{২২}{৭}$ রূপে ধরা হয় সূচিত করা হয় π দিয়ে। আর্কিমিদিসের পরীক্ষা অনুযায়ী বৃত্তের ব্যাসার্ধ-যদি r হয় তাহলে তার ক্ষেত্রফল হবে $= r^2\pi$ বা $r^2 \times \frac{২২}{৭}$।

আর্কিমিদিস সেদিন কলনবিদ্যার সাহায্য না নিয়েই একেবারে নির্ভুলভাবে নির্ণয় করে নিয়েছিলেন π র মান। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এমন অবিস্মরণীর অবদান যেন আশাই করা যায় না।

আর্কিমিদিসের পরে π এর মান নির্ণয় করেছিলেন টলেমি। তাঁর হিসেবে স্থির হয়েছিল ৩·১৪১৬। কথিত আছে, চীনের পণ্ডিত মণ্ডলীও বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত নির্ণয় করেছিলেন। তাঁদের হিসেবে এই অনুপাত $\sqrt{১০}$। অর্থাৎ চীনের পণ্ডিতরা π র মান নির্ণয় করেছিলেন $\sqrt{১০}$।

ষোড়শ শতাব্দীতে একটা বিশেষ ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হয়েছিল। ভগ্নাংশটি

$৩\frac{১৬}{১১৩}$ বা $\frac{৩৫৫}{১১৩}$। সংখ্যাটির আবিষ্কর্তা যে কে, তা সঠিকভাবে জানা যায়না। তবে ভগ্নাংশটি π এর মানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল। উক্ত সংখ্যাটি ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ভুলভাবে নির্ণয় করেছিল π র মান।

বর্তমানে আমরাও ঐ অনুপাতকে $\frac{২২}{৭}$ বলে ধরে থাকি। $\frac{২২}{৭}$ তথা π র মান এমন একটা বিদঘুটে ভগ্নাংশ—যার প্রকৃতমান নির্ণয় করতে গিয়ে আজও পর্যন্ত সবাই গলদঘর্ম হয়েছেন। কেউ কেউ দশমিকের পরে সাতশ স্থান পর্যন্ত অঙ্ক পাতন ঘটিয়ে ছিলেন। তথাপি ভাগ কাটাতে পারেননি।

আজও কী সম্ভব হয়েছে? আজকের কম্পিউটার π এর মান দশমিকের পরে ২000 স্থান পর্যন্ত হিসেব করেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! তবুও ভাগ কাটাতে পারেনি বা π র সম্পূর্ণমান নির্ণয় করতে পারেনি। আরও আশ্চর্য ভাগ কাটাতো দূরের কথা কোন পৌন পৌনিক দশমিক অঙ্কও পাওয়া যায়নি। ভবিষ্যতে যন্ত্র গণকের আরও উন্নতি হলেও π র মান সেই অসম্পূর্ণ থেকে যাকে বলে মনে হয়! এমন আশ্চর্য ধ্রুবক π তথা π এর মান $\frac{২২}{৭}$ ভগ্নাংশটি। এই আশ্চর্য ভগ্নাংশটির সঙ্গে স্মরণ করতে হয় আর্কিমিদিসের আশ্চর্য প্রতিভা।

কিমিয়াবিদ্যা

রসায়নবিজ্ঞান তথা "কেমিস্ট্রি" শব্দটি গ্রীম "কিমিয়া" শব্দ থেকে নেওয়া। অনেকের মতে কিমিয়া শব্দটি ঠিক ঠিক গ্রীক শব্দ নয়। গ্রীকরা মিশরীয় শব্দের অনুকরণে কিমিয়া শব্দটির প্রচলন করেন।

কিমিয়াবিদ্যা বেশ প্রাচীন বিদ্যা। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে ব্যাবিলনীয়রা এবং মিশরীয়রা ধাতুনিষ্কাশন, কাচ প্রস্তুতি, নানা ধরণের রঞ্জক প্রস্তুতি, ইত্যাদির সূত্রপাত করতে গিয়ে কিমিয়াবিদ্যার প্রচলন করেন। প্রাচীন হায়রোগ্লিফিক লিপিতেও এই বিদ্যার উল্লেখ আছে। এবং বলা হয়েছে মিশরীয়বিদ্যা। এক কথায় মিশরেই প্রথম এই বিদ্যার উদ্ভব হয়েছিল। কিংবদন্তী আছে। হার্মেস ত্রিসমে জিসতস নামে এক অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি উক্ত বিদ্যার প্রচলন করেছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে কিমিয়াবিদ্যা কেবলমাত্র কারিগর শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সমাজের নিচুস্তরের মানুষের বিদ্যাবলে অভিজাত গ্রীকরা বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখায় গবেষণা করলেও কিমিয়াবিদ্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে চেষ্টা করেননি। শুধু

রসায়নের তাত্ত্বিক দিকটা নিয়ে কেউ কেউ কিছু কিছু ভাবনা চিন্তা করেছিলেন সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছিলেন ওর ব্যবহারিক দিকটাকে।

সেকালে মিশরে এবং ব্যাবিলনে-যে সব কারিগর ধাতু নিষ্কাশন প্রভৃতি কাজ করতো তারা প্রায় সবাই ছিল ক্রীতদাস। ক্রীতদাসদের বিদ্যাকে অনুসরণ করতে অনেকের নীলরক্তে বেধেছিল। তাইতো গ্রীক আমলে অবহেলিত হয়েছিল প্রাচীন মিশরীয় কিমিয়াবিদ্যা ধাতুনিষ্কাশন।

গ্রীকরা ছিলেন প্রধানতঃ পণ্ডিত ও দার্শনিক। সেকালে তাঁরা আত্মা এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা ধরণের দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেছিলেন। দার্শনিক প্লেটো বলেছিলেন, আমাদের চারপাশে আমরা যে সব পদার্থকে দেখতে পাই সেই পদার্থগুলোর মধ্যে যত পার্থক্য থাকুক না কেন মূলত সবাই এক। কেবল মাত্র গুণ ও ধর্মের জন্য পদার্থের বিভিন্নতা। অপরদিকে পদার্থের গুণ ও ধর্ম পরিবর্তনশীল।

প্লেটোর দার্শনিক মতবাদটি অনেককে আকৃষ্ট করেছিল। প্লেটোর অনুগামী দার্শনিক সম্প্রদায় আরও প্রচার করেন, প্রতিটি মানুষ একই ধাতুতে গড়া। আত্মার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হলে যেমন মানুষের অসদ্গুণ পরিবর্তিত হয় এবং সদগুণের অধিকারী হয়, তেমনই গুণ ও ধর্মের পরিবর্তন ঘটাতে পারলে নিকৃষ্ট ধাতু উৎকৃষ্ট ধাতুতে পরিণত হবে।

উপরোক্ত দার্শনিক মতবাদকে কিছু কিছু উচ্চাকাঙ্খী মানুষ অভ্রান্ত বলে মনে করেছিলেন এবং নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনারমত উৎকৃষ্ট ধাতুতে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। উক্ত কারণে তাঁরা নানা ধরণের ধাতু ও ধাতব লবণ, গাছগাছড়ার রস, প্রকৃতিতে প্রাপ্ত কিছু কিছু যৌগকে নিয়ে মেতে উঠেছিলেন গবেষণায়। উদ্দেশ্য, লোহা কিংবা অন্যান্য নিকৃষ্ট ধাতু থেকে সোনা তৈরি করে ধনী হওয়ার প্রচেষ্টা। ক্ষ্যাপার পরশপাথর খোঁজার মত।

সেকালে কিছু কিছু গবেষকদের আরও ধারণা হয়েছিল, উদ্ভিদ জগতে খোঁজ খবর চালালে এমন কিছু কিছু ভেষজ লাভ করা সম্ভব—যা গ্রহণ করলে মানুষ অমরত্বও লাভ হতে পারে। তথা অমৃত পাওয়া যাবে। যে বিদ্যার সাহায্য লোহাকে সোনা করা যায় এবং অমৃত আহরণ করা যায় সেই বিদ্যাকে বলা হতো কিমিয়াবিদ্যা। আর কিমিয়াবিদ্যার যাঁরা চর্চা করতেন তাঁদের বলা হতো কিমিয়াবিদ।

কিমিয়াবিদরা পরশপাথর কিংবা অমৃত কোন কিছুই লাভ করতে পারেননি সত্য, তবে ঐ মরীচিকার পেছনে শত শত ভাগ্যান্বেষী সারা জীবনকাল ব্যয় করে যাওয়ার ফলে নানা ধরণের অ্যাসিড, নানা বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, নানা ধরণের রঞ্জক পদার্থ, ইত্যাদি আবিষ্কার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রসায়নের গোড়া পত্তন করে গেছেন তাঁরাই।

কিমিয়াবিদ্যা যথেষ্ট কুসংস্কারগ্রস্ত ছিলেন। তাঁদের কার্যকলাপ দেখে সাধারণ মানুষ ভয় পেতেন। শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বরদাস্ত করতে পারতেননা

তাঁদের। অনেকেই ভাবতেন, কিমিয়াবিদ্যা ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়। হয়ত এই কারণে ২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ডায়োক্লিটিয়ন কিমিয়াবিদ্যার বহু পুঁথিপত্র পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশনামায় "কিমিয়া" কথাটির উল্লেখ ছিল। সম্ভবতঃ ডায়োক্লিটিয়নের সময় থেকে প্রাচীন রসায়নবিদ্যাকে কিমিয়াবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়েছিল। রসায়ন বা কেমিস্ট্রি কথাটা আসেনি তখনও।

গ্রীক আমলের শেষের দিকে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় কিমিয়াবিদ্যা চর্চা জোরদার হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ডিমোক্রিটাস, (গ্রীক ডিমোক্রিটাস নন, ইনি পৃথক ব্যক্তি), মারিয়া নামে জনৈকা য়িহুদী মহিলা (অসাধারণ সুন্দরী এই মহিলাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল কিমিয়াবিদ্যার প্রতি কুসংস্কার বশতঃ) এবং জোসিবোস, কিমিয়াবিদ্যার যথেষ্ট প্রসার ঘটিয়ে ছিলেন। ইওরোপে রেনাসাঁসের যুগে এঁদেরই বই অনুবাদ করে রসায়নের গোড়াপত্তন করা হয়েছিল। সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, অ্যাকোয়ারেজিয়া পাতন, উর্ধ্বপাতন প্রভৃতির কথা তাঁদেরই বই থেকে লাভ করা হয়েছিল।

আরবীয়রা কিমিয়াবিদ্যার নাম দিয়েছিল অ্যালকেমি। আরবীয়দের দ্বারা আলেকজান্দ্রিয়ার পতন ঘটলে সেখানকার উন্নত কিমিয়াবিদ্যার কথা তাঁরা জানতে পারেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরব জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা শুরু করলে কিমিয়াবিদ্যাকে নিয়েও গবেষণা শুরু করেন এবং 'অ্যাল' কথাটি যুক্ত করে অ্যালকেমি কথাটার প্রচলন করেন।

ভারতেও এককালে কিমিয়াবিদ্যার চর্চা হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ভারতে কিমিয়াবিদ্যার দারুন প্রসার হয়েছিল। ভারতে এই বিদ্যার নাম ছিল রসশাস্ত্র। সমসাময়িককালে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কিমিয়াবিদ ছিলেন নাগার্জুন। তিনি কিমিয়াবিদ্যাকে চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন।

ইওরোপের অন্ধকারযুগে কিমিয়াবিদ্যা কিন্তু হারিয়ে যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে আরবও বন্ধ করে দেয় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা। কিমিয়াবিদ্যার পুনরুত্থান ঘটে প্যারাসেলসাসের হাতে। প্রকৃতপক্ষে তিনিই প্রথম কিমিয়াবিদ্যাকে মানুষের ঘৃণা ও অবহেলা থেকে মুক্ত করেন এবং প্রচার করেন, পরশ পাথর বা অমৃত প্রস্তুত করা কিমিয়াবিদ্যার উদ্দেশ্য নয়। রোগব্যাধির হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য। তিনি আরও উল্লেখ করেন, একমাত্র কিমিয়াবিদ্যাই পারে সমস্ত রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে।

প্যারাসেলসাস কেবলমাত্র একজন চিকিৎসক ছিলেন না, ছিলেন অসাধারণ এক পণ্ডিত ব্যক্তিও। তাঁর ঘোষণা বহু বিজ্ঞানীকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং কিমিয়াবিদ্যা চর্চা বিপুল উদ্যমে শুরু হয়েছিল। সেই সময় কয়েকজন

অমিত প্রতিভাবান বিজ্ঞানীরও আবির্ভাব ঘটে। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় কিমিয়া-বিদ্যা ঘৃণিত যাদুবিদ্যার খোলস পরিত্যাগ করে বিজ্ঞানের বিশেষ শাখা রসায়ন বা কেমিস্ট্রিতে রূপান্তরিত হয়।

সেই থেকে ওর একটানা উন্নতির যুগ। কত অসাধ্যকে যে সাধন করেছে, কত দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিষেধক যে উপহার দিয়েছে তার সীমা পরিসীমা নেই। অত ক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যেও আবিষ্কৃত হয়েছে অসাধারণ শক্তি। বর্তমানে তার একহাতে তীব্র হলাহল এবং অপর হাতে অমৃত। সত্য, রসায়নবিদ্যাটি যাদুবিদ্যাই বটে।

নাইট্রোজেন
অক্সিজেন
হাইড্রোজেন

বায়ুর প্রধান দুটি উপাদান নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের কথা দীর্ঘকাল মানুষের অজ্ঞাত ছিল। এদের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে বায়ুকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কালে।

গ্রীক পণ্ডিতদের আমল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, বায়ু মূল পদার্থ। অর্থাৎ বায়ু বায়ুই। তাতে কোন পদার্থ মিশে নেই। বায়ুর মৌলিকত্ব সম্বন্ধে প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন রবার্ট বয়েল ইওরোপের নবজাগরণের দিনে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে।

রবার্ট বয়েলের কিছু পরে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন বেকর নামে এক বিজ্ঞানী আগুন সম্বন্ধে একটা মতবাদ খাড়া করেন। গ্রীক আমল থেকে যে পঞ্চ মৌলিক পদার্থ তথা পঞ্চভূতের কল্পনা করা হয়েছিল (মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ—ভারতীয় কল্পনায় পঞ্চভুত। গ্রীকরা আকাশ ছাড়া বাদবাকি চারটিকে ধরতেন।) তাদের মধ্যে বায়ু ও আগুন নিল অন্যতম। বেকারের মতে প্রত্যেকটি দাহ্য বস্তুর মধ্যে এমন একটা উপাদান আছে যা তাকে জ্বলতে সাহায্য করে।

বেকারের মতটিকে সমর্থন করেন স্টাল নামে এক বিজ্ঞানী। তিনি বেকারের ঐ বিশেষ উপাদানটির নামকরণ করেন ফ্লোজিস্টন। গ্রীক "ফ্লোজ" অর্থে অগ্নিশিখা। তাই ফ্লোজিস্টনের প্রকৃত অর্থ অগ্নি উৎপাদক। স্টালের মতে যে কোন দাহ্য বস্তুর উপাদান ফ্লোজিস্টন। এই ফ্লোজিস্টনকে আমরা

কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারি না। কেবল অগ্নিশিখার আকারে যখন বেরিয়ে আসে তখনই আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারি। তেল, কয়লা, প্রভৃতি দাহ্যবস্তুতে ফ্লোজিস্টনের পরিমাণ সর্বাধিক। ধাতব পদার্থে থাকে নামে মাত্র। দাহ্য বস্তুকে পোড়ালে যে ছাই পড়ে থাকে তা ফ্লোজিস্টনহীন বস্তু।

স্টাল প্রবর্তিত উক্ত মতবাদকে সেদিন সমস্ত বিজ্ঞানী অম্লানবদনে মেনে নিয়েছিলেন।

শীলে নামে এক অমিত প্রতিভাধর রসায়নবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি একদিন খেয়ালের বশে সীসাকে পুড়িয়ে সীসাভস্ম তৈরি করেন। তারপর কী ভেবে ঐ সীসাভস্মটা ওজনও করলেন। আশ্চর্য হলেন, যখন দেখলেন সীসা অপেক্ষা সীসাভস্মের ওজন বেশী হলো। ফ্লোজিস্টন মতবাদ অনুযায়ী সীসার ভস্মের ওজনতো কম হওয়ার কথা! বেশী হলো কেন?

শীলে ভস্মটাকে ফেলে দিলেন না। একটা বকযন্ত্রের মধ্যে পুরে ভালভাবে গরম করলেন। গরম করতে পাওয়া গেল একধরণের গ্যাস। গ্যাসটাকে শুঁকে দেখলেন। শ্বাসগ্রহণ করতে বেশ আরাম বোধ হলো এক টুকরা লাল গনগনে উত্তপ্ত কাঠ কয়লাকে ধরলেন, কয়লা আগুনের শিখা উৎপন্ন করলো! কী ব্যাপার! ফ্লোজিস্টন তত্ত্বকে বরবাদ হয়ে যায়।'

শীলে নিজে কিন্তু ছিলেন ফ্লোজিস্টন মতবাদের সমর্থক। পরীক্ষার ফলাফল দেখে বিস্মিত হলেও উক্ত মতবাদের বাহিরে যেতে পারলেন না। তবে বুঝতে পারলেন. গ্যাসটা বায়ু থেকেই এসেছে। সিদ্ধান্তে এলেন, গ্যাসটি বায়ুর একটা অংশ এবং এই অংশটি কোন কিছুকে জ্বলতে সাহায্য করে। নাম রাখলেন ফায়ার বায়ু। আপন অজান্তে তিনি যে, বায়ুর অন্যতম উপাদান অক্সিজেনকে আবিষ্কার করে ফেলেছেন—এ চিন্তা তাঁর মাথায় আসেনি। মাথায় আসেনি ঐ ফ্লোজিস্টন ভূতটা ঘাড়ে চেপে থাকার জন্য।

শীলে তাঁর পরীক্ষাকে ঐখানে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বাতাসকে নিয়ে তিনি আরও নানা ধরণের পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। পরবর্তী পরীক্ষা করেছিলেন কতকগুলো চকচকে লোহার পেরেককে নিয়ে। একটা পাত্রের কিছু অংশ জলে ভর্তি করে তার ভেতরে পেরেকগুলোকে খাড়াভাবে রেখেছিলেন। তারপর একটা একমুখ খোলা কাচের নলের খোলা মুখটা পেরেকের উপর উপুড় করে রেখে দিয়েছিলেন বেশ কয়েকটা দিন। পাত্রের জলের উচ্চতা আর নলের ভেতরের জলের উচ্চতা আর নলের ভেতরের জলের উচ্চতা একই ছিল। সপ্তাহখানের পরে দেখলেন, উভয়ের জলতলের উচ্চতা এক নেই। নলের ভেতরে জল কিছুটা উপরে উঠে গেছে।

নলটাকে খুব সাবধানে তুলে আনলেন এবং তার ভেতরের অবশিষ্ট বায়ুটাকে পরীক্ষাকে করলেন। এবার দেখলেন, বায়ুর অবশিষ্ট অংশটাতে

শ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না, আগুনও জ্বলছে না। শীলে ধরে নিলেন, বাতাসের এই অংশটুকু একেবারে অকেজো। অবহেলাভরে পর নামকরণ করলেন "ফাউল বায়ু"। এই 'ফাউল বায়ু' যে নাইট্রোজেন—তাও শীলে বুঝতে পারেন নি।

শীলের উপরোক্ত পরীক্ষাগুলো প্রভাবিত করেছিল প্রিস্টলী নামে আর একজন রসায়নবিজ্ঞানীকে। তিনিও ফ্লোজিস্টন মতবাদের সমর্থক ছিলেন। সীসার বদলে পারদকে নিয়ে প্রিস্টলী পরীক্ষা করলেন। এক্ষেত্রেও তিনি শীলের মতই ফল লাভ করলেন। তখনই তিনি সিদ্ধান্তে এলেন, বায়ু দু'ধরণের। ফায়ার বায়ু এবং ফাউল বায়ু। বায়ুর পাঁচভাগের চারভাগই হচ্ছে ফ্লোজিস্টনবিহীন, বাদবাকি মাত্র একভাগ ফ্লোজিস্টন যুক্ত। তিনি আরও মন্তব্য করলেন, কোন জ্বলন্ত বস্তু বায়ুর সংস্পর্শে এলে পদার্থটি দ্রুত ফ্লোজিস্টন গ্রহণ করে এবং উজ্জ্বল শিখায় আলোক বিতরণ করে।

সেই সময় প্যারাসেলসাস নামে একজন বিজ্ঞানী এক রকম আকস্মিকভাবে তৈরি করে ফেলেন অন্য এক ধরণের গ্যাস। ঐ গ্যাসের ভেতরে একটা জ্বলন্ত পাটকাঠি ঢোকাতে দেখতে পেলেন, কাঠিটি নিভে গেল কিন্তু গ্যাসটি জ্বলতে শুরু করলো।

তাঁদের সমসাময়িক ক্যাভেণ্ডিস নামে আর এক রসায়ন বিজ্ঞানী গবেষণা করতেন। তিনি শীলের ফায়ার বায়ু ও ফাউল বায়ু এবং প্যারাসেলসাস কর্তৃক আবিষ্কৃত গ্যাসকে নিয়ে শুরু করলেন পরীক্ষা। ক্যাভেণ্ডিস করলেন কী! ফায়ার বায়ুর একভাগ এবং প্যারাসেলসাস আবিষ্কৃত গ্যাসের দুভাগ একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে মিশ্রণের ভেতর দিয়ে পাঠালেন বিদ্যুৎ। কিন্তু কী আশ্চর্য! শেষ পর্যন্ত জলই উৎপন্ন হলো।

ক্যাভেণ্ডিসের আবিষ্কারের কথা প্রিস্টলী শুনলেন। তারপর নিজে হাতে-নাতে পরীক্ষাগুলো খতিয়ে দেখলেন। ফ্লোজিস্টনে বিশ্বাসী প্রিস্টলী এবার মন্তব্য করলেন, প্যারাসেলসাস আবিষ্কৃত গ্যাসে প্রচুর পরিমাণে ফ্লোজিস্টন আছে। যেহেতু ফায়ার বায়ুর সঙ্গে ক্রিয়া করে জল উৎপন্ন করেছে, তাই গ্যাসটির নামকরণ করেন ফ্লোজিস্টনপূর্ণ জল। এবং ফায়ার বায়ুর নামকরণ করেন ফ্লোজিস্টনহীন জল। ক্যাভেণ্ডিসও যেহেতু ফ্লোজিস্টনে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই অম্লানবদনে মেনে নিলেন প্রিস্টলীর কথা।

এইভাবে প্রায় দেড়শ বছর ধরে বিজ্ঞানীদের ঘাড়ে ঐ ফ্লোজিস্টন ভূতটা চেপেছিল। তাই অক্সিজেন, হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও সবাই সেই কষ্টকল্পিত ফ্লোজিস্টনকে টেনে এনে নামকরণ করেছিলেন। আর এত পরীক্ষা সত্ত্বেও সবাই তখনও বিশ্বাস করেছিলেন বায়ু মূলপদার্থ এবং ফায়ার বায়ু ও ফাউল বায়ু বায়ুর রূপভেদ।

এরপরেই এলো বিজ্ঞানী ল্যাভোসিয়ারের কাল। তিনি পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের সমূহ পরীক্ষাই হাতে-নাতে করলেন। সীসা ও পারদকে পৃথক

পৃথকভাবে পুড়িয়ে প্রতি ক্ষেত্রে ধাতু এবং ধাতুভস্মের ওজন গ্রহণ করলেন। অবাক হয়ে দেখলেন, প্রতি ক্ষেত্রে ধাতু অপেক্ষা ধাতুভস্মের ওজন বেশী। নিজে আরও কয়েকটি ধাতুকে পুড়িয়ে সেই একই ফল লাভ করলেন।

অনেক ভেবেচিন্তে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন, ফ্লোজিস্টন তত্ত্বটা একেবারে ভুল এবং বাতাসও মূল পদার্থ নয়। বায়ু মিশ্র পদার্থ এবং একভাগ ফায়ারবায়ু এবং চারভাগ ফাউলবায়ু নিয়ে গঠিত।

বলাবাহুল্য ঐ ফায়ার বায়ুটা অক্সিজেন এবং ফাউল বায়ুটা নাইট্রোজেন এবং প্যারাসেলসাস আবিষ্কৃত গ্যাসটির নাম হাইড্রোজেন। এদের নামকরণ কিন্তু ল্যাভোসিয়ার করেননি। নামকরণ হয়েছে অনেক পরে। ল্যাভোসিয়র শুধু ফাউল বায়ুর একটা নামকরণ করেছিলেন। নাম অ্যাজোট। ফরাসী অ্যাজোট শব্দের অর্থ নিষ্প্রাণ।

১৭৯০ খৃীষ্টাব্দে চ্যাপটলে নামে এক ফরাসী বিজ্ঞানী সোরা বা নাইটারের ভেতরে এক ধরণের গ্যাসের সন্ধান পান। গ্যাসটি সংগ্রহের পর তিনি দেখলেন, ল্যাভোসিয়ারের অ্যাজোট এবং শীলের ফাউল বায়ু—দুটোই এক। তখনই বিজ্ঞানীরা ওর নামকরণ করেছিলেন নাইট্রোজেন। কারণ, নাইটার থেকে ওকে পাওয়া গিয়েছিল।

অক্সিজেন নামকরণ করা হয়েছে অম্ল উৎপাদক বলে। বিজ্ঞানীরা তখনকার দিনে আবিষ্কৃত সব অ্যাসিডের ভেতরে লক্ষ্য করেছিলেন গ্যাসটির উপস্থিতি। তাই নামকরণ করেছিলেন অম্ল উৎপাদক বা অক্সিজেন। অপরদিকে প্যারা-সেলসাস আবিস্কৃত গ্যাসটি জল উৎপাদক বলে নামকরণ করা হয় উদজান বা হাইড্রোজেন।

পরের দিকে অনুরূপ নামকরণে যথেষ্ট ভ্রান্তি দেখা যায়। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড, হাইড্রোআয়োডিক অ্যাসিড প্রভৃতি আবিষ্কৃত হলে দেখা গেল, ওদের মধ্যে অক্সিজেন আদৌ নেই। বরং ওদের প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন। অর্থাৎ আগেকার বিজ্ঞানীদের ধারণা, অম্ল মাত্রই অক্সিজেনের যৌগ—ভুল প্রমাণিত হলো। বরং দেখা গেল, অ্যাসিডের উপাদান হাইড্রোজেন। এই কারণে অক্সিজেন গ্যাসটির নামকরণ প্রকৃতপক্ষে হাইড্রোজেন হওয়াই উচিত ছিল। যেহেতু মহান বিজ্ঞানীরা সেদিন অনেক ভেবে চিন্তে ওদের নামকরণ করে গেছেন, তাই তাঁদের দেওয়া নামকে পরিত্যাগ করার প্রশ্নই উঠে না।

জীবদেহে নাইট্রোজেনের প্রভাব

নাইট্রোজেনের প্রতি বরাবর সবারই একটা অবজ্ঞার ভাব ছিল। সবারই মনে হয়েছিল, বাতাসে নাইট্রোজেনের আধিক্যের আদৌ প্রয়োজন ছিল না।

একেবারে নিষ্ক্রিয় গ্যাস থাকে বলে আগুন জ্বালাবার কাজে লাগে না, শ্বাস নেওয়া যায় না, উদ্ভিদের খাদ্য তৈরির কাজেও লাগে না।

অনেক পরে অবশ্য বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, বাতাসের এই উপাদানটির গুরুত্ব বড় কম নয়। যদিও পরোক্ষভাবে নানা উপকার করে থাকে। আকাশে বিদ্যুৎস্ফুরণের ফলে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন যুক্ত হয় এবং নানা রূপান্তরের ভেতর দিয়ে মাটিকে করে উর্বর। আদিম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের আধিক্য থাকায় আকাশে জৈব যৌগের সংশ্লেষণ ঘটেছিল। অতিরিক্ত নাইট্রোজেন বায়ুর অক্সিজেনকে পাতলা করে রেখেছে। অক্সিজেনের পরিমাণ যদি নাইট্রোজেনের মত হতো তাহলে দ্রুত দহন ক্রিয়ার ফলে কোন জীবকে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করতে হতো না। কোথাও আগুন জ্বললে সে আগুনকে সহসা আয়ত্তে আনা যেতোনা, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যে কোন জীবদেহ সরাসরি বাতাসের নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করতে পারে কিনা—এই চিন্তাভাবনা একেবারে হালফিল ব্যাপার। প্রথমে গবেষণা করেন ভলস্কি নামে একজন সোভিয়েত প্রযুক্তিবিদ। তাঁর কেমন যেন মনে হয়েছিল, উদ্ভিদ যেমন বাতাস থেকে কারবন ডাই-অক্সাইডকে সরাসরি গ্রহণ করে তেমনই জীবজগৎ নাইট্রোজেনকে আত্মসাৎ করে। ভলস্কি তার ধারণার সত্যতা যাচাই করার জন্য এক চিকিৎসককে সহকারীরূপে গ্রহণ করেন এবং উভয়ে গবেষণায় মেতে ওঠেন।

প্রথমে ভলস্কি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন কতকগুলো মুরগীর ডিমের উপর। ডিমের খোলকের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে নাইট্রোজেনের অনুপ্রবেশ ঘটে কিনা জানার জন্য পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালালেন। এর জন্য গ্রহণ করেছিলেন বেশ কয়েকটা ডিম। তিনি লক্ষ্য করলেন, টাটকা ডিমে নাইট্রোজেনের পরিমাণটা বেশী, ডিম ফোটার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরবর্তী ধাপগুলোতে ক্রমশঃ কম।

ডিম বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করে কিনা জানার জন্য কয়েকটা ডিমকে তেজস্ক্রিয় নাইট্রোজেন যুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে রাখেন। সপ্তাহ খানেক পরে ডিমগুলোকে পরীক্ষা করলেন ভলস্কি। দেখলেন, ডিমের ভেতরে তেজস্ক্রিয় নাইট্রোজেনের অণুপ্রবেশ ঘটেছে।

উক্ত পরীক্ষার পর ভলস্কি তার গবেষণার ফলাফল প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করলেন এবং প্রবন্ধের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেলেন, জীব মাত্রই আপন অজান্তে বাতাস থেকে কিছু কিছ নাইট্রোজেনকে সরাসরি গ্রহণ করে থাকে।

প্রবন্ধ প্রকাশের পর বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়। অনেকেই মানতে পারলেন না ভলস্কির কথা। কিন্তু হাল ছাড়লেন না ভলস্কি নিজে। তিনি অন্যভাবে পরীক্ষাটিকে যাচাই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ভলস্কি যখন পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন সেই সময় সোভিয়েত রাশিয়া মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাতে শুরু করেছে। মানুষ না পাঠিয়ে পাঠাচ্ছে যত ইতর

জীবজন্তু। ভলস্কি তাঁর গবেষণার কথা জানিয়ে সোভিয়েত মহাকাশ গবেষণা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হলেন।

ভলস্কি কৃত্রিম উপগ্রহের একটি প্রকোষ্ঠে অক্সিজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণ রাখলেন, কিন্তু নাইট্রোজেন আদৌ রাখলেন না। তারপর প্রকোষ্ঠটিতে ছেড়ে দিলেন নানা ধরণের কয়েকটা প্রাণীকে।

মহাকাশ পরিক্রমার পর ফিরে এলো কৃত্রিম উপগ্রহটি। ভলস্কি এবার পরীক্ষা করলেন প্রাণীগুলোকে। দেখলেন, প্রতিটি প্রাণীর দেহে নাইট্রোজেন ঘটিত মূল্যবান উপাদানগুলোর বেশ ঘাটতি ঘটেছে।

জীব বিজ্ঞানীরা আর তর্ক করলেন না। ভাবতে শুরু করলেন। জীব হয়ত কোন এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সরাসরি বাতাসের নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে।

কিন্তু কী সে প্রক্রিয়া !

না, আজও সে প্রক্রিয়াটি আবিষ্কৃত হয়নি, তাই ভলস্কির পরীক্ষাকে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা যাচ্ছে না। যদি ভলস্কির কথা সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হবে।

বোরণ

বোরণ ধাতু নয়। অধাতু। কিন্তু অধাতু হলে কী হবে যেমন কঠিন তেমনই শক্ত। হীরের মতই। সহজে গলে না বোরণ। ২৩০০° সেলসিয়াসেও অবিকৃত থাকে। এত তাপসহন ক্ষমতা !

বোরণের অতিরিক্ত মাত্রায় তাপসহন ক্ষমতা থাকার জন্য ওর নানা কাজে ডাক পড়েছে। ইস্পাতের সঙ্গে অল্প পরিমাণে মিশিয়ে ইস্পাতকে আরও কঠিন করা হচ্ছে। পারমাণবিক চুল্লীতে-যেখানে প্রচুর পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয়, সেখানে বোরণ মিশ্রিত ইস্পাতের দণ্ডকে ব্যবহার করা হচ্ছে। রকেটের ফিলামেণ্টে, রেজিস্ট্যান্স থার্মোমিটারে, থার্মোইলেকট্রিক কাপলে—যেখানে যেখানে উচ্চ তাপমাত্রার প্রশ্ন আছে, সে সব জায়গায় বর্তমানে বোরণ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

বোরণ নামের মৌলিক পদার্থটি আবিষ্কৃত হয়েছে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে। এর আগে মানুষ ওর পরিচয় জানতো না। তবে বোরণের একটি যৌগর সঙ্গে মানুষের পরিচয় দীর্ঘকালের। প্রাচীন ভারতে ওর বহুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ভারতীয়রা ওকে সোহাগা নাম দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যে বলতো

বোরাক্স। বোরণমুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। ওর সর্বাধিক পরিচিত যৌগ বোরাক্স।

বোরাক্সের গুণপনা মানুষ আবিষ্কার করেছে খ্রীষ্টজন্মের দুই থেকে তিন হাজার বছর আগে। স্বর্ণকাররা সোনার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করতে সোনাকে বোরাক্সের সঙ্গে মিশিয়ে উত্তপ্ত করতেন এবং এখনও করেন। বোরাক্স এমন একটি জিনিস-যাকে আগুনে ধরলে খইর মত ফুলে উঠে। বেশী তাপ দিলে স্বচ্ছ গুটির আকার ধারণ করে। প্রাচীন ভারত সোহাগাকে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছিল।

বোরাক্সকে ব্যবহার করলেও বোরাক্সের উপাদানগুলোকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাননি। অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব সূচিত হওয়ায় এবং পদার্থকে সনাক্ত করার নানা হাতিয়ার বিজ্ঞানীদের হাতে আসায় অনেকের দৃষ্টি সোহাগা বা বোরাক্সের উপর নিবদ্ধ হয়। এবং এর উপাদান-গুলোকে বিশ্লেষণ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেন।

সোহাগাকে নিয়ে গবেষণায় প্রথম সাফল্য অর্জন করেছিলেন এক ডাচ চিকিৎসক। নাম তাঁর ডব্লু হোমবার্গ। কী ভেবে তিনি সোহাগার সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে ভালভাবে উত্তপ্ত করেন। ফলে লাভ করেন একটি অ্যাসিড। রসায়নবিদ ছিলেন না বলে হোমবার্গ অ্যাসিডটিকে সনাক্ত করতে পারেনি। বিজ্ঞানী বন্ধুদের তিনি ব্যাপারটা জানিয়ে দেন।

ব্যাপারটা ঘটেছিল ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে। হোমবার্গের বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিলেন সেকালের নামকরা এক রসায়ন বিজ্ঞানী টি. বার্গেন। বন্ধুর কথা শোনার পর নিজেই হাতে-নাতে পরীক্ষাটি করে দেখলেন বার্গেন। দেখলেন, এটি একটি নতুন অ্যাসিড। অর্থাৎ এর পরিচয় মানুষ আজও লাভ করতে পারেনি। বোরক্স থেকে অ্যাসিডটি পাওয়া গেছে বলে অ্যাসিডটির তিনি নামকরণ করেন বোরিক অ্যাসিড। এখনও ঐ নাম বহাল আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মৌলিক পদার্থ আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা প্রবল সাড়া পড়ে যায়। প্রকৃতিতে পাওয়া নানা ধরনের যৌগিক পদার্থকে নিয়ে তাঁরা মেতে উঠেন। তাঁদের মধ্যে আবার ছিলেন ডেভি, থেনার্ড, গেলুসেকের মত অমিত প্রতিভাধর বিজ্ঞানী। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে জুন থেনার্ড এবং গেলুসাক হোমবার্গের তৈরি সেই বোরিক অ্যাসিড থেকে বোরণকে পৃথক করতে সমর্থ হলেন। তাঁদের মাত্র আটদিন পরে পৃথক ভাবে গবেষণা করে বিজ্ঞানী ডেভিও সেই একই উপায়ে বোরণকে পৃথক করেন। ডেভি অবশ্য বহু মৌলিক পদার্থের আবিষ্কর্তা। কিন্তু এক্ষেত্রে আবিষ্কারকের গৌরব থেকে তিনি বঞ্চিত।

নতুন মৌলটিকে নিয়ে এরপর শুরু হলো গবেষণা। নামকরণটা অবশ্য পরিচিত যৌগ বোরাক্স থেকে পাওয়া গেল বলে বোরণ হলো। বোরাক্সকেও বিশ্লেষণ করা হলো। দেখা গেল, বোরাক্স হচ্ছে সোডিয়াম, বোরণ এবং

অক্সিজেনের যৌগ। যেহেতু ওকে কেলাসের আকারে পাওয়া যায়, তাই তাতে থাকে দশঅণু কেলাস জল। ফরমুলা $Na_2 B_4 O_7 10H_2O$।

বোরণ আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওকে বিভিন্ন জায়গায় ডাক পড়ে। সেই সঙ্গে তার অন্যান্য যৌগগুলোকে। অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে বোরিক অ্যাসিডকে, বোরণ অক্সাইডকে পাইরেক্স গ্লাস প্রস্তুতিতে, বোরণ ফসফাইডকে ট্রানজিস্টাররূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ধরনের ট্রানজিস্টার ব্যবহার করা হয় তেমন উচ্চ উষ্ণতায়—যেখানে সিলিকন ও জার্মেনিয়ামের ট্রানজিস্টার ব্যর্থ হয়।

টাইটেনিয়াম

বর্তমানে আমরা লৌহযুগে বাস করছি বললেও অত্যুক্তি হবে না। যুগটির শুরু খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দী থেকে। আর এও সত্য যে, লৌহযুগ শুরু হওয়ার পর থেকেই মানবসভ্যতা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেছে। আজকের এমন অবস্থা হয়েছে, যাতে লোহা ছাড়া আমাদের মুহূর্তও চলে না।

মানব সভ্যতা যেমন দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে, তেমনই লোহার ব্যবহারও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। নিত্য নতুন করে গড়ে উঠছে লৌহ শিল্প। এবং এর উৎস লোহার আকরিক। কিন্তু লোহার মূল্যবান আকরিক তো অফুরন্ত নয়! এভাবে লোহার নিষ্কাশন ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলে একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে বা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে। তখন কেমন করে অব্যাহত থাকবে মানব সভ্যতা?

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, লোহার একমাত্র পরিপূরক ধাতু হতে পারে টাইটেনিয়াম। লোহা থেকে উৎকৃষ্টও বটে। ইস্পাতের চেয়ে শক্ত অথচ লোহার চেয়ে অনেক হালকা। ধাতুটির তাই সম্ভাবনা প্রচুর।

টাইটেনিয়ামের পরিচয় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানীরা জ্ঞাত হলে কী হবে দীর্ঘকাল ওকে ওর আকরিক থেকে নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়নি। সেদিন খনিজ থেকে টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইডকেই কেবল বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। সেই থেকে দেড়শ বছর লেগেছে ধাতুকে আলাদা করতে। প্রথম ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানীরা বহু সাধ্য সাধনার পর নিষ্কাশন করেছিলেন অতি

সামান্য পরিমাণে টাইটেনিয়াম। তারপর দু-বছর ধরে ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নিষ্কাশন করেছিলেন মাত্র দশ টনের মত।

বর্তমানে বিজ্ঞানীদের অধ্যবসায়ের ফলে টাইটেনিয়াম নিষ্কাশনের পরিমাণ অনেকখানি বেড়েছে। নিষ্কাশন করা হয় ক্রল পদ্ধতিতে রিউটাইল নামে টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইডের সাদা স্ফটিকাকার খনিজ থেকে।

টাইটেনিয়াম ধাতুটির আশ্চর্য গুণ। এতে মরিচা পড়ে না বা সহজে নষ্টও হয় না। অথচ লোহায় মরিচা ধরে, মরিচা নিরোধের ব্যবস্থা করতে হয় এবং নষ্টও হয়ে যায়। অপরদিকে রূপোর মত সাদা ঝকঝকে ও হাল্কা অ্যালুমিনিয়ামও মাত্র পঞ্চাশ বছরের পরে ক্ষয়ে একেবারে যেন নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু টাইটেনিয়াম! সহস্র সহস্র বছরেও এর কোন বিকৃতি বা ক্ষয় আসবে না বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। যে কোন অ্যাসিড, ক্ষার, লবণ এমনকি অ্যাকোয়া রিজিয়াও (৩ ভাগ গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে এক ভাগ গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণ) এর কিছুই করতে পারে না। এক কথায় কারও সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায় না টাইটেনিয়াম।

টাইটেনিয়ামের আরও বহু গুণ আছে। উচ্চ তাপমাত্রায় গলেনা। একে গলতে হলে ইস্পাত-অপেক্ষা আরও ২০০° সেলসিয়াস তাপ বাড়াতে হয়। গলনাঙ্ক ১৬৭৫° সেলসিয়াস।

সত্যি, আশ্চর্য এর তাপবাহন ক্ষমতা। অপরদিকে হাল্কাও, তাই আজকের দিনে উড়োজাহাজ, মহাকাশযান, গ্যাসটারবাইন, মিসাইল প্রভৃতির জন্য ডাক পড়েছে। মূল্যও বড় কম নয়। সোনা ও প্লাটিনামের চেয়েও মূল্যবান। এরা নোবল মেটাল বা বড় ধাতু বলে কথিত হলে কী হবে, এদের চেয়েও টাইটেনিয়াম উচ্চাঙ্গের।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে টাইটেনিয়ামকে ব্যবহার করার জন্য সবাই আগ্রহী। যে কোন যন্ত্রাংশ টাইটেনিয়াম দিয়ে তৈরি করতে পারলে প্রচণ্ড টেকসই এবং মজবুত হতে পারতো। নির্মিত যন্ত্রও হতো অত্যন্ত হাল্কা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত টাইটেনিয়াম নিষ্কাশন করা সম্ভব হচ্ছেনা। অথচ পৃথিবীতে টাইটেনিয়ামের খনিজ রিউটাইল যথেষ্টই পাওয়া যায়।

টাইটেনিয়ামের আকরিক চাঁদে নাকি প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। কোন কোন দেশ চাঁদ থেকে টাইটেনিয়াম আকরিককে বহে আনার জন্য পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা খাড়া করছে। সহজ উপায়ে প্রচুর টাইটেনিয়াম নিষ্কাশনেরও জোর তৎপরতা চলেছে। বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের দৃঢ় বিশ্বাস, ধাতুটি সুলভ হলে সভ্যতার আর এক দিগন্তের উন্মোচন ঘটবে।

টাইটেনিয়ামের চাহিদাও প্রচুর। কোন দেশ যদি উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে যথেষ্ট টাইটেনিয়াম উৎপাদন করতে সমর্থ হয়, তাহলে অচিরেই ধনী হয়ে উঠবে।

লৌহ

ইস্পাত

প্রস্তর যুগের পর তাম্র ও ব্রোঞ্জের যুগ, পরিশেষে লোহার যুগ শুরু হয়। তবে কারও কারও মতে, আদিম কোন কোন জাতি প্রস্তর যুগ থেকে সরাসরি লৌহযুগে প্রবেশ করেছে। পণ্ডিতেরা প্রাচীন কতকগুলো নমুনা পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন, তাম্রযুগেরও আগে—খ্রীষ্টপূর্ব চার হাজার অব্দেরও আগে মানুষের সঙ্গে লোহার পরিচয় ছিল। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, উল্কা-পাতের ফলে যে বিশুদ্ধ লোহা পৃথিবীর বুকে নেমে আসতো সেই লোহার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেছিল। প্রাচীন মিশরীয় রাজবংশের কবর থেকে এমন লোহার অলঙ্কার পাওয়া গেছে। সেদিন অবশ্যই লোহা দুষ্প্রাপ্য ছিল এবং ঐ কারণে রাজ রাজড়ারা অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করতো। লোহা পাথর থেকে লোহাকে নিষ্কাশন করে নেওয়ার পদ্ধতি মানুষ তখনও আবিষ্কার করতে পারেনি।

সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে লোহা প্রথম নিষ্কাশিত হয়েছিল উত্তরপূর্ব এশিয়া মাইনরে। সেখানে বাস করতো হিট্টাইট নামে এক উপজাতি। ওরাই প্রথম বুদ্ধি খরচ করে লৌহ নিষ্কাশন করেছিল এবং খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীর দিকে হিটটাইটদের কাছ থেকে লোহার ব্যবহার তৎকালীন কিছু কিছু সভ্যদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। অল্প পরেই শুরু হয় লৌহ যুগ। এবং যারাই লোহাকে ব্যবহার করেছিল তারাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। নগর সভ্যতা গুলোর পতনের একটা বড় কারণ ছিল লোহা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা।

ভারতবর্ষে লৌহ নিষ্কাশন শুরু হয় বৈদিক যুগে—আর্যদের দ্বারা। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৯০০ অব্দের দিকে। যে যুগে ভারতীয় লোহার মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। পৃথিবীর কোন জাতি তার মত এত উৎকৃষ্ট লোহা নিষ্কাশন করতে পারতো না। কারণ, গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারত আক্রমণ করলে এখানকার লোহার গুণমান দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। বেশ কিছু লোহা তিনি ভারত থেকে স্বদেশে নিয়ে যান এবং কিছু ভারতীয় কারিগরকেও। ভারতের বহু প্রাচীন নমুনা এখনও আছে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর দিকে ভারহুত স্তূপকে রক্ষার জন্য যে লৌহ প্রাচীর তৈরী হয়েছিল তা এখনও আছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে

সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আমলে দিল্লীতে যে লৌহ স্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল তার গায়ে এখনও মরিচা পড়েনি। মরিচা ধরেনি প্রাচীন মন্দির গুলোতে ব্যবহৃত লোহার কড়ি ও বরগায়।

লোহাকে তামার মত মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। সেকালের মানুষ কেমন করে যে লোহা পাথর থেকে এমন উন্নতমানের লোহাকে নিষ্কাশন করতো—তা একরকম জিজ্ঞাসা হয়ে আছে। কেউ কেউ অনুমান করেন, লোহা পাথর অঞ্চলে বসবাসকারীদের বাসভবনে কোন বড় রকমের অগ্নিকাণ্ডের ফলে লোহা আপনা হতে নিষ্কাশিত হয়েছিল।

ভারত যেভাবে উন্নত লোহা নিষ্কাশন করতো, সেই পদ্ধতির নমুনা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রচিত মহান দার্শনিক ও বিজ্ঞানী পতঞ্জলির লৌহশাস্ত্র থেকে জানা যায়। উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে, লোহা পাথরকে এনে ছোট ছোট কাঠকয়লার তৈরি উনানে বা মুচিতে উত্তমভাবে পোড়ানো হতো। তাতেই লোহার মান হতো এত উন্নত। তবে এও ঠিক যে, লৌহ নিষ্কাশন পদ্ধতিটা কেবলমাত্র কারিগর শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ কারিগরদের বিদ্যার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

যাই হোক না কেন, সেকালে লোহা নিষ্কাশন সহজ ছিল না। দাম ছিল প্রচুর। লোহা নিষ্কাশন সহজ হয়েছে ব্লাস্ট ফার্নেস তৈরি করার ফলে, খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জার্মানিই ব্লাস্ট ফার্নেস আবিষ্কার করেছিল। তারপর ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে সেই পদ্ধতি চালু হয় ইংলণ্ডে। দমকা উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহ, তথা "ব্লাস্ট অব্ এয়র" মাঝে মাঝে চুল্লীর ভেতরে প্রবেশ করানো হয় এবং এর ফলে আকরিক লোহা থেকে নানা রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে লৌহ নিষ্কাশিত হয় বলে অনুরূপ নামকরণ।

লোহা পাথরের সঙ্গে অক্সিজেন, সালফার, ফসফরাস, আর্সেনিক প্রভৃতি অপদ্রব্য অল্প পরিমাণে থাকে। সাধারণতঃ ব্লাস্ট ফার্নেস থেকে যে লোহা পাওয়া যায় তাতে ঐ অশুদ্ধিগুলো থেকে যায় এবং লোহা ভঙ্গুর হয়। এমন লোহাকে বলা হয় কাস্ট আয়রণ। অশুদ্ধি হিসেবে থাকে সিলিকন, সালফার, ফসফরাস ও কারবন। তবে লোহার মানটা নির্ভর করে ঐ কারবনের উপর। কারবনের গুরুত্ব অনুযায়ী ব্লাস্ট আয়রণকে রট আয়রণও ইস্পাতে রূপান্তরিত করা হয়। রট আয়রণে কারবনের ভাগ শতকরা ০·১২ থেকে ০·২৫ এবং ইস্পাত থেকে ০·১৫ থেকে ১·৫ ভাগ। রট আয়রণ ও ইস্পাতে তৈরি করতে হলে কারবন ছাড়া অপরাপর অশুদ্ধিগুলোকে তাড়াতে হয়।

প্রথম প্রথম ইস্পাত তৈরি করা হতো ছোট ছোট ক্রুসিবল বা মুচিতে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হেনরি বেসিমার নামে জনৈক প্রযুক্তিবিদ ইস্পাত তৈরির জন্য এক বিশেষ ধরণের চুল্লী তৈরি করেন। আবিষ্কারকের নামানুসারে চুল্লীটির নাম বেসিমার কনভার্টার।

কিছু কিছু গবেষকের মতে অনুরূপ পদ্ধতি ভারতের আবিষ্কার এবং

এই পদ্ধতিতে ভারত দীর্ঘকাল ইস্পাত তৈরি করে আসছিল। সীমাবদ্ধ ছিল ভারতীয় কারিগরদের মধ্যে। কথিত আছে, বেসিমার সাহেব মাদ্রাজে গেলে সেখানকার কারিগরদের ইস্পাত তৈরি করার উন্নত উপায় প্রত্যক্ষ করেন। এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে ভারতীয় পদ্ধতি অনুকরণ করে নির্মাণ করেছিলেন বেসিমার কনভার্টার।

বেসিমার কনভার্টারের একটা মস্ত বড় অসুবিধা, লোহার মধ্যে অশুদ্ধি ফসফরাসকে তাড়ানো যায় না। সেই অসুবিধা দূর করতে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পি. মার্টিন এবং স্যার উইলিয়ম সিমেন্স নামে দুজন প্রযুক্তিবিদ এক উন্নত ধরণের চুল্লী নির্মাণ করেন। চুল্লীর মুখটা উপরের দিকে একেবারে খোলা থাকে বলে নাম ওপেন হার্থ ফারনেস। এবং যে পদ্ধতিতে কাস্ট আয়রণ থেকে ঐ চুল্লীতে ইস্পাত প্রস্তুত হয় তার নাম আবিষ্কারকদের নামে সিমেন্স মার্টিন পদ্ধতি।

বেসিমার কনভার্টার তো বটেই, সিমেন্স মার্টিন পদ্ধতিও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। তাছাড়া এই পদ্ধতি অতি ধীরগতি সম্পন্ন। তাই জ্বালানীর খরচ হয় যথেষ্ট পরিমাণে। তাই বর্তমানে অল্প সময়ে অধিক ইস্পাত তৈরি করতে এবং জ্বালানীর খরচ কমাতে এল. ডি পদ্ধতির চালু হয়েছে। পদ্ধতিটির আবিষ্কারক অস্ট্রিয়ার দুই প্রযুক্তিবিদ লিঞ্জ এবং ডন উইঞ্জ। আবিষ্কার করেন ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। আবিষ্কারকদের নামের আদ্য অক্ষর দিয়ে পদ্ধতিটির নামকরণ করা হয়েছে।

এল. ডি. পদ্ধতি বেসিমার কনভার্টারের উন্নত রূপ। এক মুখ খোলা সেই নাসপাতির মত দেখতে অগ্নিসহা মৃত্তিকার আস্তরণ দেওয়া চুল্লী। তবে উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহের পরিবর্তে উক্ত পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ অক্সিজেনকে চুল্লীর ভেতরে পাঠানো হয়।

বর্তমানে ঐ এল. ডি. পদ্ধতি ছাড়া অন্যান্য পদ্ধতি প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে। কাথাও কোথাও ওপেন হার্থ ফারনেসের অল্পস্বল্প ব্যবহার থাকলেও বেসিমার কনভার্টারকে আর ব্যবহার করা হচ্ছে না।

ক্যালসিয়াম কারবাইড

টি. ডব্লু. উইলসন নামে ছিলেন এক রসায়ন বিজ্ঞানী। তখন প্রকৃতিতে পাওয়া বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ থেকে মৌলগুলোকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য

বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রবল সাড়া পড়ে গেছে। বহুজনে বহু মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন, কেউ কেউ আবিষ্কার করেছেন ধাতু নিষ্কাশন পদ্ধতি, ইত্যাদি। এক রকম সব রসায়ন বিজ্ঞানীই মেতে উঠেছেন। যেন একটা প্রতিযোগিতা। কে পারে কত মৌলকে আবিষ্কার করতে। উইলসন তাঁদের ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনিও চাইলেন রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিজের নামকে অক্ষয় করে রাখতে।

কিন্তু কী নিয়ে গবেষণা করবেন? অনেক ভেবে চিন্তে দেখলেন, প্রকৃতিতে চুনাপাথরের পরিমাণ প্রচুর। চুনাপাথর ক্যালসিয়াম নামে একটি ধাতুর যৌগ। অথচ ধাতুটিকে আজও বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি কেউ। তাই তিনি বসে গেলেন ক্যালসিয়াম ধাতুটিকে উপহার দিতে।

উইলসন অবশ্য সরাসরি ক্যালসিয়াম কারবোনেটকে (চুনাপাথর) গ্রহণ করেন নি। চুনাপাথরকে পোড়ালে যে পোড়া চুন বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায়—সুবিধা হবে বলে ওকেই গ্রহণ করেছিলেন। চেয়েছিলেন পোড়াচুনকে কয়লার বা আলকাতরার সঙ্গে পুড়িয়ে বিজারিত করিয়ে ধাতুটাকে নিষ্কাশন করে নেবেন।

কাজে নেমে পড়লেন উইলসন। পোড়াচুন কিন্তু সহজে গলে না। ওকে গলাতে হলে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে প্রায় ২৭৫০° সেলসিয়াসে উত্তপ্ত করতে হয়। কিন্তু ওকে গলিয়ে ফেলাত চলবে না। ওর ভেতর থেকে অক্সিজেনকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং অক্সিজেনকে বিচ্ছিন্ন করার সহজ উপায় ছিল কারবনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটানো।

উইলসন ভাবলেন, ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা পোড়াচুনকে যদি আলকাতরার সঙ্গে মিশিয়ে অনুরূপ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা যায় তাহলে ক্যালসিয়াম ধাতুটিকে পাওয়া যাবে। সিদ্ধান্তটিকে যাচাই করার জন্য আলকাতরাসহ পোড়াচুনকে উত্তপ্ত করলেন। প্রচুর তাপমাত্রা প্রয়োগ করা সত্ত্বেও তিনি ক্যালসিয়ামকে লাভ করতে ব্যর্থ হলেন। পরিবর্তে লাভ করলেন বেশ কঠিন এক ধরণের পদার্থ।

মনটা খারাপ হয়ে গেল উইলসনের। পদার্থটি অপ্রয়োজনীয় মনে করে কাছাকাছি একটা নদীর জলে ফেলে দিলেন। বাজে জিনিস কোথায় আর ফেলবেন।

কিন্তু একী? জলে ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলে এঝটা আলোড়নের সৃষ্টি হলো এবং প্রচুর পরিমাণে গ্যাস নির্গত হলো। পোড়াচুনকে জলে ফেলে দিলে অবশ্য প্রচণ্ড বিক্রিয়া করে। কিন্তু এ বিক্রিয়া যেন আরও তীব্র। কী ভেবে পকেট থেকে দেশলাইটা বার করে জেবলে ফেললেন এবং জবলন্ত কাঠিটা ঐ গ্যাসের উপর ফেলে দিলেন।

আর যায় কোথায়! দপ করে গ্যাসটা জবলে উঠলো এবং কালো কালো ধোঁয়া ছড়াতে শুরু করলো।

উইলসন ঘরে ফিরে এলেন। পুনরায় তৈরী করলেন আলকাতরা ও পোড়াচুনের মিলনে উৎপন্ন সেই অচেনা পদার্থটিকে। এবং পদার্থটিকে সনাক্ত করতে যত্নবান হলেন।

অনেক পুঁথিপত্র ঘেঁটে এবং অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন, যৌগটি ক্যালসিয়াম কারবাইড ছাড়া অন্য কিছু নয়। এও বুঝতে পারলেন, যৌগটির আবিষ্কর্তা তিনি নন। প্রায় ত্রিশ বছর আগে বিজ্ঞানী ভোলার কয়লার সঙ্গে দস্তা ও ক্যালসিয়ামের সংকরকে মিশিয়ে এবং প্রচণ্ড উত্তাপে গলিয়ে তৈরি করে গেছেন।

এবারও মন খারাপ হলো উইলসনের। তবে বুঝতে পারলেন, ভোলারের পদ্ধতিটি বেশ জটিল এবং অত্যন্ত খরচ বহুল। তাঁরই আবিষ্কারের পদ্ধতি সহজ। তাই তিনি তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতির কথা জানিয়ে দিলেন বিজ্ঞানী মহলে।

এবার উইলসনের পদ্ধতিকে যাচাই করার পালা। যাচাই করতে এগিয়ে এলেন সে যুগের ধুরন্ধর রসায়ন বিজ্ঞানী হেনরী ময়ঁসা। উইলসনের পদ্ধতিতে তিনিও ক্যালসিয়াম কারবাইড লাভ করায় জয়যুক্ত হলেন।

উইলসনের পদ্ধতিটি সহজে জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। সহজ হলো ক্যালসিয়াম কারবাইডকে জলের সঙ্গে ক্রিয়া করিয়ে অ্যাসিটিলিন নামক গ্যাসের উৎপাদন। এই গ্যাস দাহ্য। তাই কায়দা করে যান্ত্রিক সরঞ্জামের মাধ্যমে তীব্র আলো উৎপন্ন করা গেল আর ক্যালসিয়াম সায়নামাইড নামক সার উৎপন্ন করতেও খরচ কম পড়লো।

বর্তমানে অবশ্য উইলসনের পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হচ্ছে না। অ্যাসিটিলিন তৈরির আরও সহজ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে পেট্রোলিয়াম থেকে অ্যাসিটিলিন তৈরির সহজ উপায়। বর্তমানে ইউরিয়া প্রভৃতি উন্নত নাইট্রোজেন ঘটিত সার আবিষ্কৃত হওয়ায় সায়নামাইডও তৈরি হচ্ছে না। শুধু এক ধরনের প্লাস্টিক তৈরির জন্য ক্যালসিয়াম সায়নামাইডের দরকার হয়। তৈরি করা হয় বিদ্যুৎচুল্লীতে স্বল্প ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে ক্যালসিয়াম কারবাইড মিশিয়ে এবং নাইট্রোজেন গ্যাসের উপস্থিতিতে প্রায় ১২০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায়।

রবার

মানব সভ্যতার ইতিহাসে রবারের অবদান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ছোটদের নানা ধরণের খেলনা থেকে শুরু করে সভ্যতার নানান উপকরণ সাইকেল ও

মোটরগাড়ীর টায়ার টিউব পর্যন্ত অনেক কিছুই তৈরি হয়।

রবার হচ্ছে এক রকমের গাছের আঠা। অথচ সভ্যজগৎ ঐ গাছটির সংস্পর্শে আসে অনেক পরে—আমেরিকা আবিষ্কারের পরে।

রবার গাছের আদি বাসস্থান আমেরিকার ঘন অরণ্য অঞ্চল। বিশেষ করে ব্রাজিলের ঘন অরণ্যে। সেখানকার আদিবাসীরাও জানতোনা ঐ গাছের বৈশিষ্ট্য। ওর বৈশিষ্ট্যের কথা প্রথম সভ্যজগতের সামনের তুলে ধরেছিলেন আবিষ্কারক ক্রিস্টোফার কলম্বাস। বুনো গাছ। সরল ও সুন্দর দেখতে। কলম্বাস ঐ গাছ সম্বন্ধে বর্ণনা অনেকের কাছে দিয়েছিলেন।

কলম্বাসের কৃপায় আমেরিকা সভ্যজগতের সংস্পর্শে আসার পর বহুজনে বহু উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা করেন সেখানে। রাজ্যলোভী ও লুণ্ঠন পিপাসুরা যেমন গিয়েছিলেন, তেমনই গিয়েছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক ও বিজ্ঞানীরা। নতুন দেশের নতুন নতুন গাছপালা ও প্রাণী সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে। এমনই একজন প্রকৃতিপ্রেমিক ছিলেন হেনরী উইকহাম। ইনি ছিলেন ইংলণ্ডের লোক। গাছপালার প্রতি সখ ছিল ছেলেবেলা থেকে। যেখানে নতুন ধরণের গাছপালা দেখতেন তার সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে চেষ্টা করতেন এবং বাগানে রোপন করে যত্ন নিতেন।

আমেরিকা আবিষ্কৃত হলে তিনি ছুটে যান সেখানকার নতুন নতুন গাছ-পালাকে দেখতে। তার জন্য বহু অরণ্যে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। একমাত্র ব্রাজিলের অরণ্যেই এমন সরল কাণ্ড বিশিষ্ট দীর্ঘ গাছকে দেখতে পান। শুধু এক জাতের নয়, বেশ কয়েক জাতের। উচ্চতায় ৩০ থেকে ৬০ ফুটের মত। দেখতেও সুন্দর। ওদের ছালকে কেটে ফেললে দুধের মত সাদা অথচ চটচটে তরল পদার্থের নিঃসরণ ঘটে।

হেনরী উইকহ্যাম ঐ জাতীয় প্রায় ১৭ রকমের গাছের বীজ সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন স্বদেশে। তারপর লণ্ডনের বিখ্যাত বোটানিক্যাল গার্ডেনে বীজগুলো থেকে চারা উৎপাদন করেন। পরে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা ওর নামকরণ করেন হিভিয়া। সাধারণভাবে ওকে বলা হয় রবার গাছ।

রবার গাছের ছালকে কেটে আঠা সংগ্রহ করা হয়। ঐ আঠাকে বলা হয় কাঁচা রবার বা লেটেক্স। লেটেক্সে শতকরা ৬০ ভাগ জল এবং ২৮ ভাগ রবার। বাদ বাকি ২ ভাগ কিছু কিছু ধুনো জাতীয় পদার্থ, কোন কোন খনিজ পদার্থ, এবং অতি অল্প পরিমাণে প্রোটিন ও শর্করা।

রবারের গুণপনা সম্বন্ধে প্রথম গবেষণা করেছিলেন রসায়ন বিজ্ঞানী প্রিস্টলী ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ওর নানা গুণের কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁরই আবিষ্কারকে অবলম্বন করে রবারকে ব্যবহারের উপযোগী করার চেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু ওর আঠালোভাবটাকে দূর করতে গিয়ে দেখা দেয় নানা সমস্যা। শেষ পর্যন্ত চার্লস গুডইয়ার ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে রবারের আঠালো-ভাবকে দূরীকরণে সমর্থ হন এবং সেই থেকে নানা কাজে রবারের ডাক পড়ে।

পৃথিবীর নানা দেশে রবারের চাষ হয়ে থাকে। বিশেষ করে শ্রীলঙ্কা এবং মালয় উপদ্বীপ প্রচুর পরিমাণে রবার উৎপন্ন করে। দক্ষিণ ভারতেও রবারের চাষ হয়। বেশ লাভজনক ব্যবসা। চাহিদাও ক্রমশঃ বাড়ছে। সেই চাহিদাকে মেটাতে কৃত্রিমভাবেও রবারকে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

নোঙর

মানুষ যখন আরণ্যক জীবন থেকে মুক্ত হয়ে প্রথম নদী কিংবা হ্রদের বুকে বাসস্থান গড়ে তুলেছিল তখনই নৌকা গড়েছিল। সে নৌকা কিন্তু আজকের মত ছিলনা। কাঠের বড় বড় গুঁড়ি কেটে ভেতরটা কেটে বা পুড়িয়ে নৌকার মত করে ফেলতো। প্রাচীন মিশরীয়রা প্যাপিরাসের বান্ডিল ভাসিয়ে নৌকার মত এখানে ওখানে যাতয়াত করতো।

সেকালে নৌকা ছাড়া উপায় ছিলনা। হাঁটার পরিশ্রম লাঘব করতে এবং মালপত্র বহন করতে একমাত্র নৌকাই ছিল সম্বল। কিন্তু নৌকাকে তীরে দাঁড় করিয়ে রাখার তো প্রয়োজন হতো! তার বেলায়?

হ্যাঁ, নৌকাকে এক জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড় করিয়ে রাখার একমাত্র উপায় নোঙর। নোঙর না হলে নৌকা অচল। তাই তারা যখনই নৌকা নির্মান করেছিল তখনই দাঁড় করিয়ে রাখার হাতিয়ার আবিষ্কার করেছিল। ঐ হাতিয়ারই নোঙর। প্রথম প্রথম হয়ত নদীর তীরে অগভীর জলে খুঁটি পুঁতে খুঁটির সঙ্গে নৌকাকে বুনো লতা দিয়ে বেঁধে রাখতো। এটা কেবল অনুমান। কোন নমুনা পাওয়া যায়নি।

প্রাচীন নমুনা যা পাওয়া গেছে, সে অনেক পরের ঘটনা। মিশরীয় সভ্যতার সময়ের ঘটনা। কিন্তু নৌকা আবিষ্কৃত হয়েছে মিশরীয় সভ্যতা বিকাশের অন্ততঃ পাঁচ সাত হাজার বছর আগে। মিশরের ফ্যারাওদের সমাধি থেকে নোঙরের কিছু কিছু নমুনা পাওয়া গেছে। সেই নমুনা থেকে জানা যায়, মিশরীয়রা নোঙরের জন্য ভারী ভারী পাথরকে দড়িতে বেঁধে নৌকা থেকে জলে নামিয়ে দিত। তাতেই বেশ বড় বড় নৌকাকে নোঙর করাতে পারতো।

না, মিশরীয়দের নৌকার নোঙর সেই পাথর চৌকো কিংবা গোলাকার ছিলনা। তাকে সুন্দরভাবে কেটে ইংরাজী T অক্ষরের মত করা হতো। এবং T আকারের পাথরের টুকরাই আদি নোঙর। বড় বড় নৌকার ক্ষেত্রে

তারা একাধিক নোঙরও ব্যবহার করতো।

নোঙরের উন্নতি সাধন করেছেন গ্রীকরা। তাঁরাই প্রথম পাথরের পরিবর্তে লোহার নোঙর ব্যবহার করেন। সেদিনের সেই লোহার নোঙরের উদ্ভাবক থুসকান নামে গ্রীসের এক প্রযুক্তিবিদ। গ্রীকদের এই নোঙরে কয়েকটা ফলা থাকতো এবং ফলাগুলোকে বেশ সুচালো করা হতো। ফলে দড়িতে বেঁধে ওকে জলে ফেলে দিলে ফলাগুলো কাদা বা নরম পলিতে কিছুটা পুঁতে যেতো এবং নৌকাও তীরের কাছে স্থির হয়ে থাকতে পারতো।

গ্রীকদের তৈরি ঐ লোহার নোঙরের প্রচলন দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল। আরও উন্নত নোঙর তৈরির জন্য প্রথম মাথা ঘামিয়েছিলেন ইংরাজরা। ৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা বুদ্ধি করে উত্তপ্ত লোহাকে পিটিয়ে তথা ফোর্জিং করে নোঙর বানিয়েছিলেন। এতে নোঙর খুব শক্ত হতো এবং সহসা নষ্টও হতো না। তবে আকারটা ছিল গ্রীকদের নোঙরের মতই তীক্ষ্ম ফলাযুক্ত। শুধু নোঙরের কর্মক্ষমতাকেই বাড়াতে পেরেছিলেন তাঁরা।

নোঙরের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয় ভৌগোলিক আবিষ্কারের সময়ে। এবার নৌকার আকার অনেক বড় হলো, তথা জাহাজে রূপান্তরিত হলো। নদী ছেড়ে একেবারে মহাসাগরে যাত্রা করলো নৌকা। যদিও এদের অনেক আগে ভাইকিংরা উন্নত মানের নৌকা তৈরি করে মহাসমুদ্রগুলোকে একেবারে চষে ফেলেছিল। তাদের নোঙর কিন্তু উন্নত ছিল না। সেই ইংরাজী T অক্ষরের মত ছিল।

পাশ্চাত্যের নাবিকেরা নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠলে জাহাজকে ভালভাবে চালানোর যেমন ব্যবস্থা করেছিলেন, তেমনই নোঙরকে জলে ফেলা এবং জল থেকে তোলার সহজ উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। তথাপি নোঙরের আকারের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেন নি। সেই পুরাতনের অনুকরণ। অপরদিকে নোঙরের ফলাগুলোকে লোহার দণ্ডের সঙ্গে জোড়া লাগতো বলে এবং এই জোড়া দেওয়ার ব্যবস্থাটা নিম্নমানের হওয়ার জন্য অনেক সময় জোড় খুলে গিয়ে বিপত্তিও ঘটাতো।

নোঙরের ফলাগুলোকে ভালভাবে জোড়া দেওয়ার ব্যাপারে অনেকে ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। তারই ফলশ্রুতি ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্যে বাঁকানো ফলাযুক্ত নোঙরের উদ্ভাবন। উদ্ভাবক ছিলেন ইংলণ্ডের প্লাইমাউথের জাহাজের এক কেরানী। নাম তাঁর পেরিং। দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবন করেছিলেন উন্নত এই নোঙর। নোঙরটির নাম অ্যাডমিরালিটি নোঙর। তবে লোহাকে জোড়া দেওয়ার উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলেই পেরিং এমন উন্নত ও দীর্ঘস্থায়ী নোঙর প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন। নোঙরের ফলাকে বাঁকিয়ে পূর্বেকার নোঙরের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন।

অ্যাডমিরালিটি নোঙরের পর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয় স্টকলেস নোঙর। এই নোঙর আরও দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত হলো এবং ব্যবহারেরও

সুবিধা হলো। ফলে অ্যাডমিরালিটি নোঙরের স্থান দখল করলো স্টকলেস নোঙর।

স্টকলেস নোঙরেরও অসুবিধা ছিল। জলের তলায় নামিয়ে দিলে বাঁকানো ফলাগুলোর অন্ততঃ একটা মাটি থেকে উপরে জেগে থাকতো। তাতে অনেক সময় নোঙরের দড়ি জড়িয়ে যেতো এবং বেশ অসুবিধার সৃষ্টি করতো। ঐ অসুবিধাকে দূর করতে আরও কয়েক ধরণের নোঙরের উদ্ভাবন হয়েছিল। তাদের মধ্যে প্লাউ, নর্থহিল এবং ড্যানফোর্থ নোঙরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত।

একে একে বহু নোঙর উদ্ভাবিত হওয়ায় নোঙরগুলোর কার্যকারিতাকে পরীক্ষা করতে এবং উৎকৃষ্ট নোঙর বাছাই করতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলন্ডে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি তখন প্রচলিত সব নোঙরকে ভালভাবে খতিয়ে দেখেন এবং প্রত্যেকের গুণগত মান বিচার করেন। পরিশেষে কমিটি সব নোঙরকে বাতিল করে একটা আদর্শ নোঙরের মডেল তৈরি করেন। মডেলটি ট্রটম্যানের মডেল নামে প্রসিদ্ধ। ইংলন্ডে এবার প্রচলিত হয় ঐ মডেল অনুযায়ী নোঙর।

লোহা নিষ্কাশন পদ্ধতির উন্নতি হলে এবং ইস্পাত সহজলভ্য হলে নোঙরের জন্য আর কাঁচা লোহা ব্যবহার করা হলো না। জাহাজের উন্নতিও হলো অনেকখানি। কাঠের তৈরি জাহাজের পরিবর্তে সমুদ্রে ভাসলো লোহার তৈরি জাহাজ। বিশাল আয়তনের সেই সব জাহাজের জন্য প্রয়োজন হলো ভারী ভারী নোঙর এবং একসঙ্গে অনেকগুলো নোঙর। এক একটি নোঙরের ওজন হতো দশ টনের মত। কথিত আছে, বিখ্যাত টাইটানিক জাহাজের এক একটি নোঙরের ওজন ছিল ১৫ টন।

তারপরেও নোঙরের বৈচিত্র্য এসেছে। বিশেষ করে যুদ্ধ জাহাজগুলোতে ব্যবহার করা হচ্ছে কত হরেক রকমের নোঙর। ভবিষ্যতে আরও বৈচিত্র্য আসবে।

লাইট হাউস

নৌকা ও জাহাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীনকালেই অন্ধকারে নাবিকেরা যাতে সঠিক পথে নৌকাকে পরিচালনা করতে পারেন তার জন্য লাইট হাউসের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেকালে আবার বাণিজ্য এবং দেশবিদেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার একমাত্র মাধ্যম ছিল নৌকা ও জাহাজ।

দূর দূরান্তরে যেতে হলে দিনের বেলা ছাড়াও রাত্রিতে চালাতে হতো। তাই লাইট হাউসের পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আগেকার দিনে আজকের মত মাঝ সমুদ্রের উপর দিয়ে জাহাজকে চালনা করা হতো না। উপকূল বরাবর যাতায়াত করতো। তবুও ছিল ডুবো পাহাড়ের ভয় এবং দিক্‌ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা। তাছাড়া উপকূলভাগে চড়াও বিস্তর। চড়া, ডুবো পাহাড় এবং খাঁড়ির মুখে রাত্রিতে আলো জ্বালিয়ে নাবিকদের সতর্ক করে দেওয়া হতো। আলো জ্বালানো হতো উঁচু একটা স্তম্ভের উপর—যাতে নাবিকেরা দূর থেকে বুঝতে পারেন। নৌকা ও জাহাজকে সতর্ক করে দেওয়ার যে ব্যবস্থা তাকেই বলা হয় লাইট হাউস। বাংলায় কেউ বলেন আলোক স্তম্ভ, আবার কেউ বলেন বাতিঘর।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, সমুদ্রে ডুবো পাহাড়ের অবস্থিতির কথা জানানোর উদ্দেশ্যে আরও একটা কৌশল অবলম্বন করা হতো। কাঠের পাটাতনের উপর বিরাট এক ঘণ্টাকে ঝুলিয়ে বেঁধে দেওয়া হতো পাহাড়ের সঙ্গে। সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় এবং বাতাসে আন্দোলিত হতো ঘণ্টা এবং বাজতো ঢং ঢং করে।

যাই হোক, প্রাচীন লাইট হাউসের নমুনা কিন্তু অনেক আছে। সবচেয়ে প্রাচীন নমুনা—যা এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে, সেটি মিশরে অবস্থিত আলোকজান্দ্রিয়ায় আলোক স্তম্ভ। এটি তৈরি হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৬ অব্দে মিশরীয় রাজা বা ফ্যারাওদের আমলে। উচ্চতায় ৮৫ ফুট। প্রায় ৫৬ কিলোমিটার দূর থেকে ঐ আলোক স্তম্ভের আলোককে দেখতে পেতেন নাবিকেরা। এটিকে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম একটি আশ্চর্যরূপে ধরা হতো।

সেকালে খনিজ তেল কিংবা খনিজ কয়লার সন্ধান মানুষ লাভ করতে পারেনি বলে আলোক উৎপাদনের জন্য প্রচুর পরিমাণে কাঠ কিংবা কাঠ কয়লাকে জ্বালানো হতো—সারারাত ধরে। অন্য কোন কারিগরি ছিল না।

ভারতেও সেকালে লাইট হাউসের প্রচলন ছিল। এককালে ভারত নৌবিদ্যায় পৃথিবীর সব দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সুদূর সুমাত্রা জাভা প্রভৃতি দ্বীপে বাণিজ্যের জন্য জাহাজ যোগে যাতায়াত করতো। দাক্ষিণাত্যে চোল রাজাদের আমলে, বিশেষ করে রাজেন্দ্র চোলের সময়ে ভারতের বহির্বাণিজ্য আরও প্রসার লাভ করেছিল এবং যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল চোল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তাই জাহাজ যোগে ঘন ঘন যাতায়াত করতে হতো বলে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সমুদ্রতীরে মহাবলীপুরম শহরের পাহাড়ের উপর স্থাপিত হয়েছিল বিরাট এক আলোক স্তম্ভ।

খ্রীষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীর পর থেকে ভারতের গৌরবসূর্য অস্তমিত হয়ে যায় এবং গ্রীক আমলের পরে পাশ্চাত্যেও সূচনা হয় অন্ধকার যুগের। উক্ত সময়কালের মধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আলোক স্তম্ভ তৈরি হয় নি।

আলোক স্তম্ভের উন্নতি ঘটে ইওরোপের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের যুগে। দেশবিদেশে বাণিজ্য যাত্রার জন্য প্রবলভাবে সাড়া পড়ে যায় সারা ইওরোপে। তাতে নতুন নতুন আলোক স্তম্ভ যেমন স্থাপন করা হয়েছিল, তেমনই আলোক স্তম্ভের আলোককে আরও তীব্র এবং আরও জোরদার করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। প্রথম প্রথম কাঠকে কাজে লাগানো হতো ঠিকই। তবে কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের পর কাজটা আরও সহজ হয়ে উঠলো। পরে আলোকস্তম্ভের আলোককে আরও জোরদার করার জন্য ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম প্রতিফলক লাগানোর ব্যবস্থা হয়। অবশেষে বিদ্যুতের যুগ শুরু হলে আলোকস্তম্ভে কয়লা ও পোট্রোলিয়ামের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানো হলো।

বর্তমানে এই ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে। কোন কোন আলোকস্তম্ভে দশ বার হাজার ওয়াট ক্ষমতাযুক্ত শক্তিশালী টাংস্টেন ফিলামেণ্টের বাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। ঐ বাতিকে ঘিরে থাকে অনেকগুলো শক্তিশালী লেন্স। ফলে বাতি থেকে নির্গত আলোককে লেন্সের সাহায্যে একত্রিত করা হয় এবং একটা নির্দিষ্ট দিকে চালনা করা হয়। তীব্রতা বেড়ে ওঠে কয়েক গুণে। যান্ত্রিক সরঞ্জামের সাহায্যে সেই তীব্র আলোককে আরও তীব্র করা হয় এবং কিছুক্ষণ অন্তর সমুদ্রের দিকে প্রেরণ করা হয়।

বর্তমানে পৃথিবীতে বাতিঘরের সংখ্যা ত্রিশ হাজারেরও বেশী। সমুদ্রের দুর্গম জায়গায়—যেখানে এখনও বিদ্যুৎকে পাঠানো সম্ভব হয়নি সেখানে এখনও খনিজ তেলকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও ডুবো পাহাড় অঞ্চলে নাবিকদের বিপদ সঙ্কেত জানাতে এক একটা জাহাজকেও রাখা হয়েছে। সেখানকার কর্মীরা নিয়মিতভাবে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করে থাকেন। তেমন অঞ্চলের কর্মীদের জন্য খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করতে হয় জাহাজের সাহায্যে এবং নির্জন জায়গা বলে কিছুদিন অন্তর অন্তর কর্মীদের বদল করতে হয়।

বর্তমানে কোথাও কোথাও আলোকের পরিবর্তে বেতার সঙ্কেতেরও ব্যবহার হচ্ছে। তবু আলোক স্তম্ভের দিন এখনও শেষ হয়ে যায়নি।

কাপড় কাচার মেসিন

ময়লা কাপড়চোপড় ব্যবহার করা যায়না। তাইতো ওদের পরিষ্কার করতে হয়। কিন্তু কাপড় কাচার ঝামেলা যে অনেক! সাবান দাওরে, তাকে কাচরে, জলে ভালভবে ধোওরে, রোদে শুকাও রে, কত ঝামেলা—কত

পরিশ্রম! তার উপর যদি অনেকগুলো কাপড়কে একসঙ্গে পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয় তাহলে সে এক প্রাণান্তকর ব্যাপার! তবে লোক ধরে কিংবা ধোপাখানায় পাঠিয়েও কাচিয়ে আনা যায়। কিন্তু খরচের অংকটা!

স্বল্প খরচে এবং অতি অল্প পরিশ্রমে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে কাপড় কাচার পদ্ধতি আবিষ্কারের কথা কেউ কেউ চিন্তা করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে—যন্ত্রযুগের শুরুতে। সে সময় আশ্চাত্যে নানা ধরণের যন্ত্র অনেকে আবিষ্কার করে একচেটিয়া ব্যবসার মাধ্যমে বিত্তশালী হয়ে উঠেছিলেন। তাই অনেকেরই মাথায় এসেছিল, কাপড় কাচার যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারলে প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা। কেননা ধনী-দরিদ্র প্রত্যেকেরই কাপড়চোপড় পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়।

যাঁরা কাপড়কাচা মেসিন আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হ্যামিলটন স্মিথ নামে একজন তরুণ প্রযুক্তিবিদ। দীর্ঘকাল প্রচেষ্টা চালাবার পর ১৮৩৮ সালে তিনি তৈরি করেন একটা মেসিন। কাঠের একটা টব বানিয়ে তাতে একটা প্যাডেল যুক্ত করলেন। টবের ভেতরে ময়লা কাপড় চোপড়কে জলে ভিজিয়ে সাবানের গুঁড়া যোগ করে আচ্ছা করে ঘোরাতে হতো প্যাডেলকে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হ্যামিলটনের। তিনি যেমনটি আশা করেছিলেন তেমনটি হলোনা। ময়লা সাফ হলো বটে, তবে পরিশ্রমও বড় কম হলোনা। তার উপর কাপড়গুলো কুঁচকে গেল এবং দু-চারবার এইভাবে সাফ করার পর ছিঁড়েও গেল। তাই জনপ্রিয় হলোনা তাঁর মেসিন এবং বিত্তশালীও হওয়া গেল না।

হ্যামিলটন সাহেবের আশা পূর্ণ না হলেও তাঁর যন্ত্রটির বৈশিষ্ট্য অনেককে মুগ্ধ করেছিল। প্রাথমিক প্রচেষ্টা অনেক সময় ফলপ্রসূ হয়না বটে, কিন্তু কালে কালে একাধিক প্রতিভা নিয়োজিত হলে সার্থকতার দিকে এগিয়ে যায়। ঠিক তেমনটি হয়েছে ঐ-সাধারণ কাপড় কাচার মেসিনের ক্ষেত্রে। দীর্ঘকাল বহু প্রতিভা নিয়োজিত হয়েছিল ঐ মেসিনের ত্রুটিগুলোকে দূর করতে। কিন্তু না, পারেননি কেউ। শেষে এই বিংশ শতাব্দীতে বৈদ্যুতিক মোটর আবিষ্কৃত হলে ঐ মোটকেরর সাহায্যে প্যাডেল ঘোরাবার ব্যবস্থা হলো। তখনই প্যাডেল ঘোরাবার কষ্ট লাঘব হলো। যন্ত্রই ঘোরালো প্যাডেলকে।

এবার তৈরি হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের কাপড় কাচার মেসিন। হ্যামিলটন সাহেবের মেসিনের যে ত্রুটিগুলো ছিল তা বহু প্রতিভাবানের হাতে পড়ে সম্পূর্ণ না হলেও অনেকাংশে মুক্ত হলো। বিনা পরিশ্রমে কাপড় কাচার মেসিন উদ্ভাবিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ ওকে গ্রহণও করলো। এতদিনে জমে উঠলো বাজার।

কিন্তু গবেষণা চলতে থাকলো। বিশেষ করে কাপড় ভিজিয়ে রাখার টবটাকে নিয়ে। কাঠের পরিবর্তে পরীক্ষামূলকভাবে তামা, দস্তা, ই...

অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুকে ব্যবহার করা হলো। কিন্তু কোন ধাতুই সুবিধে হলোনা। সব ধাতুই সাবান কিংবা ডিটারজেন্টের সংস্পর্শে কিছুকাল থাকলে নষ্ট হয়ে যেতো। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি করা হলো চীনামাটির টব।

তবুও অসুবিধা ছিল। মেসিনটির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এ্যাজিটেটর নামে শঙ্কু আকৃতির একটি যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে। যন্ত্রের তলদেশে এবং পাশে যুক্ত করা হলো কতকগুলো পাখা। বিদ্যুতের সাহায্যে পাখা ঘোরানোর ফলে যন্ত্রে রাখা ময়লা কাপড় চোপড় ভালভাবে সাবানের গুঁড়া কিংবা ডিটারজেন্টের সংস্পর্শে এসে আন্দোলিত হতে পারলো। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষ লাভ করলো উন্নত এবং স্বয়ং চালিত কাপড় কাচার মেসিন। সেই সঙ্গে কাপড় শুকানো ও ধোলাই মেসিনও তৈরি হলো।

হ্যামিলটন সাহেবের সেই সাধারণ মেসিন থেকে এত কাণ্ডের পর উন্নতরূপ পরিগ্রহ করলো। হ্যামিলটন নিজে ব্যবসা করতে পারলেন না বটে, কিন্তু আবিষ্কারকের গৌরব লাভ করলেন।

পাশ্চাত্যে কাপড় কাচার মেসিন বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু ভারতে উক্ত মেসিনের ব্যবহার সীমিত।

টাইপরাইটার

টারপরাইটার নামক মেসিনটি আমাদের অতি পরিচিত। স্কুলে, কলেজে, অফিসে, আদালতে সর্বত্রই ওকে ব্যবহার করা হয়। অনেকে টাইপ করতেও জানেন এবং টাইপ করা শিখতে সবারই আগ্রহ। এই যে অতি সাধারণ এবং অতি পরিচিত মেসিন কোন্ কারিগরের যে মস্তিষ্ক প্রসূত সে খবর বড় একটা কেউ রাখেন না।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। অন্ধদের শিক্ষাদানের জন্য এক ধরণের অক্ষর মালার প্রচলন হয়েছিল। অক্ষরগুলো অবশ্য বেশ বড় বড় এবং উত্তল। অন্ধরা সেই সব অক্ষরকে হাত দিয়ে অনুভব করতেন এবং অক্ষর সম্বন্ধে মনে মনে একটা ধারণা গড়ে তুলতেন। এই পদ্ধতির আবিষ্কর্তা ছিলেন লুই ব্রেইল। তাই পদ্ধতিটির নাম ব্রেইল পদ্ধতি। ব্রেইল অবশ্য নিজে অন্ধ ছিলেন। মাত্র তিনবছর বয়সে তিনি অন্ধত্ব বরণ করেছিলেন। অথচ

অসাধারণ প্রতিভাবান ছিলেন তিনি। পরিণত বয়সে অন্ধদের শিক্ষাদানের নিমিত্ত এই পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন। এখনও সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

সম্ভবতঃ সেদিনের সেই ব্রেইল পদ্ধতি দেখে অনেকে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন উত্তল অক্ষরগুলোর উপর কালির পোঁচ চাপিয়ে এবং কাগজের উপর ছাপ দিয়ে ছাপার অক্ষরের মত ঝরঝরে লেখা ফুটিয়ে তুলতে। ততদিনে অবশ্য ছাপার অক্ষরের প্রচলন হয়ে গেছে এবং এখানে সেখানে গড়ে উঠেছে ছাপাখানা। কিন্তু ছাপাখানায় অক্ষর সাজাতে হয়, এবং একই সঙ্গে অনেকগুলো কাগজ ছাপতে হয়। অন্য কিছু ছাপাতে গেলে পুনরায় অক্ষরগুলোকে সাজাতে হয় এবং পরিশ্রমও বড় কম হয় না। সামান্য টুকিটাকি কিছু ছাপতে গেলে ছাপাখানায় না গিয়ে এমন কোন যন্ত্র কী বানানো যায় না!

অনেকে এই ধরণের মন্ত্র বানোতে সচেষ্ট হলেও ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সম্ভব হয়নি। সম্ভবতঃ ঐ বছর আমেরিকার একটি কোম্পানী টাইপ করার উপযোগী একটি যন্ত্র উপহার দেন। নাম দিয়েছিলেন টাইপোগ্রাফার।

প্রাথমিক এই মেসিন টাইপোগ্রাফার আকারে যেমন বড় ছিল, তেমনই দেখতে ছিল অত্যন্ত বিদ্ঘুটে। সহজে তাই বহনও করা যেত না। ফলে এই মেসিন পরিত্যক্ত হয় এবং টাইপোগ্রাফার অপেক্ষা উন্নত যন্ত্র তৈরি করতে অনেকে প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই সে সময় সফল হয়নি। সুদীর্ঘ ৪৩ বছর পরে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকৃত টাইপরাইটার প্রস্তুত হয়।

তবে সেই টাইপরাইটারেরও অনেক অসুবিধা ছিল। অসুবিধাগুলোকে দূর করে আজকের মত টাইপ রাইটার মেসিনের প্রকৃত রূপ দেন সম্ভবতঃ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিস্টোফার ল্যামেথ শোল্স নামে জনৈক মার্কিন প্রযুক্তিবিদ। প্রথমে দীর্ঘ পরিশ্রমের পর তিনি একটা মডেল খাড়া করেছিলেন। মডেল অনুযায়ী মেসিন তৈরি করতে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন অনেককে। কিন্তু তাঁর অনুরোধে কেউ সাড়া দেননি। শেষে তিনি নিউইয়র্কের বিখ্যাত এক কোম্পানী ই. রেমিংটন অ্যাণ্ড সন্স-এর শরণাপন্ন হন। কোম্পানীর কর্মকর্তাদের মডেলটি দেখে ভারি পছন্দ হলো। ব্যবসায়ে সুবিধা হবে মনে করে মডেলটিকে বাস্তবে রূপ দিতে সচেষ্ট হন। ফলে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাজারে আসে ল্যামেথ শোল্সের মডেল অনুযায়ী টাইপ রাইটার। মেসিনেও কোম্পানীর নামের ছাপ দেওয়া হলো "রেমিংটন"।

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো রেমিংটন কোম্পানীর। একেবারে নিখুঁত এবং সহজে পরিবহন যোগ্য এই মেসিন দুদিনেই বাজার মাৎ করে দিল। যথেষ্ট অর্থ লুটে নিলেন কোম্পানীটি। সেই সঙ্গে শোল্সের পকেটেও বেশ দু-পয়সা এলো।

রেমিংটনের মেসিনটি অবশ্যই উন্নত হয়েছিল এবং আজকের দিনে টাইপ রাইটারে যেসব যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয় তার সবগুলোই তাতে ছিল। এবং

আজকের মত একই উপায়ে টাইপ করা যেতো। তবু প্রচেষ্টা চলে ওকে আরও—আরও ছোট করতে। যাতে অতি সহজে একজন মানুষ এখান থেকে ওখানে বহন করে নিয়ে যেতে পারে। এমন ছোট টাইপরাইটার বাজারে আসে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। সরঞ্জাম পূর্বের মত, শুধু আকারে ছোট।

উন্নত ধরণের টাইপ রাইটার হাতে আসার পর প্রযুক্তিবিদরা এবার দ্রুত টাইপ যাতে করা যায় তার জন্য মনঃসংযোগ করেন। তাতেও অতিবাহিত হয়ে যায় অনেককাল। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কম্পিউটার এবং বৈদ্যুতিকী-করণের ফলে টাইপ করার গতি অসম্ভব রকমের বেড়ে যায়। বর্তমানে কম্পিউটার ব্যবহার করে প্রতি মিনিটে এক লক্ষের মত শব্দ টাইপ করা যাচ্ছে। এমন দ্রুতগতি সম্পন্ন হওয়ার জন্য টাইপ রাইটার এখন যোগাযোগ ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমরূপে পরিচিত হয়েছে।

সন্ধানী আলো—আর্কল্যাম্প

সন্ধানী আলো ব্যবহার করা হয় সাধারণতঃ সামরিক ব্যাপারে। রাত্রির অন্ধকারে শত্রুপক্ষের বিমানকে সনাক্ত করতে কিংবা রাতে শত্রু সৈন্যের অবস্থিতি নির্ণয় করতে বিশেষ ধরণের তীব্র আলো সহসা সৃষ্টির একটা মাধ্যম যার দ্বারা খুব দূরের জিনিসকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এর ইতিহাস মাত্র দেড়শ বছরের মত। এবং সম্ভব হয়েছে বিদ্যুৎকে কাজে লাগানোর ফলে।

তার আগে প্রয়োজনও বড় একটা ছিল না। কেননা তখনও পর্যন্ত বিমান আবিষ্কৃত হয়নি। স্থলযুদ্ধে ও নৌযুদ্ধে তীব্র আলোর সঙ্কেত প্রদান করার রীতিও আগে প্রচলিত হয় নি।

হবেই বা কেমন করে! আগে কয়লা কিংবা পেট্রোলিয়াম কোন কিছুই তো ছিল না। বড় বড় সহরগুলোও তখন রাতে অন্ধকারের মধ্যে ডুবে থাকতো। পেট্রোলিয়াম উত্তোলিত হওয়ার পর আলো জ্বালাবার কাজটা সহজ হয়ে উঠে। পাশ্চাত্যের বড় বড় শহরে তখন রাস্তায় রাস্তায় জ্বালানো হতো পেট্রোম্যাক্স। নয়ত ক্যালসিয়াম কারবাইডের সঙ্গে জলের ক্রিয়ায় পাওয়া অ্যাসিটিলিন গ্যাসকে জ্বালাবার ব্যবস্থা হতো। বড় বড় মেলা, জলসা, থিয়েটার ইত্যাদিতেও এদের ব্যবহার করা হতো। আজকের বৈদ্যুতিক আলোর কাছে যা খদ্যোতের দীপ্তি বলে মনে হয় সেই পেট্রোম্যাক্স ইত্যাদি

থেকে পাওয়া আলোই ছিল তীব্র আলো। এদের সাহায্যে অতি দূরের কোন কিছুকে সনাক্ত করা সম্ভব ছিল না।

তীব্র আলোর সন্ধান পাওয়া গেল বিদ্যুতের চরিত্র আবিষ্কারের পরে। না, বিদ্যুৎকে সহসা আলো জ্বালাবার কাজে ব্যবহার করতে পারেনি মানুষ। প্রথম পেরেছিলেন ১৮১৮ খ্রীষ্টব্দে ইংরাজ বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভি। তবে বৈদ্যুতিক বাল্বের মাধ্যমে নয়, আর্ক ল্যাম্পের মাধ্যমে। আর্ক ল্যাম্পের আলোককে জোরালো করেন প্যারিসের প্রযুক্তিবিদরা। সবেমাত্র তখন তড়িৎ কোষ আবিষ্কৃত হয়েছে। রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন তড়িৎ তারের মাধ্যমে প্রবাহিত হতে দেখেছিলেন বিজ্ঞানীরা এবং একাধিক তড়িৎ কোষকে শ্রেণী সমবায়ে অর্থাৎ একটির পর একটিকে তারের মাধ্যমে একটির ধনাত্মক তড়িৎদ্বারের সঙ্গে আর একটির ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার—ঠিক এইভাবে যুক্ত করে প্রবাহকে জোরদার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত তড়িৎ কোষ সমূহের দু-পাশের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ দ্বারের সঙ্গে তামার তার দিয়ে দু-পাশের দুটি পেন্সিলের মত মোটা কার্বন দণ্ডের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে এবং কার্বন দণ্ড দুটোকে সরিয়ে এনে অল্প ব্যবধানে রাখতে গিয়ে দেখলেন দণ্ড দুটোর মাঝখানে ধনুকের মত বাঁকানো অতি তীব্র আলোক রশ্মি। অথচ ভেত্তির আর্ক ল্যাম্প এত জোরালো ছিল না। ধনুকের মত বা বৃত্তচাপের মত বাঁকানো আলো পাওয়া গিয়েছিল বলে নামকরণ করা হয়েছিল আর্ক লাইট। এবং আর্ক লাইট উৎপন্নকারী সেই যান্ত্রিক সরঞ্জামকে অভিহিত করা হয়েছিল আর্ক ল্যাম্প। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস শহরকে সেই আর্ক লাইটের দ্বারা আলোকিত করা হয়েছিল।

এরপর আবিষ্কৃত হয় ডায়নামো। ফ্রান্স আর্ক আলো উৎপাদনে এবার কাজে লাগালো ডায়নামোকে। আরও আরও তীব্র আলো উৎপন্ন হলো।

ফ্রান্স এবার ঐ আলোককে শুধুমাত্র শহরকে আলোকমালায় সুসজ্জিত করলো না, সামরিক কাজেও ব্যবহার করলো। যুদ্ধের সময় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের দিনে রাতে শত্রু সৈন্যের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করার জন্য ব্যবহার করলো এই আলোককে। সেই প্রথম সন্ধানী আলোর ব্যবহার।

একমাত্র ফ্রান্স ছাড়া এমন আলো আর কোন দেশ ব্যবহার করতে পারে নি। ফ্রান্সের এই আবিষ্কার প্রদর্শিত হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ায় আয়োজিত একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে। সেই প্রদর্শনীর সবচেয়ে বড় অ্যকর্ষণ ছিল ঐ আর্কবাতি। জলস্রোতের মত জনস্রোত ভেঙ্গে পড়েছিল ঐ সুতীব্র আলোককে দেখতে। যে দেখেছিল সেই-ই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলেন এক প্রৌঢ়। তিনি খুব করে দেখলেন আর্ক-আলোকে। দেখলেন, তড়িৎপ্রবাহ বাড়ালে আলোর তীব্রতা বেড়ে উঠে এবং কমালে তীব্রতা হ্রাস পায়। কিন্তু তড়িৎপ্রবাহ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠে

বটে, তবে কারবন দণ্ড তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়। তাছাড়া একটি মাত্র জোরালো আলোর জন্য দরকার হচ্ছে একটা ডায়নামো। প্রচুর খরচ হচ্ছে তড়িৎ।

ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন, এই আলো জনসাধারণের কোন কাজে লাগবে না। শহরের রাস্তা আলোকিত করা যাবে বটে, কিন্তু ঘরে ঘরে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কতটা আর্কলাইট বসানো যাবে এবং প্রত্যেকটির জন্য একটি করে ডায়নামো! ভদ্রলোক ভাবলেন, একটি ডায়নামো থেকে বহু সংখ্যক আলো কী জ্বালানো যায় না?

ভদ্রলোকটির নাম টমাস আলভা এডিসন। মাত্র দেড় বছরের ভেতরেই তার ভাবনাকে কাজে পরিণত করতে তৈরি করেছিলেন কারবন ফিলামেণ্টের তৈরি বৈদ্যুতিক বাল্ব। একটা ডায়নামো থেকে প্রচুর বাল্ব জ্বালানো সম্ভব হলো। শহরকে আলোকিত করার কাজে আর আর্কল্যাম্প ব্যবহৃত হলো না।

তাই বলে আর্কল্যাম্পের দিন শেষ হলো না। সন্ধানী আলোর জন্য এবার পুরোপুরিভাবে ব্যবহার চললো তার। চেষ্টা হলো তীব্রতা আরও বাড়াতে। যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে যখন বিমান ব্যবহার শুরু হলো এবং রাতের অন্ধকারে যখন অতর্কিতে বিমান ছুটে এসে শত্রু সৈন্যের উপর বোমাবর্ষণ শুরু করলো, তখনই বিমান আক্রমণ রুখতে প্রস্তুত হলো বিমান বিধ্বংসী কামান। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে বিমানকে না দেখতে পেলে কেমন করে ব্যবহ্যর করা যাবে কামানকে?

ব্যবহার করা হলো সেই আর্কল্যাম্পকে। বিদ্যুৎপ্রবাহ তীব্রভাবে পাঠিয়ে আরও তীব্র আলো উৎপন্ন করা হলো এবং সেই আলোককে লেন্সের দ্বারা কেন্দ্রীভূত করে কোন বিশেষ দিকে প,ঠানো হলো। অনেক-অনেক উপরে বিমানের উপর প্রতিফলিত হলো। এর ফলে রাতেও গর্জে উঠলো বিমান বিধ্বংসী কামান।

আজকে রেডার, কৃত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদি মানুষের হাতে এসে গেছে। সন্ধানী আলোর দ্বারা শত্রুপক্ষের বিমানকে আর সনাক্ত করার প্রয়োজন হয় না। তাই বলে সন্ধানী আলো অনেক ক্ষেত্রে এখনও ব্যবহার করা হয়। এখন আবার গ্যাস কারবনের দণ্ডের পরিবর্তে পারদকে কাজে লাগানো হয়ে থাকে। তাতে সুবিধে বেশী। কারণ, কারবন দণ্ড উত্তাপের ফলে বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্রুত দহনক্রিয়া সম্পন্ন করে বলে দ্রুত ক্ষয় হয়ে যায়। তাই প্রবাহের মাত্রা যত বাড়ে তত দ্রুত ক্ষয় হয় কারবন দণ্ডের। পারদের ক্ষেত্রে ততটা হয় না।

কৃত্রিম রক্ত

রক্ত মানব দেহের তো বটেই, যে কোন মেরুদণ্ডীর জীবন জল। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণজণিত চাপে রক্ত রক্তবাহের মাধ্যমে দেহের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত প্রতিনিয়ত চলাচল করে। রক্তই শরীরের কোষে কোষে পৌষ্টিক উপাদান এবং অক্সিজেনকে বহন করে নিয়ে যায়। অন্যদিকে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে বর্জ্য পদার্থসমূহকে রেচনতন্ত্রে বহে আনে। শুধু কী তাই? শ্বাসবায়ু ও খাদ্যবস্তুর পরিবহন এবং দূষিত পদার্থের অপসারণ ছাড়াও জলসাম্য নিয়ন্ত্রণ, হরমোনের পরিবহন, দৈহিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ, তঞ্চনের মাধ্যমে রক্তপাতে বাধা দেওয়া ইত্যাদি হরেক রকমের কাজ করে থাকে।

রক্ত হচ্ছে লাল রঙের এক জটিল, ঘন ও অস্বচ্ছ অর্ধতরল সংযোজক কলা বিশেষ। রক্তের মধ্যে থাকে ফিকে হলুদ রঙের ক্ষারধর্মী পদার্থ রক্তরস বা প্লাজমা এবং অসংখ্য রক্ত কণিকা। রক্ত কণিকারা তিন রকমের। লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা এবং অনুচক্রিকা। এরা আবার বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পন্ন করে থাকে। যেমন লোহিত কণিকার মধ্যে লৌহঘটিত পদার্থ হিমোগ্লোবিন শ্বাসঅঙ্গ থেকে কলাকোষে অক্সিজেন পরিবহণ করে, শ্বেত কণিকারা শরীরে অনুপ্রবেশকারী জীবাণু ও ভাইরাসদের ধ্বংস করে—তথা রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা আনায় এবং অনুচক্রিকারা কোন জায়গার রক্তবাহ ছিন্ন হয়ে গেলে রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

অতএব শরীরে প্রয়োজনমত রক্ত না থাকলে চলে না এবং রক্তই প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেহে জীবনরস সঞ্চার করে থাকে। কেননা খাদ্যাভাবে মানুষ যাই হোক কিছু দিন বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু অক্সিজেন না পেলে মুহূর্তও চলে না।

আঘাতের ফলে রক্তপাত, রক্তাল্পতা, বড় রকমের অপারেশনে অথবা অন্য কোন কারণে দেহের রক্তের পরিমাণ হ্রাস পেলে রোগীকে রক্তদান করার প্রয়োজন হয়। বাহির থেকে রোগীর শিরার ভেতর রক্তকে পাঠাতে হয়। সেই রক্তকে সংগ্রহ করতে হয় অপরের দেহ থেকে। ওতে ঝামেলা কিন্তু অনেক। একের রক্ত অন্যের দেহে কাজ না করে অনেক সময় বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া আনায়। সেই কারণে রক্তের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। যার দেহে যে শ্রেণীর রক্ত, তার দেহে ঠিক সেই শ্রেণীর রক্তই দেওয়া হয়।

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শ্রেণী অনুযায়ী রক্ত যাতে সহজে লাভ করা যায় তার জন্য অপরের দেহ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে "ব্লাড ব্যাঙ্কে" সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অসুবিধাও যথেষ্ট আছে। প্রথমতঃ স্বাভাবিক রক্তকে দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায় না। কিছুকাল পরে নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন শ্রেণীর রক্ত সুলভ নয়। এই সব রক্তকে সংগ্রহ করতে গেলে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে হয়। অপরদিকে রোগীর রক্তের যেখানে আশু প্রয়োজন, সেখানে শ্রেণী অনুযায়ী রক্ত খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হতে হয়। ঠিক সময়ে রক্ত পাওয়া যায় না। ফলে রোগী নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

উপরোক্ত অসুবিধাগুলোকে দূর করতে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম রক্ত তৈরির প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। বহু জৈব যৌগকে যখন কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে, তখন রক্তকেই বা তৈরি করা যাবে না কেন?

এ বিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। অনেক চিন্তা-ভাবনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁরা তৈরি করেন এক ধরণের কৃত্রিম রক্ত—ফ্লুরোসোল। এটি ফ্লুরো কারবন যৌগ। পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, এই রক্ত একমাত্র কোষে কোষে অক্সিজেনকেই সরবরাহ করতে পারে, অন্য কোন কাজ করার ক্ষমতা নেই। অর্থাৎ রক্তের লোহিত কণিকারা যে কাজটুকু সম্পন্ন করে থাকে, কেবল সেই কাজটুকুই করতে পারে। তথাপি পুরোপুরি লোহিত কণিকাও নয়।

তা হোক, মন্দের ভাল বলতে হবে। ফ্লুরোসোলের শ্রেণীর প্রয়োজন নেই। যে কোন দেহে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং মূল কাজ অক্সিজেনটাকে অন্ততঃ সরবরাহ করতে পারবে। তাহলেই রোগীর জন্য উপযুক্ত রক্ত অনুসন্ধানের যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞানীরা তৈরি করলেন এবং কাগজে কলমে গুণও ব্যাখ্যা করলেন! আসলে কারও উপর পরীক্ষা তখনও চালানো হয় নি। কার উপরে প্রয়োগ করবেন? শীঘ্রই একটা সুযোগ এসে গেল। হাসপাতালে এলেন নিকোলসন নামে একজন বৃদ্ধ রোগী। তাঁকে অপারেশন করতে হবে এবং অপারেশনকালে দান করতে হবে রক্ত।

নিকোলসন বেঁকে বসলেন। জানালেন, অপরের রক্ত তিনি গ্রহণ করবেন না। তখনই চিকিৎসকরা তাঁরই উপর কৃত্রিম রক্ত প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং প্রয়োগ করে বেশ ভাল ফলই পেলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন নিকোলসন।

চিকিৎসকরা এবার উৎসাহিত হলেন এবং চারদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল।

এদিকে জাপানের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও কৃত্রিম রক্ত তৈরির জন্য গবেষণা করছিলেন। তাঁরাও প্রায় একই সময়ে তৈরি করলেন পারফ্লুরো ডেকাট্রিন

পারক্লোরোট্রাই পারলঅ্যামাইন বা এফ. ডি. এ. নামে এক জাতীয় কৃত্রিম রক্ত। যদিও এটি প্রকৃত রক্ত নয় বা প্রকৃত লোহিত কণিকাও নয়, তবু পূর্বের তুলনায় এফ. ডি. এ. ভাল ফল প্রদান করলো।

বিজ্ঞানীরা আরও উৎসাহিত হলেন। বুঝতে পারলেন, আপাততঃ রক্তের অন্যান্য কণিকাকে বাদ দিয়ে লোহিত কণিকাকে তৈরি করা সম্ভব। নাইবা হলো শ্বেত কণিকা বা অনুচক্রিকা! মূল উদ্দেশ্য রোগীকে বাঁচিয়ে রাখাতো সম্ভব হবে।

লোহিত কণিকাদের তৈরি করতে যারা গবেষণা চালাচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মার্কিন চিকিৎসা বিজ্ঞানী সি. অ্যান্টনী হাণ্ট। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর হাণ্টই একদিন ল্যাবোরেটারিতে তৈরি করতে সক্ষম হলেন লোহিত কণিকাকে।

হাণ্টের তৈরি লোহিত কণিকার পরমায়ু কিন্তু বেশী দিন নয়। অতি স্বল্পায়ু। যেখানে স্বাভাবিক লোহিত কণিকারা ১২০ দিন পর্যন্ত বাঁচে, সেখানে কৃত্রিম লোহিত কণিকার পরমায়ু মাত্র ৬ ঘণ্টা। অর্থাৎ মাত্র ৬ ঘণ্টা রোগীর কোষে কোষে অক্সিজেন এবং পৌষ্টিক উপাদানকে সরবরাহ করতে পারে।

হাণ্ট কর্তৃক প্রস্তুত লোহিত কণিকা যতই স্বল্পায়ু হোক না কেন, ওতে বিজ্ঞানীরা উৎসাহিত হয়েছেন। গবেষণার ফলে ওর পরমায়ুকে অবশ্যই একদিন বাড়ানো যাবে অপরদিকে লোহিত কণিকাকে যখন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, তখন অন্যান্য কণিকাদেরও তৈরি করা সম্ভব হবে বলে এতদিনে বিশ্বাস হলো বিজ্ঞানীদের।

বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, অদূর ভবিষ্যতেই তারা কৃত্রিম রক্তকে উপহার দিতে পারবেন। এমন একদিন আসবে, যেদিন কাউকে রক্তদান করতে হবে না। প্রয়োজনীয় যে কোন শ্রেণীর রক্ত তাঁরা কৃত্রিমভাবে তৈরি করে নিতে পারবেন।

চশমা

বয়স বাড়লে চোখের নজর কম হয়ে আসে। ভিটামিনের অভাবে এবং অন্যান্য কারণে যে কোন বয়সে মানুষের দৃষ্টি শক্তির গোলমাল হয়। এমন ক্ষেত্রে চোখে চশমা নিতে হয়।

চশমা তাই আমাদের অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে একটি। এর কারিগরিটা অতি সাধারণও বটে। একটা ফ্রেমে বাঁধা দুখানা লেন্স—এই মাত্র। তবুও ভাবতে ইচ্ছে হয়, এই পরিকল্পনাটা প্রথমে কোন শিল্পীর মাথায় এসেছিল!

চশমা প্রকৃতপক্ষে কে যে আবিষ্কার করেছেন—সেবিষয়ে বিতর্ক আছে। তবে একথা ঠিক যে, চশমা আবিষ্কৃত হয়েছে লেন্স আবিষ্কারের পরে। লেন্স হচ্ছে বিশেষ বিশেষ আকারের এক একটা কাচের চাকতি। ঐ চাকতিটার ভেতর দিয়ে আলোকরশ্মি পরিচালিত হলে রশ্মিগুলো প্রতিসরিত হয়ে একটা বিন্দুতে মিলিত হতে পারে বা বিক্ষিপ্ত হতে পারে।

লেন্সরা প্রধানতঃ দু-ধরণের। উত্তল লেন্স ও অবতল লেন্স। উত্তল লেন্সের চারপাশ থেকে মাঝখানের দিকে ক্রমশঃ পুরু। মাঝখানটা পাতলা এবং কিনারার দিকে ক্রমশঃ মোটা হলে বলা হয় অবতল লেন্স। উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক রশ্মি প্রতিসরিত হয়ে একটা বিন্দুতে মিলিতে হতে পারে, কিন্তু অবতল লেন্সের বেলায় রশ্মিগুলো প্রতিসরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

উত্তল লেন্সকে চোখ থেকে বিশেষ দূরত্বে ধরলে আলোক রশ্মিগুলো এক জায়গায় মিলিত হতে পারে বলে ছোট ছোট জিনিসকে বেশ বড় দেখায়। অপরদিকে দাহ্য বস্তুর উপর ধরলে তাতে সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় আগুন ধরে যায়। এই দুটো বৈশিষ্ট্য মানুষকে সেদিন মুগ্ধ করেছিল। তাই আগুন ধরাবার কাজে ওকে যেমন ব্যবহার করা হয়েছিল তেমনই চোখের কাছে ধরে অতি ছোট ছোট জিনিসকেও মানুষ লক্ষ্য করতো।

এই লেন্স কিন্তু তৈরি হয়েছিল আর্কিমিদিসেরও (খৃীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী) আগে। আর্কিমিদিস বিদেশী রাজার নৌবহরে বড় বড় লেন্সের সাহয্যে আলো ফেলে পালগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োগ করেছিলেন লেন্সকে। কিন্তু মানুষের উপকারে তিনি প্রয়োগ করতে পারেননি।

চশমার আদিরূপ কেবল একখানা উত্তল লেন্স। কারও দৃষ্টি শক্তির হ্রাস ঘটলে উত্তল লেন্সটি চোখের সামনে ধরে রাখতেন এবং পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজকর্ম করতেন। দুটো উত্তল লেন্সকে ফ্রেমে এঁটে চশমার রূপ দেওয়া হয়েছে অনেক পরে। সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থাটির আবিষ্কর্তা আলোক সান্দ্রো ডেল স্পিনা। স্পিনাকে চশমা আবিষ্কারকরূপে অনেকে চিহ্নিত করলেও কেউ কেউ আবার বলতে চান, চশমার পরিকল্পনা প্রথমে করেছিলেন রেনেসাঁস যুগের বিজ্ঞানী ও দার্শনিক রোজার বেকন। তবে কথিত আছে, প্রথমে চশমা চোখে মানুষের ছবি এঁকেছিলেন দা মোডেনা। মোডেনার পূর্বে চশমার ছবি কোন শিল্পী না আঁকায় ধরে নিতে হবে ঐ রেনেসাঁস যুগেই চশমা আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে সেদিনের চশমার ফ্রেম হতো কাঠের তৈরি। পরের দিকে তামা প্রভৃতি ধাতুকে কাজে লাগানো হয়েছিল।

অবতল লেন্সের তৈরি চশমা সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবিষ্কৃত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন, অবতল লেন্সের তৈরি চশমা প্রথম আবিষ্কার করেন পোপ দশম লিও। যাঁরা দূরের জিনিসকে ভালভাবে দেখতে পাননা তাঁদের জন্যই এই চশমা।

যাঁরা কাছের ও দূরের কোনকিছুকে ভালভাবে দেখতে পাননা তাঁদের জন্য আর এক ধরণের চশমার পরিকল্পনা করেছিলেন বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। ফ্রাঙকলিনই প্রথম তৈরি করেছিলেন বাই ফোকাল চশমা। 'বাই' অর্থে দুই। একই চশমার দুটি লেন্সেই দুধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অনুরূপ নামকরণ। উপরের অংশটা অবতল লেন্স এবং তলার দিকটা উত্তল লেন্স। যারা কাছের জিনিসকে ঠিক ঠিক দেখতে পাননা, অথচ দূরের দৃষ্টি চমৎকার আছে, তাদের জন্য যে সব বাই ফোকাল চশমা তৈরি হয়, সেই সব চশমার লেন্সের উপর দিকটা লেন্স নয়—শুধুই কাচ। কেবলমাত্র নিচের দিকের সামান্য অংশে উত্তল লেন্স জোড়া দেওয়া থাকে অথবা কাচটাকে সেইভাবে তৈরি করে নেওয়া হয়।

চশমার খুব বেশী উন্নতি আর হয়নি। যেটুকু হয়েছে সে সব ফ্রেমেরই কারিগরি। যাঁরা খুব কম দেখেন, অর্থাৎ চশমা দিয়েও ভাল দেখতে পাননা—তেমন প্রায় অন্ধ ব্যক্তির জন্য এক ধরণের চশমা অবশ্য আজকাল তৈরি করা হয়। ঐ চশমার গায়ে দুপাশের দুটি লেন্সে তিনটি করে মোট ছয়টা দূরবীন আঁটা থাকে। আবিষ্কর্তা ইউলিয়ম পাইনব্লুম নামে এক বিজ্ঞানী। অনেকটা ফড়িং কিংবা মৌমাছিদের মত চোখের গুচ্ছ যেন। তাই ওকে পুঞ্জাক্ষী চশমা বলা যেতে পারে।

কুষ্ঠ রোগের জীবাণু ও প্রতিষেধক

অতি প্রাচীনকাল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত কুষ্ঠ একটা অতি ঘৃণ্য রোগ বলে চিহ্নিত হয়ে আসছিল। এখনও অনেকে কুষ্ঠ রোগীকে প্রচন্ড ঘৃণা করেন। সত্যি ; কুষ্ঠরোগাক্রান্তদের যা বীভৎস চেহারা এবং যে প্রচন্ড যন্ত্রণা! হয়ত এই কারণে আজও অনেকে মনে করেন, মানুষ জঘন্যতম পাপ করলেই উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়।

কুষ্ঠকে আগে বংশগত রোগ বলে মনে করা হতো। বর্তমানে উন্নত গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, কুষ্ঠ বংশগত রোগ নয়। আবার অনেক

ধরণের কুষ্ঠ ছোঁয়াচেও নয়। যদিও এককালে মনে করা হতো, কুষ্ঠ মাত্রেই ছোঁয়াচে।

কুষ্ঠ অতি প্রাচীনকাল থেকে একটা প্রচন্ড ভীতি হয়ে আছে। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রেও এর উল্লেখ অছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, খৃষ্ট-জন্মের হাজার বছরেরও অধিক কাল আগে প্রথম মিশরে আত্মপ্রকাশ করেছিল এই রোগটি। ইংরেজী নাম লেপ্রোসী। এটি গ্রীকশব্দ থেকে চয়ন করা হয়েছে—যার অর্থ ত্বকের ক্ষত। হাতে, পায়ে, নাকে, মুখে সর্বত্র দগদগে ঘায়ে পরিণত হয়। অনেক সময় হাতে ও পায়ের আঙ্গুল খসে খসে পড়ে। এক দুর্বিসহ জীবনযাপন করে রোগাক্রান্তরা।

মিশর থেকে রোমানদের দ্বারা নাকি কুষ্ঠ ছড়িয়ে পড়েছিল এশিয়া ও ইওরোপের বিভিন্ন জায়গায়। লক্ষ লক্ষ লোক এই রোগের কবলে পড়ে। নিজেকে সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে সবার ঘৃণার পাত্র হয়ে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। অনেকে চেষ্টা করেছিলেন ওদের জন্য কিছু করতে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কুষ্ঠের প্রকৃত কারণই কেউ নির্ণয় করতে পারেননি। ঐ সময় পাস্তুর প্রভৃতি জীবানু তত্ত্ববিদদের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হলো, রোগের পেছনে রয়েছে অদৃশ্য জীবাণুদের হাত। পাস্তুর নিজেই কতকগুলো রোগের জীবানুকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁরই আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন অনেকে। অনেকেই সচেষ্ট হয়েছিলেন রোগ জীবাণুদের সনাক্ত করতে।

কুষ্ঠ রোগকে নিয়ে প্রথমে গবেষণা শুরু করেন ড্যানিয়েলসন নামে নরওয়ের এক চিকিৎসক ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। কথিত আছে, তিনি কুষ্ঠ রোগীর শব ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন এবং কুষ্ঠ-রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের জন্য কুষ্ঠ রোগীর ক্ষত থেকে রস সংগ্রহ করে নিজের দেহে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর কুষ্ঠ রোগ হয়নি। তবে হান্টার নামে আর এক বিজ্ঞানী অনুরূপ পরীক্ষা করতে গিয়ে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সত্যি, এঁদের সঙ্গে কারও তুলনা হয় না।

ড্যানিয়েলসনের পরে কুষ্ঠ রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করেন জের হার্ড হেনরিখ আরমার হানসেন নামে নরওয়ের আর এক জীবাণুতত্ত্ববিদ। দীর্ঘ গবেষণার পর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হানসেন আবিষ্কার করেন কুষ্ঠ রোগের জীবাণুকে। জীবাণুটির নামকরণ করেন মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি। হানসেন আরও প্রমাণ করেন, জীবাণুটার সঙ্গে যক্ষ্মা রোগের জীবাণুর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। হানসেন ছিলেন ড্যানিয়েলসেনের জামাতা। যদিও বিয়ের মাত্র সাত মাস পরে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে স্ত্রী স্টেফোনি মারা গেছেন।

কুষ্ঠ রোগের জীবাণু আবিষ্কৃত হলো বটে, কিন্তু এর প্রতিষেধক কেউ আবিষ্কার করতে পারলেন না। না আবিষ্কারক নিজে, না অপর কোন

চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তার একমাত্র কারণ, কোন বিজ্ঞানী কুষ্ঠের জীবাণুকে অন্য কোন প্রাণীর দেহে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে কুষ্ঠ রোগ সৃষ্টি করতে পারেননি। জীবাণুটির এমনই বৈশিষ্ট্য যে, মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর দেহে বংশবিস্তার করতে পারে না। তাই মানুষ ছাড়া কোন প্রাণী কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয় না। (সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ইঁদুরের পায়ের পাতায় কুষ্ঠ রোগ সৃষ্টি করতে পেরেছেন এবং দেখেছেন পশ্চিম আফ্রিকার এক জাতীয় বানরের দেহে কুষ্ঠের জীবাণুর মত আর এক ধরণের জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে।)

অন্য প্রাণীর দেহে রোগ সৃষ্টি করতে না পারার জন্য জীবাণু আবিষ্কারের পর চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও এর প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেননি কেউ। অবশেষে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আবিষ্কৃত হয় ডাই অ্যামিনো ডাই ফিনাইল সালফোন বা ডি. ডি. এস. নামে কুষ্ঠের ওষুধ। বর্তমানে আরও অনেক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে থায়াম বিউটাসেনে এবং থায়া অ্যাসিচাজেন প্রধান।

বর্তমানে কুষ্ঠকে আর দুরারোগ্য ব্যাধি বলা চলে না। তবে কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসা দীর্ঘকাল চালিয়ে যেতে হয়। রোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যেমন দেরীতে, অর্থাৎ দু থেকে পনের কিংবা বিশ বছর সময় লেগে যেতে পারে। তেমনই সহসা এই রোগের উপশমও ঘটে না। বছরের পর বছর চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়। অপরপক্ষে কুষ্ঠে আক্রান্তদের ত্বকের স্নায়ুগুলো নষ্ট হয়ে যায় বলে অঙ্গের অসাড়ভাব দূর হয় না। তেমনই হাত ও পায়ের আঙ্গুল নষ্ট হয়ে গেলে সেই সব আঙ্গুল পুনর্গঠিত হতে পারে না। উক্ত কারণে কুষ্ঠ রোগাক্রান্তরা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠলেও দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

আজকের উন্নত গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, সব রকমের কুষ্ঠ ছোঁয়াচে রোগ নয়। বসন্ত প্রভৃতি রোগের মত এত সংক্রামকও নয়। তবু পৃথিবীতে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা যথেষ্ট। প্রধানতঃ গ্রীষ্ম প্রধান দেশসমূহে এই রোগের প্রাদুর্ভা বেশী। হিসেব অনুযায়ী সমগ্র পৃথিবীতে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা কম করে এক কোটি। একমাত্র ভারতেই আছে চল্লিশ লক্ষেরও বেশী কুষ্ঠ রোগী।

সমাজ থেকে বহিঃস্কৃত এই সব কুষ্ঠ রোগীদের প্রতি সবারই কিছুটা সমবেদনা থাকা উচিত। তাদের ঘৃণাভরে দূরে সরিয়ে না দিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। আবার প্রথম প্রথম এই রোগ ধরা পড়লে রোগীর জীবনও দুর্বিষহ হয়ে উঠবে না।

লেখার কালি

মানব সভ্যতার একটা বড় উপকরণ লেখার কালি আবিষ্কার। দীর্ঘকাল মানুষ অবশ্য কালির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। অনুভব করেছিল তখনই, যখন মানুষ লিপি আবিষ্কার করে এবং লিপির মাধ্যমে কোন কিছুকে কাগজের উপর লিখতে যায়।

লিপি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কালির প্রয়োজন হয়নি। লিপিকে গুহায়, পর্বতগাত্রে, ফলকে, এমনকি কচ্ছপের খোলকের উপরও আঁচড় কেটে কেটে লেখা হতো। প্রকৃতপক্ষে কাগজ আবিষ্কৃত হলেই কালির দরকার পড়ে। এবং ঐ কালি প্যাপিরাসের মত মিশরীয়রাই প্রথম আবিষ্কার করেছিল।

প্রাচীন প্যাপিরাসের উপর লেখাকে ভালভাবে পরীক্ষা করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা জানতে পেরেছেন, মিশরীয়দের দ্বারা আবিষ্কৃত কালির প্রধান উপাদান অঙ্গার বা কারবন। মিশরীয় লিপিকাররা ভূষার সঙ্গে আঠা মিশিয়ে কালি তৈরি করতেন। ওকে ভূষা কালি বলা হতো এবং এই ভূষা কালির প্রচলন ছিল দীর্ঘকাল।

সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে ভারতই রাসায়নিক উপায়ে কালি প্রস্তুত করেছিল। হিরাকষের (ফেরাস সালফেট) সঙ্গে হরিতকী মিশিয়ে তৈরি করতো কালি। এই পদ্ধতি পরের দিকে অনেক দেশ অনুসরণ করেছিল। হরিতকীতে থাকে গলট্যানিক অ্যাসিড। ফেরাস সালফেটের সঙ্গে বিক্রিয়ায় চমৎকার লেখার কালি তৈরি হতো।

পরের দিকে অর্থাৎ মধ্যযুগে ফেরাস সালফেটের সঙ্গে গলনাট মিশিয়ে কালি তৈরি করলো পাশ্চাত্যের দেশগুলো। গলনাট পাওয়া যায় ওক গাছ থেকে। ওক গাছ ভারতে জন্মায় না। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

গলনাট কিন্তু ওক গাছের ফল নয়। এক ধরণের পোকা—যার নাম গলওয়াপ্‌র্স, ওক পাতাকে আক্রমণ করে। ওক গাছের পাতায় পাতায় ডিম পাড়ে প্রচুর পরিমাণে। পোকাদের আক্রমণে পাতার শিরাগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তখন ওক গাছ তার স্বাভাবিক নিয়মে বিনষ্ট শিরার ক্ষত স্থানকে ঢাকতে এক ধরণের রস বার করে এবং সেই রসের প্রলেপ ধীরে ধীরে ক্ষতস্থানে শক্ত হয়ে সৃষ্টি করে গলনাটের।

গলনাটের উপাদান ট্যানিক অ্যাসিড। গলনাটকে শুকিয়ে নেওয়ার পর ভালভাবে গুঁড়া করে নেওয়া হয় এবং ঐ গুঁড়ার সঙ্গে অ্যালকোহল মেশানো হয়। তাতেই তৈরি হয় গলট্যানিক অ্যাসিড—লেখার কালির ভাল একটা উপাদান। হরিতকী, আমলকী প্রভৃতিতে উক্ত অ্যাসিড পাওয়া গেলেও গলনাটের মত এত বেশী নেই।

বর্তমান কালে একই পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। গলট্যানিক অ্যাসিডের সঙ্গে ফেরাস সালফেট, সালফিউরিক অ্যাসিড, গঁদ ও ফেনল মিশানো হয়। তাছাড়া কিছু রঙও মেশানো হয়ে থাকে। কালিটা লেখার সঙ্গে সঙ্গে যাতে শুকিয়ে যায় তার জন্য স্পিরিট মিশিয়ে দেওয়া হয়।

উপকরণের পরিমাণের উপর কালির উৎকর্ষ নির্ভর করে। এবং এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা গোপনীয়তা পালন করেন।

লিথিয়াম

অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা। সে সময় ধাতুবিদ্যায় সব দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল ইওরোপের ছোট্ট একটি দেশ সুইডেন। লোহার প্রয়োজন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় সুইডেনের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন খনিজের মধ্যে লোহার অনুসন্ধান করতেন। ফলে বিশ্লেষণ করতেন নানা ধরণের খনিজ পদার্থকে এবং বিশ্লেষণ করতে গিয়েই তাঁরা পরিচয় পেয়েছিলেন বহু মৌলিক পদার্থের।

এমনই একজন বিজ্ঞানী ছিলেন ডঃ আর্ভেফ্রেডসন। তাঁর খাস কাজ ছিল নতুন নতুন পাওয়া খনিজ পদার্থকে বিশ্লেষণ করা। বুঝিবা তাঁর পূর্বসূরীদের মত তিনিও চেয়েছিলেন নতুন কোন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করতে।

একদিন আর্ভেফ্রেডসনের হাতে এলো 'পেটালাইট্‌' নামের একটি খনিজ। তিনি আগেই শুনেছিলেন, এটি এমন একটি খনিজ যার উপাদানগুলোকে বিশ্লেষণ করতে অনেকেই হিমসিম খাচ্ছেন।

আর্ভেফ্রেডসন শুরু করলেন গবেষণা। সত্যি, অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মত তিনিও বিব্রতবোধ করলেন। পেটালাইটকে বিশ্লেষণ করে যে উপাদানগুলো লাভ করলেন; সেই উপাদানগুলোর যোগফল হলো প্রতি একশ ভাগে ৯৬ ভাগ। বাদ বাকি চার ভাগের কোন হদিশ পেলেন না। কিন্তু কেন? উপাদানগুলোর যোগফল মূল পদার্থের সমানই হওয়ার কথা! কেন গরমিল!

খুব করে ভাবলেন আর্ভফ্রেডসন। পরীক্ষার পুনরাবৃত্তিও ঘটালেন বার বার। না, যোগফল সেই একই। অর্থাৎ শতকরা ৯৬ ভাগ। সিদ্ধান্তে এলেন, পেটালাইটের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে—যাকে তিনি সনাক্ত করতে পারছেন না।

আর্ভফ্রেডসনের উৎসাহ বেড়ে গেল। মৌলটিকে সনাক্ত করতে কঠোর পরিশ্রম শুরু করলেন। সে পরিশ্রম তাঁর ব্যর্থ হলো না। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সমর্থ হলেন উপাদানটিকে পৃথক করতে। এবং দেখলেন, পেটালাইটের উপাদানগুলোর যোগফল না মেলার মূলে ছিল এই উপাদানটির উপস্থিতি। বুঝতে পারলেন, খনিজের মধ্যে উপাদানটির পরিমাণ নিতান্ত কম—শতকরা মাত্র তিন থেকে চার ভাগের মত।

মৌলটিকে সনাক্ত করলে তো হবে না। পরধর্মও নির্ণয় করতে হবে এবং বৈশিষ্ট্যও। তবেই তিনি আবিষ্কারকের গৌরব লাভ করবেন এবং মৌলটিও স্বীকৃতি লাভ করবে।

অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আর্ভফ্রেডসন বুঝতে পারলেন, এটি একটি ধাতু। তবে নিতান্ত হালকা। পৃথিবীর সমূহ ধাতুর মধ্যে হালকা তো বটেই, পার্থিব হালকা বস্তুর মধ্যে এর স্থান তৃতীয়। প্রথম স্থান হাইড্রোজেনের এবং দ্বিতীয় স্থান হিলিয়ামের। অথচ এই দুটি মৌল গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায়। ধাতু হয়েও এত হালকা—যেন আশাই করা যায় না। এটি ক্ষার ধাতু এবং পরমাণু ক্রমাঙ্ক ৩। ক্ষার ধাতু সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের মত জলের সঙ্গে ক্রিয়া করে। অথচ সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের মত কেরোসিনের ভেতরেও ফেলে রাখা যায় না। কেরোসিন অপেক্ষাও হালকা এবং বায়ুর সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে ক্রিয়া করে। তাই রাখতে হলো প্যারাফিনের আস্তরণ দিয়ে।

বিজ্ঞানীরা এবার স্বীকার করে নিলেন মৌলটিকে। এরার শুরু হলো ওর নামকরণের পালা। সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের শ্রেণীভুক্ত বটে, কিন্তু সোডিয়াম-পটাসিয়ামের মত বহুল পরিমাণে ওকে লাভ করা যায় না। নিষ্কাশন পদ্ধতিও ভিন্ন। সোডিয়াম ও পটাসিয়ামকে নিষ্কাশন করা হয়েছিল অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষের বহুল পরিচিত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড যৌগ থেকে। আবিষ্কার করেছিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডেভি তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে—যথাক্রমে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু নতুন এই ক্ষার ধাতুকে লাভ করা গেল খনিজ পাথর থেকে। গ্রীক শব্দ চয়ন করেই ওর নামকরণ হলো। যেহেতু গ্রীক "লিথোস" শব্দের অর্থ পাথর ; তাই নাম হলো লিথিয়াম।

লিথিয়াম আবিষ্কারের পর থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত এর বিশেষ কোন ব্যবহার ছিল না। তবে লিথিয়াম যে বাতাসের নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের সঙ্গে অতি দ্রুত যুক্ত হতে পারে এবং হাইড্রোজেনের সঙ্গে

অতিমাত্রায় যুক্ত হয়ে হাইড্রাইড গঠন করতে পারে, এই সত্যগুলো উদ্ঘাটিত হয়েছিল। হাইড্রোজেনের প্রতি ওর অসাধারণ আসক্তি এবং যে কোন হাইড্রাইড জলের সঙ্গে ক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করতে পারে, তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লিথিয়াম হাইড্রাইডকে গ্যাস বেলুনে ব্যবহার করা হয়েছিল। অপরদিকে যুদ্ধ বিমানের যাত্রীরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য লিথিয়াম হাইড্রাইড ভরা বেলুন ব্যবহার করতেন। জলের সম্পর্কে মুহূর্তের ভেতরে প্রচুর হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়ে বেলুনকে ফাঁপিয়ে ফেলতো।

বর্তমানে লিথিয়ামের ব্যবহার বেশ ব্যাপক। ধাতু সংকর প্রস্তুতিতে, পিচ্ছিলকারক পদার্থ উৎপাদনে, এমনকি চিকিৎসা ক্ষেত্রেও ওর ডাক পড়েছে। টেলিভিসনের পিকচার টিউবের কাচ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় লিথিয়াম। এর দ্বারা অতি উন্নত কাচও তৈরি হচ্ছে। উন্নত দূরবীন তৈরির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে লিথিয়াম ফ্লুয়োরাইডকে। শীততাপ নিয়ন্ত্রণে, গ্রামোফোন রেকর্ডে, চশমার লেন্স তৈরিতে এবং নানা ধরণের সৌখিন প্রসাধন সামগ্রী প্রস্তুতিতেও ব্যবহার হচ্ছে লিথিয়াম।

আজকের মহাকাশজয়ী রকেটের ক্ষেত্রে রয়েছে লিথিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। অতি অল্প পরিমাণ লিথিয়াম প্রচুর পরিমাণ হাইড্রোজেনকে ধারণ করে লিথিয়াম হাইড্রাইড গঠন করতে পারে বলে রকেটের জ্বালানীর জন্য যে হাইড্রোজেন প্রয়োজন হয় তা সরবরাহ করা হয় হাইড্রোজেনের বদলে লিথিয়াম হাইড্রাইডকে। অতি নিরাপদেও ব্যবহার করা যায়। হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের ক্ষেত্রেও দরকার হয় লিথিয়াম হাইড্রাইডকে। ভবিষ্যতে আরও হয়ত কত কাজে ডাক পড়বে লিথিয়ামকে।

চক্ষু অধিরোপন ও চক্ষু ব্যাঙ্ক

চক্ষু জীব মাত্রেরই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যদিও উইপোকা প্রভৃতি কিছু কিছু প্রাণীর চোখ নেই। তারা চোখের কাজটা অন্য উপায়ে তথা ফেরোমন ছড়িয়ে সম্পাদন করে। আর তাদের জীবনযাত্রাও ছকে বাঁধা। মানুষ প্রভৃতি জীবের দৈহিক গঠন অত্যন্ত জটিল। অপরদিকে সামাজিক জীব মানুষের জীবনের চাহিদা অনেক। তার চাহিদার শতকরা ৯০ ভাগের বেশী পূরণ করতে হয় দর্শনানুভূতির সাহায্যে।

মানুষ প্রভৃতি অধিকাংশ প্রাণীর দুটি চোখ—দুটিই পরশমণি যেন।

পতঙ্গদের চোখ—অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখের সমষ্টি—পুঞ্জাক্ষী। কারও কারও চোখের সমষ্টি আটাশ-ছত্রিশ হাজারের মত। কিছু কিছু প্রাণীর দুয়ের বেশী চোখও থাকে। সরীসৃপ প্রভৃতি কারও কারও ভ্রূণ অবস্থায় মাথায় পেছনে আরও একটি থাকে। পরে সেটি লুপ্ত হয়ে যায়। আহা, মানুষের যদি তেমনটি থাকতো!

না, বিশেষ লাভ হতো না। আর যাদের সহস্র সহস্র লোচন তারা খুব দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে না। দেখে শুধু কাছের বস্তু। আর মানুষ? দূরের ও কাছের সব জিনিসকে দেখতে পায়। আবার বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মানুষ যখন বনে বনে ঘুরে বেড়াতো, যখন তাদের জীবনের একমাত্র চাহিদা ছিল আত্মরক্ষা ও শিকার, তখন তাদের দূরের দৃষ্টিটা অতি প্রখর ছিল। কিন্তু খুব কাছের জিনিস ভালভাবে দেখতে পেতোনা। পরে মানুষ সমাজ গড়ে তুললে, সমাজ ব্যবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠলে এবং জীবনে নিরাপত্তা এলে খুব দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার প্রয়োজন সঙ্কুচিত হলো, অপরদিকে কাছের বস্তুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো। ফলে পরিবর্তিত হলো দৃষ্টি শক্তির। দূরেরটি কমলো এবং কাছের দৃষ্টি প্রকট হলো।

তা যাক্ গে। আমাদের দেখার মূলে আছে চোখের আশ্চর্য গঠন। সত্যি, বড় বিস্ময়কর। কোন বস্তুর উপর থেকে প্রতিফলিত আলোক রশ্মি চোখের সম্মুখ ভাগের কর্ণিয়া তথা অচ্ছোদ পটলের উপর পড়লে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেছনের অক্ষিপটে বস্তুটার একটা উল্টো প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। দর্শন অনুভূতি জাগানোর জন্য সেখানে রয়েছে অসংখ্য "বড়" কোষ এবং "কোণ" কোষ। আলোকরশ্মি পড়লে কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়। ফলে আবেগ তরঙ্গ বা স্নায়ুজ বিভবের সৃষ্টি হয়। ঐ তরঙ্গ বিশেষ বিশেষ স্নায়ুর দ্বারা মস্তিষ্কের দর্শনকেন্দ্রে বাহিত হয় এবং তখনই আমাদের দর্শনানুভূতি জাগে। যেভাবে সেই উল্টো প্রতিবিম্বকে আমরা সমশীর্ষ দেখতে পাই তা আজও জিজ্ঞাসার বিষয় হয়ে থাকলেও আমাদের দেখার মূলে আছে সামনের ঐ কর্ণিয়া বা অচ্ছোদ পটলটা এবং লেন্স।

বিশেষ বিশেষ কারণে অনেক সময় চোখের ঐ কর্ণিয়াটা অস্বচ্ছ হয়ে উঠে। তখনই মানুষ হারিয়ে ফেলে তার দৃষ্টিশক্তি। অনেক সময় অস্বচ্ছতাকে কাটাতে চিকিৎসকরা চোখে অস্ত্রোপচার করেন। কিন্তু এমন অনেক ক্ষেত্র আসে—যখন অস্ত্রোপাচারের মাধ্যমে দৃষ্টি শক্তিকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না। এমন ক্ষেত্রে অন্যের চোখ থেকে কর্ণিয়া সংগ্রহ করে দৃষ্টিহীনের চোখে অধিরোপন করা হয়। তাতে অন্ধ পুনরায় দৃষ্টি শক্তি ফিরে পায়।

মনে হয়, প্রাচীন ভারতীয় শল্য চিকিৎসকদের কারও কারও এই বিদ্যা জানা ছিল। তবে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। বিদ্যাটি একেবারে আধুনিককালের বলতে হবে। অন্ধদের দুর্দশা দূর করতে বহু আগে থেকে কোন

কোন মানব হিতৈষী বিজ্ঞানী প্রচেষ্টা অবশ্য চালিয়েছিলেন কিন্তু সফল হতে পারেন নি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের যথেষ্ট অগ্রগতি হলে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে কোন কোন চিকিৎসাবিদ মৃতের চোখ থেকে কর্ণিয়া সংগ্রহ করে অন্ধের চোখে লাগানোর ব্যবস্থা করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছিলেন সত্য তবে ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে গিয়ে ত্রুটিগুলো লক্ষ্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই ত্রুটিগুলোকে দূর করতে অনেকে যত্নবান হয়েছিলেন। এবং গবেষণাও হয়েছিল ব্যাপকভাবে।

সেদিন গবেষকরা বুঝতে পেরেছিলেন, মানুষের মৃত্যু ঘটলেও চোখ দুটো অনেকক্ষণ সক্রিয় থাকে। প্রায় দুই থেকে তিন ঘণ্টার মত। তাই উক্ত সময়ের ভেতরে মৃতের চোখ থেকে কর্ণিয়া সংগ্রহ করে অপরের চোখে যুক্ত করতে পারলে সফলতা আসবে। অর্থাৎ অন্ধরা দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন।

আসলে ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ সহজ নয়। অপরদিকে সদ্যমৃতের চক্ষুও সহজলভ্য নয়। জীবিতাবস্থায় কেউ স্বেচ্ছায় চক্ষুদান করে না গেলে অপর কারও কাছ থেকে চক্ষু লাভ একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠে। মৃতের আত্মীয়-স্বজনরা মৃতদেহকে যেমন বিকলাঙ্গ করতে চাননা, তেমনই মৃতকে ঘিরে নানা সংস্কার এখনও আমাদের মনে থেকে গেছে।

একের কর্ণিয়া অপরের চোখে সংযোজন করলে কিডনী প্রভৃতি সংযোজনের মত তত অসুবিধা হয় না। রক্তের মত কিডনীরও গ্রুপ নির্ণয় করতে হয়। একই গ্রুপের না হলে রক্ত, কিডনী ইত্যাদি শরীর গ্রহণ করতে চায় না। বরং বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হয় এবং সেই প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। কিন্তু কর্ণিয়ার বেলায় তা হয় না। কর্ণিয়ায় রক্তনালী খুব কম থাকার জন্য যে কোন লোকের কর্ণিয়া অন্যের টিস্যুর সঙ্গে মিল খেয়ে যায়।

পৃথিবীতে অন্ধের সংখ্যা বড় কম নয়। চোখ সংগ্রহও যে কোন মুহূর্তে সম্ভব নয়। কোন একজনের দৃষ্টিশক্তিকে ফিরিয়ে আনতে হলে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়—যদি কেউ স্বেচ্ছায় দান করেন। তাও সহসা সম্ভব হয় না। অপেক্ষা করতে হয় দাতার মৃত্যু পর্যন্ত। তাই অনেকেই ভাবলেন চোখ সহজলভ্য হতে পারে যদি বদান্য ব্যক্তিদের চোখকে সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা যায়। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং মানুষকে বুঝিয়ে মৃত্যুর পর যাতে চোখটা দান করে যান তার জন্যই আই ব্যাংক বা চক্ষুব্যাংকের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার মূলে জনৈক মার্কিন শল্য চিকিৎসকের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসকটির নাম ডাঃ জন এইচ. কিং। ডাঃ কিং শুধু আই ব্যাঙ্ক স্থাপন করেননি, একের কর্ণিয়া যাতে অন্ধের চোখে সুষ্ঠুভাবে পরানো যায় তার জন্যও গবেষণা করেছিলেন এবং উন্নত শল্য চিকিৎসার প্রবর্তনও করেছিলেন।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কর্ণিয়া সংযোজনের ব্যবস্থা চালু হলে কী হবে, শল্য চিকিৎসকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতেন। ফলে মূল্যবান

কর্ণিয়াটি নষ্ট হয়ে যেত। ডাঃ কিং-এর পদ্ধতি উন্নত হওয়ায় সে ভয় আর রইল না।

ডাঃ কিং ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। প্রতিষ্ঠানটির নাম ইনটারন্যাশন্যাল আই ফাউণ্ডেশন। সংক্ষেপে আই. ই. এফ। ডাঃ কিং আরও একটা মহান কাজ করেছিলেন। চক্ষুকে শুধু সংরক্ষণ করে ক্ষান্ত হননি. তাঁর দ্বারা উদ্ভাবিত শল্য চিকিৎসা এবং তাঁরই সংগ্রহ করা চোখ যাতে সারা পৃথিবীর অন্ধরা লাভ করতে পারেন—তার জন্য দান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে অতি অল্পকালের মধ্যে সংস্থাটির নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রায় সব দেশ থেকে চিকিৎসকরা ছুটে এসেছিলেন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে। অবশ্য চোখকে সংরক্ষণ করার উপায় ডাঃ কিংই আবিষ্কার করেছিলেন এবং কর্ণিয়াকে জলমুক্ত করে সাধারণ ঘরের উষ্ণতায় যাতে দীর্ঘদিন রাখা যায় তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন।

ডাঃ কিং-এর পদ্ধতি জনপ্রিয় হতে আদৌ বিলম্ব হয়নি। অত্যল্পকালের মধ্যে পৃথিবীর সব দেশেই চক্ষু সংগ্রহের প্রচেষ্টা চলে এবং আই ব্যাঙ্কও স্থাপিত হয়। ভারতে প্রথম দিল্লীতেই স্থাপিত হয়েছিল আই ব্যাঙ্ক। নাম ন্যাশন্যাল আই ব্যাঙ্ক। ওরই তত্ত্বাবধানে ভারতে বিভিন্ন জায়গায় বর্তমানে প্রায় চল্লিশটির মত আই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে। কলিকাতায় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ, ম্যাডিকেল কলেজ (২টি) এবং ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজেও আই ব্যাঙ্ক আছে।

বর্তমানে শল্য চিকিৎসার অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এখনও চক্ষু সহজলভ্য হয়নি। এখনও চক্ষুদান করার মানসিকতা ঠিক ঠিক গড়ে উঠেনি। অথচ এই ভারতেই প্রায় পঞ্চাশ লক্ষের মত অন্ধ আছে। সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে সবাই যদি এগিয়ে আসেন তাহলে অন্ধরা তাঁদের দুর্বিসহ জীবন থেকে মুক্তি পেতে পারবেন। দেখা গেছে, যাঁরা ১৪ বছর থেকে ৪০ বছরের মধ্যে অন্ধত্ব বরণ করেন, তাঁদের পক্ষে কর্ণিয়া সংযোজন খুবই উপযোগী। শতকরা একশ জনই দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পারেন।

কর্তিত অঙ্গের পুনঃ সংযোজন

হাইড্রা প্রভৃতি কিছু কিছু অতি নিম্নমানের জীবকে কেটে দু'খানা করে পুনরায় জোড়া লাগিয়ে দিলে জোড়া লেগে যায়। কিন্তু মানুষের মত

জটিল যাদের দেহগঠন তাদের অঙ্গ কোনও প্রকারে কেটে গেলে সে অঙ্গকে জোড়া দিলে জোড়া লাগেনা। বা প্ল্যানেরিয়া প্রভৃতি প্রাণীর মত কাটা অঙ্গ পুনর্গঠিতও হয় না।

মানব অঙ্গকে জোড়া লাগাবার পরিকল্পনা কিন্তু আজকের নয়, অনেক আগেই মানুষের মনে উদয় হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সম্ভব ছিলনা বলে গালগল্পই রচনা হতো। ভারতীয় পুরাণে অসুরদের হাত পা, এমনকি মাথা জোড়া লেগে যাওয়ার ঘটনা ও কল্পনা করা হয়েছিল।

যা ছিল কল্পনা, আজ তা অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে। না, মাথা কাটা গেলে কিছু করার নেই। শুধু হাত কিংবা পা কোন দুর্ঘটনায় কাটা পড়লে যদি মাত্র ঘণ্টা তিনেকের ভেতরে কাটা অঙ্গ নিয়ে কেউ যদি তেমন কোন অভিজ্ঞ শল্য চিকিৎসকের কাছে আসেন তাহলেই জোড়া দেওয়া সম্ভব। তাও কী কম কথা!

এমন অসাধ্যকে প্রথমে যাঁরা সাধন করেছিলেন, তাঁরা আমেরিকার বোস্টন শহরের একটি হাসপাতালের কয়েকজন শল্য চিকিৎসক। কথিত আছে, ঐ শহরে জনৈক ব্যক্তি তীক্ষ্ণধার একটা অস্ত্র নিয়ে কাজ করছিলেন। অসাবধানতা বশতঃ সহসা অস্ত্রটা বসে যায় বাম হাতের কব্জির একটু উপরে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটি হাত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করছিলেন, তাঁদেরই একজন বুদ্ধি করে কাটা হাতটা রুমালে জড়িয়ে লোকটিকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। শল্য চিকিৎসকরা এমন একটা সুযোগ পেয়ে কাটা হাতটা পুনর্বার জোড়া লাগাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

জোড়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু লোকটার কাটা অংশ আদৌ সচল হয়নি। সম্পূর্ণরূপে অসাড়ই ছিল। প্রায় ৬ মাস পরে একটু একটু করে অসাড় ভাবটা নষ্ট হয়। যদিও পুরোপুরি হলোনা, তবু অনেকখানি কর্মক্ষম হলো।

খবরটা একরকম বায়ুবেগে ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর শল্য চিকিৎসকদের মধ্যে। অনেকে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু তেমন রোগী সহসা পাওয়া যায় না। দুর্ঘটনার মাত্র দু-ঘণ্টার মধ্যে রোগীকে আনতে হবে কিনা! তাও আবার শুধু হাত পা কাটা গেলে। কেননা ঐ সময়ের পরে কাটা অঙ্গে রক্ত সঞ্চালন আর সম্ভব হয়না। অক্সিজেনের অভাবে সব কোষই অকেজো হয়ে পড়ে।

পরের ঘটনাটি ঘটে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। রবার্ট পেনেল নামে জনৈক কিশোরের দুর্ঘটনায় ফলে পুরো হাতটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঘণ্টা খানেকের ভেতরেই কিশোরটিকে নিয়ে যাওয়া হয় কালিফোর্নিয়ার ব্যাপটিস্ট হাসপাতালে। শল্য চিকিৎসক মেরিডিথ সুযোগটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। হাতটা জুড়ে দেওয়ার জন্য একরকম সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলেছিলেন অপারেশন টেবিলে। মেরিডিথ এবং তাঁর সহকারীদের প্রচেষ্টায় যথা সময়ে হাতটা জুড়ে

দেওয়া হলো। তারপর ফলাফল জানার জন্য তাঁরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

প্রচেষ্টা তাঁদের সার্থক হলো। কয়েকমাস পরে হাতটা সম্পূর্ণ নাহলেও অনেকখানি সচল হলো। হালকা কাজকর্ম করতে কোন অসুবিধা হলোনা কিশোরটির।

দুটি ঘটনাই পৃথিবীর সব দেশের চিকিৎসকদের মধ্যে দারুন সাড়া তুললো। সবাই সচেষ্ট হলেন দুর্ঘটনার ফলে হাত, পা, হাতের কিংবা পায়ের আঙ্গুল ইত্যাদি কাটা গেলে তাদের জোড়া লাগাতে। যাঁরাই সচেষ্ট হলেন, তাঁরাই সাফল্য অর্জন করলেন। চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের শল্য চিকিৎসকরাও অনুসরণ করলেন এই পদ্ধতি এবং পদ্ধতিটিকে আরও উন্নত করতে যত্নবান হলেন। যার ফলে মাত্র কয়েক বছরের ভেতরেই পদ্ধতিটির অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। তবে হ্যাঁ, কাটা যাওয়ার পর তিন ঘণ্টা অতীত হয়ে গেলে তারা পারছেন না, বা মাথা কাটা গেলেও মাথাটাকে জোড়া লাগানো যাচ্ছে না। যাবেই বা কেমন করে? হাত, পা ইত্যাদি কাটা গেলে কাটা অংশের রক্ত সঞ্চালন তিন ঘণ্টা কাল বন্ধ থাকলে বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হওয়ার দু-এক মিনিটের মধ্যেই যে মস্তিষ্ক তার কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে!

কাটা অঙ্গকে জুড়ে দেওয়ার বহু কারিগরি ব্যবস্থাও উদ্ভাবিত হয়েছে। একটা বিশেষ প্রযুক্তি। উদ্ভাবিত হয়েছে নানা যন্ত্রপাতি। কাটা অংশের হাড়কে জুড়ে দেওয়া হয় নাটবোল্টের সাহায্যে। রক্তবাহী নালীপথ গুলোকে সুন্দর করে রিপু করে দেওয়ার জন্য এমন সূচ এবং সুতোর আবিষ্কার করা হয়েছে—যাকে খালি চোখে দেখা যায় না। এর জন্য ব্যবহার করা হয় এক বিশেষ ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে। সেলাইও হাতে করা হয় না। সূচকে চালনা করা হয় যন্ত্রের সাহায্যে। আর জমাট বাঁধা রক্তকে ওষুধের মাধ্যমে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। ফলে নতুনভাবে রক্ত সঞ্চালিত হয় এবং রক্ত সঞ্চালন হতে হতে এক সময় অসাড়ভাব কেটে যায়। তবে সময় সাপেক্ষ।

আজকাল তাই হাত পা কাটা গেলে তাকে জোড়া লাগানো এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। শুধু দরকার উন্নতমানের যন্ত্রপাতি এবং অভিজ্ঞ শল্য চিকিৎসকের। তবে ব্যাপারটা তড়িঘড়ি সম্পন্ন করতে হয় বলে সহযোগী বহু শল্য চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়। অপরদিকে রোগীকে নিয়ে যেতে হয় যথাসময়ে। সব হাসপাতালে অবশ্য এমন ব্যবস্থাটা এখনও গড়ে ওঠেনি।

পটাসিয়াম সায়ানাইডের বিষক্রিয়া দূরীকরণ

পটাসিয়াম সায়ানাইডের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে অনেকেই অবহিত আছেন। বহু জনশ্রুতিও প্রচলিত। সম্ভব অসম্ভব নানা কাহিনী। বিশেষ করে গোয়েন্দা কাহিনীগুলোতে ওর ভয়ংকর বিষক্রিয়া অত্যন্ত ফলাও ভাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তাইতো সাধারণের ধারণা, সূচের ডগায় যতটুকু পটাসিয়াম সায়ানাইড উঠে কেবল সেইটুকুই জিভের ডগায় ছুঁইয়ে দিলেই ব্যস—সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায়। একটা কথা বলতে কিংবা একটা বর্ণ লিখতেও সময় হয় না।

না, এ ধারণা ঠিক নয়। পটাসিয়াম সায়ানাইড তীব্র ও ভয়ঙ্কর বিষ সত্য, কিন্তু অন্যান্য বিষের মত ওরও একটা নিম্নতম পরিমাণ আছে। সেই পরিমাণের নিচে হলে মরার সম্ভাবনা থাকে না। পরিমাণটি ৫০ মিলিগ্রামের মত। অপরপক্ষে পরিমাণ মত বিষ গ্রহণ করলেও মারা যেতে অন্ততঃ বিশ পঁচিশ মিনিট সময় লাগবেই।

পটাসিয়াম সায়ানাইড হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডের যৌগগুলোর মধ্যে অন্যতম। হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড নিজেও তীব্র বিষ এবং তার যৌগগুলোর প্রত্যেকটিই। পাণীয়ের সঙ্গে দু-চার ফোঁটা হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড মিশিয়ে দিলেই মৃত্যু অবধারিত।

হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড গ্যাসীয় ও তরল উভয় অবস্থায় থাকতে পারে। গ্যাসীয় অবস্থায় বলা হয় হাইড্রোজেন সায়ানাইড। তরল হলেই হাইড্রো সায়ানিক অ্যাসিড। ঠিক সেই হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেমন।

বড় কুক্ষণে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডের আবিষ্কার। আবিষ্কারক রসায়নবিদ সেই শীলে—যিনি ক্লোরিন প্রভৃতি অনেক গ্যাসের আবিষ্কারক। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে গ্যাসটিকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং পরের বছর অর্থাৎ ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেছিলেন পটাসিয়াম সায়ানাইডকে। আবিষ্কারের পূর্বে শীলে কিন্তু টের পাননি ওরা এত বেশী বিষাক্ত হবে।

যদিও ওদের কিছু কিছু ভাল কাজে প্রয়োজন হয়ে থাকে, তবু আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী মানুষ মরেছে ঐ হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাস এবং পটাসিয়াম সায়ানাইড দ্বারা। আত্মহত্যা যে কতজনে করেছে তার হিসেব পাওয়া যাবেনা বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে কতজন কতজনকে যে হত্যা

করেছে তার হিসেবও দাখিল করা যাবে না। শুধু নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ডের দু-একটা নমুনা তুলে ধরা যেতে পারে। কথিত আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার লক্ষ লক্ষ নিরীহ য়িহুদীদের হত্যা করেছিলেন হাইড্রোজেন সায়ানাইড ছড়িয়ে। ১৯৭৮ সালে গায়েনায় ধর্মগুরুর নির্দেশে ৯০০ জন মানুষ আত্মহত্যা করেছিলেন পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে।

অগ্নিযুগে ভারতের বিপ্লবীদের অনেকে পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছিলেন পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে। এখনও এর যুগ শেষ হয়নি। দুষ্কৃতিকারীরা যখন পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে অসমর্থ হয়, তখন তারাও ব্যবহার করে পটাসিয়াম সায়ানাইডের ক্যাপসুল। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর হত্যার ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত ছিল তারা প্রায় সবাই শেষ মুহূর্তে আত্মহত্যা করেছিল পটাসিয়াম সায়ানাইডের ক্যাপসুল মুখে পুরে।

হ্যাঁ, বড় ভয়ঙ্কর বিষ ঐ পটাসিয়াম সায়ানাইড এবং হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড। পরিমাণে যত বেশী যে গ্রহণ করে ততই তার বিষক্রিয়া তীব্র হয় এবং তাড়াতাড়ি মৃত্যুবরণ করে। ওদের বিষাক্ততার মূলে আছে cN আয়ন। ঐ আয়নটা খাওয়ার পরে পরে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর ভেদ করে রক্তে মিশে যায়। এবং রক্তের দ্বারা বাহিত হয়ে দেহকোষের শক্তিঘর নামে খ্যাত মাইটোকনড্রিয়াকে বিধ্বস্ত করে। অপরদিকে রক্তে cN আয়নের উপস্থিতিতে কোষে কোষে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়ে। শ্বাস গ্রহণে অসমর্থ হয় গ্রহণকারীরা।

বর্তমানে পটাসিয়াম সায়ানাইড বিষেরও চিকিৎসা প্রচলিত হয়েছে। নানা ধরণের অঘটন ঘটতে থাকায় বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং প্রথম কুকুরকে নিয়েই পরীক্ষা শুরু করা হয়। cN আয়ন প্রতিরোধ ক্ষমতা মানুষ অপেক্ষা কুকুরের অনেকখানি কম বলেই বিজ্ঞানীরা গবেষণার জন্য কুকুরের উপর প্রয়োগ করেছিলেন পটাসিয়াম সায়ানাইডকে। উক্ত পরীক্ষা থেকে গবেষকরা বুঝতে পারেন, মাইটোকনড্রিয়ায় সালফার ট্রানসফারেজ নামে যে এনজাইমটি রয়েছে সেই এনজাইমটি দেহের অন্যান্য সালফার ঘটিত যৌগ থেকে সালফার সংগ্রহ করে এবং cN আয়নকে থায়োসায়ানেট আয়নে রূপান্তরিত করণের প্রচেষ্টা চালায় বিষক্রিয়াকে প্রশমিত করার জন্য। অতঃপর থায়োসায়ানেট আয়ন প্রস্রাবের মাধ্যমে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেহে সালফারের পরিমাণটা নিতান্তই কম। তাই দেহ পারেনা পটাসিয়াম সায়ানাইডের সমূহ cN আয়নকে নিষ্কাশন করে ফেলতে।

উক্ত গবেষণার পর চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা পটাসিয়াম সায়ানাইড বিষে জর্জরিত শরীরের রক্তের সঙ্গে পরিমাণ মত সালফারের কোন যৌগকে অনুপ্রবেশ ঘটানোর চিন্তা করেন। অনেক চিন্তাভাবনার পর একটি বিশেষ যৌগ সোডিয়াম থায়োসালফেটকে নির্বাচিত করেন। এবং প্রথমেই প্রয়োগ করেন

কুকুরের দেহে। কুকুরটি সুস্থ হয়ে উঠতেই তাঁরা বুঝতে পারেন, পটাসিয়াম সায়ানাইড অথবা হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডের প্রতিষেধক সোডিয়াম থায়ো সালফেট হতে পারে।

বর্তমানে এই ব্যবস্থার আরও কিছুটা উন্নতি হয়েছে। পটাসিয়াম সায়ানাইড খাওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসা করালে রোগীর সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। চিকিৎসা পদ্ধতি আদৌ জটিল নয়। রোগীর শিরার ভেতরে সোডিয়াম থায়ো সালফেট দ্রবণ এবং সোডিয়াম নাইট্রেট দ্রবণ ইনজেক্‌শনের মাধ্যমে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। রোগীর শ্বাসকষ্ট রোধ করতে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করা হয় অক্সিজেন।

সময় মত চিকিৎসা পেলে রোগীর ভয়ের সম্ভাবনা নেই। তবে সময়টা নিতান্তই কম। মাত্র আধ ঘণ্টা। আরও পূর্বে হলে ভাল হয়। অর্থাৎ মিনিট পনেরর মধ্যে রোগী চিকিৎসা পেলে ভাল হয়। কিন্তু রোগীকে হাসপাতালে আনতে আনতেই কখন এই সময়টা অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয়না।

যত মৌলিক পদার্থ

প্রতিদিন আমরা কত সহস্র সহস্র বস্তুর সংস্পর্শে না এসে থাকি! পৃথিবীর বস্তুরাশিকে গণনা করে যেন শেষ করা যায় না। কেউ বলেন চল্লিশ কোটির মত, কেউ বলেন আরও ঢের ঢের বেশী। মজার কথা হচ্ছে, সংখ্যাটা আবার স্থির নয়। বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় নিত্য বেড়েই চলেছে।

পৃথিবীর এত যে বস্তু, এদের প্রত্যেকের উপাদান একটি, দুটি, তিনটি কিংবা তার অধিক কিছু কিছু মৌলিক পদার্থ। মৌলিক পদার্থরা বিভিন্ন অনুপাতে একটির সঙ্গে আর একটি যুক্ত হয়ে গঠন করেছে যৌগিক পদার্থ। মিশ্রনও আছে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী কারবন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের দ্বারা গঠিত যৌগ। তিনটি মৌলই নানা অনুপাতে যুক্ত হয়ে গঠন করেছে লক্ষ লক্ষ যৌগ। অপরাপরদের মধ্যে নাইট্রোজেন, সালফার, কতকগুলো ধাতু, ইত্যাদি প্রধান।

যাই হোক না কেন আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা প্রকৃতিতে মোট বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। আর কৃত্রিমভাবে তৈরি করেছেন বেশ কয়েকটি। সেই সংখ্যা এখন স্বীকৃতি লাভ করেছে ১০৭। নামকরণ হয়েছে

১০৫টির। অপরদিকে ১০৭এর পরে আরও কয়েকটিকে কৃত্রিমভাবে তৈরি করতে পেরেছেন বলেও দাবী করা হয়েছে।

মৌলিক পদার্থ হচ্ছে তেমন পদার্থ যাকে বিশ্লেষণ করলে শুধু সেই পদার্থ ছাড়া অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না। মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বিজ্ঞানীরা প্রদান করেছেন। তার আগে বহু মৌলিক পদার্থ মানুষের হাতে এলেও তাদের প্রকৃত স্বরূপ কেউ উদ্ঘাটন করতে পারেন নি। এমনকি গ্রীক পণ্ডিতদের জ্ঞানও ছিল ভাসা ভাসা।

মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে প্রথম ধারণা এসেছিল শীলে, প্রিস্টলি, ক্যাভেণ্ডিস, ল্যাভোসিয়ার প্রভৃতি যুগন্ধর রসায়ন বিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে। তাঁদের পরীক্ষাগুলো থেকে পরবর্তীকালে মৌলিক পদার্থের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে মৌলিকপদার্থ আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। যার জন্য তাঁরা নানাধরনের খনিজ পদার্থকে বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছিলেন।

অতি প্রাচীনকালে যে সব মৌলিকপদার্থ মানুষের হাতে এসেছিল, তাদের মধ্যে ধাতুই প্রাচীন। সোনা, তামা, রুপা, দস্তা, টিন ও লোহা। প্রস্তরযুগে মানুষ কয়লারও পরিচয় পেয়েছিল, তবু টিন সম্বন্ধে কিছুটা মতদ্বৈধতা আছে। ব্রোঞ্জযুগে মানুষ প্রকৃতপক্ষে তামার সঙ্গে টিন মেশাতো কিনা সে বিষয়ে জোরালো কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। সালফারকেও লাভ করেছিল সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে। পারদকেও লাভ করেছিল খ্রীষ্টজন্মের আগে সম্ভবতঃ পারদ প্রথম ভারতেই তৈরী করা হয়েছিল।

মধ্যযুগে অ্যালকেমিস্টদের প্রচেষ্টায় আরও কিছু কিছু মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছিল। বিশেষ করে ফসফরাস, অ্যাণ্টিমনি, বিসমাথ ও আর্সেনিক অ্যালকেমিস্টদের অবদান। যদিও অ্যাণ্টিমনির উল্লেখ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লেখা প্লিনির গ্রন্থে দেখা যায়। সেখানে আরও উল্লেখ আছে, গ্রীক ডায়াস্কোরিডেস অ্যাণ্টিমনি সালফাইডের পরিচয় লাভ করেছিলেন।

উপরোক্ত মাত্র কয়েকটি মৌলিক পদার্থ ছাড়া বাদবাকি সবই আবিষ্কৃত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে। নিচে পরমাণু ক্রমাঙ্ক অনুসারে মৌলিক পদার্থগুলোকে সজ্জিত করে তাদের কোনটি কত খ্রীষ্টাব্দে কে আবিষ্কার করেছিলেন এবং কোন দেশে আবিষ্কৃত হয়েছিল তার একটি তালিকা প্রদান করা গেল।

পরমাণু ক্রমাঙ্ক	নাম	চিহ্ন	আবিষ্কারক	দেশ	খ্রীষ্টাব্দ
১	হাইড্রোজেন	H	ক্যাভেণ্ডিস	ব্রিটেন	১৭৬৬
২	হিলিয়াম	He	র‍্যামজে	,,	১৮৯৫
৩	লিথিয়াম	Li	আর্ভেডসন	সুইডেন	১৮১৭

পরমাণু ক্রমাঙ্ক	নাম	চিহ্ন	আবিষ্কারক	দেশ	খ্রীষ্টাব্দ
৪	বেরিলিয়াম	Be	ভাকেলিন	ফ্রান্স	১৭৯৮
৫	বোরন	B	গেলুসাক, থেমার্ড	,,	১৮০৮
৬	কারবন	C	প্রাচীন আবিষ্কার		
৭	নাইট্রোজেন	N	শীলে, ক্যাভেণ্ডিস প্রিস্টলি	সুইডেন	১৭৭২
৮	অক্সিজেন	O	প্রিস্টলি	,,	১৭৭৪
৯	ফ্লোরিন	F	ময়সা	ফ্রান্স	১৮৮৬
১০	নিয়ন	Ne	র‍্যামজে, ট্রাভার্স	বৃটেন	১৮৯৮
১১	সোডিয়াম	Na	ডেভি	,,	১৮০৭
১২	ম্যাগনেসিয়াম	Mg	ডেভি	,,	১৮০৮
১৩	অ্যালুমিনিয়াম	Al	ভোলার	জাপান	১৮২৭
১৪	সিলিকন	Si	বার্জেলিয়াম	সুইডেন	১৮২৪
১৫	ফসফরাস	P	ব্রান্ড	,,	১৬৬৯
১৬	সালফার	S	প্রাচীন আবিষ্কার		
১৭	ক্লোরিন	Cl	শীলে	সুইডেন	১৭৭৪
১৮	আর্গন	A	র‍্যালে ও র‍্যামজে	বৃটেন	১৮৯৪
১৯	পটাসিয়াম	K	ডেভি	,,	১৮০৮
২০	ক্যালসিয়াম	Ca	ডেভি	,,	১৮০৮
২১	স্ক্যাণ্ডিয়াম	Sc	নেলসন	সুইডেন	১৮৭৯
২২	টাইটেনিয়াম	Ti	গ্রেগর	ফ্রান্স	১৭৯৫
২৩	ভ্যানাডিয়াম	V	শেফস্ট্রয়াম	সুইডেন	১৮৩০
২৪	ক্রোমিয়াম	Cr	ভ্যাকেলিন	ফ্রান্স	১৭৯৭
২৫	ম্যাঙ্গানিজ	Mn	গান	সুইডেন	১৭৭৪
২৬	আয়রণ	Fe	প্রাচীন আবিষ্কার		
২৭	কোবাল্ট	Co	ব্রাণ্ড	সুইডেন	১৭৩৫
২৮	নিকেল	Ni	ক্রনস্টেড	,,	১৭৫১
২৯	কপার	Cu	প্রাচীন আবিষ্কার		
৩০	জিঙ্ক	Zn	প্রাচীন আবিষ্কার		
৩১	গেলিয়াম	Ga	বাউড্যান	ফ্রান্স	১৮৭৫
৩২	জার্মেনিয়াম	Ge	উইংকার	জার্মান	১৮৮৬
৩৩	আর্সেনিক	As	আলবার্টাস মার্গাস	,,	১২৫০
৩৪	সেলেনিয়াম	Se	বার্জেলিয়াস	সুইডেন	১৮১৭
৩৫	ব্রোমিন	Br,	বেলার্ড	ফ্রান্স	১৮২৫
৩৬	ক্রিপটন	Kr.	র‍্যামজে, ট্রাভার্স	বৃটেন	১৮৯৮
৩৭	রুবিডিয়াম	Rb	বুনসেন ও কার্শফ	জার্মান	১৮৬১

সরমাণ্ক্রমাঙ্ক	নাম	চিহ্ন	আবিষ্কারক	দেশ	খ্রীষ্টাব্দ
৩৮	স্ট্রনসিয়াম	Sr	ডেভি	বৃটেন	১৮০৮
৩৯	ইট্রিয়াম	Y	গ্যাডোলিন	সুইডেন	১৭৯৪
৪০	জারকোনিয়াম	Zr	এম. ক্লাপথ	জার্মান	১৭৮৯
৪১	নাইওবিয়াম	Nb	হ্যাচেট	বৃটেন	১৮০১
৪২	মলিবডেনাম	Mo	হেলম	সুইডেন	১৭৮১
৪৩	টেকনিসিয়াম	Te	পেরিয়ার, সগ্রে	ইতালি	১৯৩৭
৪৪	রুথেনিয়াম	Ru	ক্লাউস	রাশিয়া	১৮৪৪
৪৫	রোডিয়াম	Rh	ওলাস্টন	বৃটেন	১৮০৪
৪৬	প্যালেডিয়াম	Pd.	,,	,,	১৮০৩
৪৭	সিলভার	Ag.	প্রাচীন আবিষ্কার		
৪৮	ক্যাডমিয়াম	Cd	স্ট্রোমায়ার	জার্মান	১৮১৭
৪৯	ইণ্ডিয়াম	In	রাইচ, রিকটার	জার্মান	১৮৬৩
৫০	টিন	Sn	প্রাচীন আবিষ্কার		
৫১	অ্যাণ্টিমনি	Sb	প্রাচীন আবিষ্কার		
৫২	টেলুরিয়াম	Te	রাইখেনস্টাইন	অস্ট্রিয়া	১৭৮২
৫৩	আয়োডিন	I	কুর্তোয়াঁ	ফ্রান্স	১৮১১
৫৪	জেনন	Xe	র‍্যামজে' ট্রাভার্স'	বৃটেন	১৮৯৮
৫৫	সিজিয়াম	Cs	বুনসেন, কার্শফ	জার্মান	১৮৬০
৫৬	বেরিয়াম	Ba	—	সুইডেন	১৭৭৪
৫৭	ল্যান্থানাম	La	মি. মোসাণ্ডার	,,	১৮৩৯
৫৮	সেরিয়াম	Ce	এম. ক্লপর্থ	,,	১৮০৩
৫৯	প্রাসিওডিনিয়াম	Pr	ওয়েলসবার্ক	অস্ট্রিয়া	১৮৮৫
৬০	নিওডিনিয়াম	Nd	ওয়েলস্‌বার্ক	,,	১৮৮৫
৬১	প্রমিথিয়াম	Pm	মারিনস্কি	রাশিয়া	১৯৪৫
৬২	সামারিয়াম	Sm	বাউড্যান	ফ্রান্স	১৮৭৯
৬৩	ইউরোপিয়াম	Eu	দেমাকে	,,	১৯০১
৬৪	গ্যাজেলিনিয়াম	Gd	মারিভানাক	,,	১৮৮৬
৬৫	টার্বিয়াম	Tb	মি. মোসাণ্ডার	সুইডেন	১৮৮৩
৬৬	ডিসপ্রোসিয়াম	Dy	বার্ডড্যান	ফ্রান্স	১৮৮৬
৬৭	হলমিয়াম	Ho	সোরেট	সুইডেন	১৮৭৯
৬৮	এরবিয়াম	Er	মি. মোসাণ্ডার	,,	১৮৮৩
৬৯	থুলিয়াম	Tm	ক্লীভ	,,	১৮৭৯
৭০	ইটারবিয়াম	Yb	ম্যারিগনাক	সুইজারল্যাণ্ড	১৮৭৮
৭১	লুটেসিয়াম	Lu	আর্বান	ফ্রান্স	১৯০৭

পরমাণু ক্রমাঙ্ক	নাম	চিহ্ন	আবিষ্কারক	দেশ	খ্রীষ্টাব্দ
৭২	হাফনিয়াম	Hf	কাস্টার ও হেভেসি	ডেনমার্ক	১৯২৩
৭৩	ট্যাণ্টালাম	Ta	একবার্ক	সুইডেন	১৮০২
৭৪	টাংস্টেন (উলফ্রাম)	W	এলহুইলার	,,	১৭৮১
৭৫	রেনিয়াম	Re	ট্যাবার্গ, প্রভৃতি	জার্মান	১৯২৫
৭৬	অসমিয়াম	Os	টেন্যাণ্ট	বৃটেন	১৮০৪
৭৭	ইরিডিয়াম	Ir	টেন্যাণ্ট	,,	১৮০৪
৭৮	প্লাটিনাম	Pt	উড, উলোয়া	,,	১৭৪১
৭৯	গোল্ড	Au	প্রাচীন আবিষ্কার		
৮০	মার্কারি	Hg	প্রাচীন আবিষ্কার		
৮১	থ্যালিয়াম	Tl	ক্রুকস	বৃটেন	১৮৬১
৮২	লেড	Pb	প্রাচীন আবিষ্কার		
৮৩	বিসমাথ	Bi	জিওফ্রে	—	১৭৫৩
৮৪	পোলোনিয়াম	Po	কুরিদম্পতি	ফ্রান্স	১৮৯৮
৮৫	অ্যাসটাটাইন	At	সেগ্রে, ম্যাকিঞ্জি	আমেরিকা	১৯৪০
৮৬	রেডন	Rn	ডন	বৃটেন	১৯০০
৮৭	ফ্রান্সিয়াম	Fr	পেরে	ফ্রান্স	১৮৩৯
৮৮	রেডিয়াম	Ra	কুরিদম্পতি	,,	১৮৯৮
৮৯	অ্যাকটিনিয়াম	Ac	দ্যাবির্নে, পীসলে	,,	১৮৯৯
৯০	থোরিরাম	Th	বার্জেলিয়াম	সুইডেন	১৮২৮
৯১	প্রোট্যাক্-টিনিয়াম	Pa	অটোহান, লিজেমাইটনার	জার্মান	১৯১৭
৯২	ইউরেনিয়াম	U	এম. ক্লাপর্থ	,,	১৭৮৯

৯৩ পরমাণু ক্রমাঙ্ক থেকে পরের দিকে সমস্ত মৌলিক পদার্থই কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা হয়েছে। সেই কথায় এবার আসা যেতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এক অতি আশ্চর্য ধরনের পদার্থের সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা। সর্বপ্রথম ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী হেনরি বেকারেল দেখালেন ইউরেনিয়াম পটাসিয়াম সালফেট থেকে এক ধরণের রশ্মি নির্গত হয়। পরে ইউরেনিয়ামের অপরাপর যৌগকে নিয়েও পরীক্ষা করলেন। দেখলেন, সর্বক্ষেত্রেই সেই বিশেষ রশ্মিটি নির্গত হচ্ছে। অথচ প্রতি প্রভার সঙ্গে এই রশ্মি বিকিরণের কোন সম্পর্ক নেই। সূর্যরশ্মি বা অন্য কোন ভৌত বা রাসায়নিক শক্তির উপরও এই রশ্মিনির্গমন ক্রিয়া নির্ভর করছে না। একেবারে স্বতঃস্ফুর্তভাবে রশ্মি নির্গমন হচ্ছে।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আরও দুটি মৌলিকপদার্থ আবিষ্কৃত হলো। নাম পোলোনিয়াম এবং রেডিয়াম। পিচব্লেণ্ড নামক এক আকরিক থেকে আংশিক কেলাসনের দ্বারা পাওয়া গেল। দেখা গেল, এদের থেকে নির্গত রশ্মি ইউরেনিয়াম থেকেও জোরালো। নানা চিন্তা ভাবনার পর ঐ রশ্মির নাম রাখা হয় তেজস্ক্রিয় রশ্মি এবং যে সব মৌল থেকে এইভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্ব-অবস্থায় রশ্মি নির্গমন ক্রিয়া অব্যাহত থাকে তাদের নাম দেওয়া হলো তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড এবং তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়াম থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেন, এতে দু-ধরনের রশ্মি বিদ্যমান। আলফা রশ্মি ও বিটা রশ্মি। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ভিলার্ড ঐ রশ্মির মধ্যে আরও একধরনের রশ্মির সন্ধান পান এবং নাম রাখা হয় গামা রশ্মি।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রাদারফোর্ড এবং সডি তেজস্ক্রিয়তার উপর এক নতুন মতবাদ আনয়ন করেন। তাঁদের মতবাদ অনুসারে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা খুব বেশী হলে ভঙ্গুরত্ব দেখা দেয়। এমনক্ষেত্রে পরমাণুগুলোর একটা নির্দিষ্ট অংশের নিউক্লিয়াস থেকে একটা 'আলফা'কণা অথবা একটা 'বিটা' কণা বেরিয়ে আসে। কণা নিষ্কাশনের ফলে নিউক্লিয়াসের বিদ্যুৎকণা পরিবর্তিত হয় এবং পরমাণু ক্রমাঙ্কও পরিবর্তিত হয়। এইভাবে সৃষ্টি হয় নতুন মৌলের।

অতঃপর বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, যেসব মৌলিক পদার্থের পারমানবিক ওজন ২০৬ এর বেশী কেবল তারাই তেজস্ক্রিয়তা প্রদর্শন করতে পারে এবং ওরা একটা নির্দিষ্ট হারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অবশেষে ওরা এক স্থায়ী মৌলে পরিণত হয়। অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবেই এই সব মৌলের মৌলান্তর ঘটে।

এবার বিজ্ঞানীদের ধারণা হলো, স্বাভাবিকভাবে যখন মৌলান্তর ঘটে, তখন এক মৌল থেকে আর এক মৌল কৃত্রিম উপায়েও প্রস্তুত করা যাবে। এই ব্যাপারে প্রথম সেই রাদারফোর্ডই আলফা কণাকে নিউক্লিয়াস ভাঙ্গার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন এবং কৃতিত্বও প্রদর্শন করেন।

এক মৌল থেকে অন্য মৌল তৈরি করার স্বপ্ন কিন্তু মানুষের অনেক কালের। সেই কবে কিমিয়াবিদরা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন লোহার মত নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনাতে পরিণত করতে। সব চেষ্টা তাঁদের ব্যর্থ হয়েছিল। মৌলান্তরকে সম্ভব করলেন রাদারফোর্ড নিজেই।

বিজ্ঞানীরা এবার সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য মেতে উঠলেন গবেষণায়। ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হলো নানান ধরনের যন্ত্র। যন্ত্রের সাহায্যে তেজস্ক্রিয় নয় এমন মৌলিক পদার্থের পরমাণুদের শক্তিশালী কণা দিয়ে আঘাত করে যেমন তেজস্ক্রিয় মৌলে পরিণত করা সম্ভব হলো, তেমনই সম্ভব হলো ইউরেনিয়াম অপেক্ষাও অধিক পারমাণবিক ওজনের মৌল সৃষ্টি করা।

প্রথম ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন ফ্রেডারিক জোলিও এবং ইরেন জোলিও কুরী। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রথন কৃতিত্বের অধিকারী হলেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা।

প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত এবং কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত মৌলের সংখ্যা বর্তমানে ১০৭। কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত মৌলদের নাম, পরমাণু ক্রমাঙ্ক, আবিষ্কারক দেশ এবং আবিষ্কারের সময় উল্লেখ করা হলো।

পরমাণু ক্রমাঙ্ক	নাম	চিহ্ন	আবিষ্কারক দেশ	খ্রীষ্টাব্দ
৯৩	নেপচুনিয়াম	Np	আমেরিকা	১৯৪০
৯৪	প্লুটোনিয়াম	Pu	,,	১৯৪০
৯৫	আমেরেসিয়াম	Am	,,	১৯৪৫
৯৬	কুরিয়াম	Cm	,,	১৯৪৪
৯৭	বার্কলিয়াম	Bk.	,,	১৯৫০
৯৮	কালিফোর্নিয়াম	Cf	,,	১৯৫০
৯৯	আইনস্টাইনিয়াম	En	,,	১৯৫২
১০০	ফার্মিয়াম	Fm	,,	১৯৫২
১০১	মেণ্ডাভিলিয়াম	Mv	,,	১৯৫৫
১০২	নোবেলিয়াম	No	রাশিয়া	১৯৬৩
১০৩	লরেন্সিয়াম	Lw	আমেরিকা	১৯৬১
১০৪	কুরচাটোভিয়াম	Kr	রাশিয়া	১৯৮৪
১০৫	হানিয়াম	Ha	,,	১৯৭০
১০৬	নামকরণ হয়নি	—	,,	১৯৭৪
১০৭	নামকরণ হয়নি	—	,,	১৯৭৬

বলা বাহুল্য কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত মৌলগুলোর নামকরণ করা হয়েছে কোন দেশের নামে কিংবা বিজ্ঞানীদের নামে। মার্কিন বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে তৈরি করেছেন ১০টি মৌল। আবিষ্কারকদের মধ্যে প্রধান বিজ্ঞানী সিবর্গ এবং আলবার্ট জিয়র্সো। অবশ্য এঁদের সাহায্য করেছেন বহু সহযোগী বিজ্ঞানী। রাশিয়ার আবিষ্কারকদের মধ্যে প্রধান জি, ফ্লোরভ এবং তাঁর সহযোগীরা। ১০৬ এবং ১০৭ পরমাণু ক্রমাঙ্কের মৌলগুলো বেশ ক্ষণস্থায়ী এবং এগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে দুবনার গবেষণাগার থেকে।

ভবিষ্যতে আরও অনেক কৃত্রিম মৌলিকপদার্থ তৈরী হতে পারে। ১০৮ থেকে ১১০ পর্যন্ত পরমাণু ক্রমাঙ্কের মৌল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হবে এবং এদের আবিষ্কার করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে। ওদের অর্ধায়ু সেকেণ্ডের শত শত ভাগের ভাগ।

বিজ্ঞানীরা আশা প্রকাশ করেছেন, পরের দিকে অর্থাৎ আরও উচ্চ পরমাণু

ক্রমাঙ্কের কিছু কিছু মৌলিক পদার্থের মধ্যে অত্যাশ্চর্য গুণ লক্ষ্য করা যাবে। ওদের অর্ধায়ু অনেক অনেক বেশী হবে। হয়ত ইউরেনিয়ামের চেয়েও বেশী। এমন কিছু কিছু মৌলের দ্বীপ আছে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এ বিষয়ে প্রথম ভবিষ্যবানী করেছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী সোয়াইন। তাঁর মতে ঐ দ্বীপগুলোর পরমাণু ক্রমাঙ্ক হবে যথাক্রমে ১১৪, ১২৬, ১৬৪, ১৮৪ বা তার কাছাকাছি। বর্তমানে ১১৪ পরমাণু ক্রমাঙ্কের মৌলটি আবিষ্কৃত হয়েছে বলেও দাবী করা হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এখনও লাভ করেনি। তোমরা ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীরা মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করতে চাইলে ঐ দ্বীপ গুলোকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে।

পেট্রোলিয়াম

ভূগর্ভ থেকে যত রকমের সম্পদ আহরণ করা হয় তাদের মধ্যে পেট্রোলিয়ামের স্থান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা মেটাতে ওর জুড়ি নেই। তাইতো ওকে বলা হয় তরল সোনা। কেউ কেউ আবার বলেন কলকারখানার রক্ত। ঠিক তাই। জীবনের পক্ষে রক্ত যেমন অপরিহার্য, তেমনই যে কোন কলকারখানার পক্ষে অপরিহার্য তেল। বিদ্যুৎ-চালিত ইঞ্জিনেও পিচ্ছিলকারক তেল প্রয়োগ করতে হয়।

প্রকৃতির ভাণ্ডারে কোথা থেকে জমা পড়লো এত তেল? বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আদিম পৃথিবীর মৃত সামুদ্রিক জীবদেহ থেকে এর উৎপত্তি। সেদিন সমুদ্রে জীব এসেছিল অসংখ্য। পৃথিবী ছিল অশান্ত। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন কোন কোন জায়গায় এক একটা উপনিবেশ মাটি চাপা পড়ে যায়। দীর্ঘকাল ধরে মাটির তলায় অবস্থান করায় অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে এবং একজাতীয় জীবাণুর ক্রিয়ায় কালক্রমে তাদের দেহ থেকে তৈরি হয়েছে তেল। খনি থেকে প্রাপ্ত পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে লবণজলের উপস্থিতি লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীরা অনুরূপ সিদ্ধান্তে এসেছেন। প্রাকৃতিক গ্যাসেরও সৃষ্টি হয়েছে এইভাবে।

পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস সাধারণতঃ মাটির তলায় দুটি অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের মাঝখানে অপেক্ষাকৃত সছিদ্রস্তরে সঞ্চিত হয়েছে। স্তরগুলো সর্বত্র অনুভূমিক নয়। কোথাও উঁচু, আবার কোথাও নিচু। স্তরগুলোর নিম্নাংশে অবতল বাঁকে প্রেট্রোলিয়াম থাকে এবং উপরের উত্তলবাঁকে পৃথকভাবে অবস্থান

কল্প প্রাকৃতিক গ্যাস।

পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসকে মানুষ উত্তোলন করেছে মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। কিন্তু এদের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়েছিল অনেক আগে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে। তখন মানুষ ওর কদর বুঝেনি। দেখতো, ভূগর্ভের ফাটল থেকে কিংবা খানাখন্দ থেকে আপনিই মাঝে মাঝে নির্গত হয় কালো, আঠালো এবং দুর্গন্ধযুক্ত একজাতীয় তরলপদার্থ। ঘৃণাভরেই ওদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতো মানুষ।

তবে কোন কোন দেশ ওদের কিছু কিছু কাজেও লাগিয়েছিল। প্রাচীন কালে পারস্য ভূগর্ভথেকে বেরিয়ে আসা চটচটে সেই বিশ্রী তরলটাকে আঠা হিসাবে ব্যবহার করতো। শোনা যায়, খৃষ্টজন্মের প্রায় হাজার বছর আছে, চীনদেশ নাকি ভূগর্ভ থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসকে উদ্ধার করতো এবং কাজেও লাগাতো।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভূগর্ভথেকে ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসা বিদঘুটে গন্ধযুক্ত আঠালো ঐ তরলটার প্রতি কেউ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন নি। প্রথম আকর্ষণ করে লর্ড প্লেফেয়ার নামে এক ইংরজ বিজ্ঞানীকে। তিনি ওকে নিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন। একসময় বুঝতে পারলেন, এর মধ্যে এমন এক উপাদান আছে যাকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং আলো জ্বালাবার কাজেও।

প্লেফেয়ার দীর্ঘ প্রচেষ্টা চালালেন ওকে পরিশুদ্ধ করতে। শেষে সফল ও হলেন। অবশেষে তিনি ঐ দুর্গন্ধযুক্ত তরলটাকে কোন্ কোন্ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে সে বিষয়ে সবাইকে অবহিত করানোর জন্য প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন।

চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কার্নেল ড্রেক নামে এক উৎসাহী প্রযুক্তিবিদ তেলকে উত্তোলিত করার জন্য পেনসিলভেনিয়ায় একটি কূপ খনন করলেন। উত্তোলনের পর প্লেফেয়ারের পদ্ধতিতেই পরিশোধন করলেন এবং পৃথিবীকে প্রথম উপহার দিলেন খনিজ তেল।

প্লেফেয়ারের কথা সত্য হলো। তিনি ওকে ব্যবহারের যে সব সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন তার চেয়েও বেশী সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল।

কর্নেল ড্রেক পেনসিলভেনিয়ার সেই তৈলকূপ থেকে প্রতিদিন গড়ে ৮৪০ গ্যালন করে তেল উত্তোলন করেছিলেন এবং উত্তোলন করেছিলেন প্রায় একবছর ধরে। সেই একবছর ওর চাহিদা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, বছর ঘুরতে না ঘুরতে সব দেশেই তৈলকূপ খননের জন্য সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এবং কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে সে নিয়ে খোঁজ খবর শুরু হয়ে গিয়েছিল।

সবচেয়ে বেশী পাওয়া গিয়েছিল আমেরিকায়। মেক্সিকো, টেক্সাস, কালিফোর্নিয়া এবং পেনসিলভেনিয়ায় প্রচুর কূপ খনন করা হলো। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায়ও চললো অনুসন্ধানের কাজ। পাওয়া গেল রুমানিয়া, রাশিয়া, ইরাক, ইরান, ব্রহ্মদেশ এবং ভারতের গুজরাট ও আসামে।

ধীরে ধীরে উত্তোলন ব্যবস্থার উন্নতি হলো। উন্নতি হলো অনুসন্ধান চালানোর কাজ। রিগ বা খনন যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় ভূগর্ভের হাজার হাজার ফুট গভীর থেকেও তেলকে উত্তোলন করা সম্ভব হলো। সভ্যজগৎ অল্পকালের মধ্যে খনিজ তেলের একেবারে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লো। যে দেশে খনিজতেল যত বেশী পাওয়া গেল সে দেশ ক্রমে তত ধনী হয়ে উঠলো এবং যেদেশে পাওয়া গেলনা বা অল্প পাওয়া গেল তাকে নির্ভর করতে হলো তৈলসমৃদ্ধ দেশের উপর। কলকারখানায়, যানবাহনে, নিত্য প্রয়োজনীয় জ্বালানী ও আলো-জ্বালাবার উপাদান হিসেবে এবং সামরিক প্রয়োজনে সর্বত্রই ব্যবহার চালু হয়ে গেল। খনিজ পেট্রোলিয়ামকে শোধন করে বিভিন্ন কাজের উপযোগী লঘু, মধ্যম ও ভারী সবরকমের তেল পাওয়া গেল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়ের ঘটনা। জার্মানিকে খনিজ তেলের জন্য নির্ভর করতে হতো বিদেশের উপর, অথচ যুদ্ধের প্রধান হোতা ছিল জার্মানি। সামরিক প্রয়োজনে তেলের যথেষ্ট প্রয়োজন হবে বলে জার্মান বিজ্ঞানীরা সংশ্লেষণী পদ্ধতিতে লঘু তেল গ্যাসোলিনকে তৈরি করেছিলেন। দুটি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের নামানুযায়ী একটি পদ্ধতির নাম বার্জিয়াস পদ্ধতি এবং অপরটির নাম ফিশার ট্রপ্শ পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতিতে ফেরিক অক্সাইড অনুঘটকের উপস্থিতিতে ৪৫০° থেকে ৫০০° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় হাইড্রোজেনের উপস্থিতিতে কয়লাচূর্ণ এবং ভারী তেলের লেইকে ৩০০ থেকে ৭০০ বায়ুমণ্ডলীর চাপে পিষ্ট করা হয়।

ফিসারট্রপস পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয় ওয়াটার গ্যাস (উত্তপ্ত কোক কয়লার উপর স্টীম পরিচালনার ফলে প্রস্তুত কারবন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন-গ্যাস) এবং স্টীম। প্রথমে ওয়াটার গ্যাসের একটি অংশকে ৪০০ সেণ্টিগেড তাপমাত্রায় এবং ফেরিক অক্সাইড ও ক্রোমিয়াম অক্সাইড অনুঘটকের উপস্থিতিতে স্টীমের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে কারবন ডাইঅক্সাইড ও হাইড্রোজেনে পরিণত করা হয়। অতঃপর কারবন ডাই ক্সাইডকে সরিয়ে নিয়ে অবশিষ্ট ওয়াটার গ্যাসের সঙ্গে মিশিয়ে সিনথেসিস গ্যাস তৈরি করা হয়। ঐ সিনথেসিস গ্যাসকে কোবাল্ট বা আয়রন অনুঘটকের উপস্থিতিতে উপযুক্ত চাপ ও তাপমাত্রায় প্রস্তুত করা হয় তরল হাইড্রোকারবনে। ঐ হাইড্রোকারবন থেকেই বিশেষ উপায়ে তৈরি করা হয় গ্যাসোলিন এবং উন্নত মানের ডিজেল।

সেদিন সামরিক প্রয়োজনে উক্ত পদ্ধতিগুলো আবিষ্কার হয়েছিল সত্য, তবু আজ শক্তির সংকটের দিনে এবং পেট্রোলিয়ামের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির দিনে সেই পদ্ধতিই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অভিশাপ আশীর্বাদরূপে ধরা দিয়েছে।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব সম্বন্ধে আজ আর কেউ মাথা ঘামায় না। শিক্ষার্থী মাত্রেই জেনে নিয়ে থাকে অতি ছোটবেলায়। অতি সাধারণ একটা ব্যাপার যেন। কিন্তু সাধারণ এই ব্যাপারটাকে নিয়ে প্রায় দু-হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানীরা চিন্তাভাবনা করেছিলেন। সে এক ইতিহাস।

সভ্যতার আদিপর্বে মানুষ ভাবতো, পৃথিবী স্থির হয়ে অবস্থান করছে এবং পৃথিবী থেকে অতি অল্প দূরে থেকেই কিরণ দিচ্ছে সূর্য। কিন্তু কতখানি দূরে সূর্য?

না, দূরত্বের কথা কেউ কিছু বলেননি। শুধু একটা আন্দাজ করেছিলেন মাত্র। যেমন ভারতের আদি মহাকাব্য রামায়নের কথা ধরা যেতে পারে। রামায়ণে কবি বলেছেন, হনুমান শৈশবে টকটকে লাল জবাফুলের মত প্রভাত সূর্যটাকে দেখে লাফ দিয়েছিলেন পাকড়াও করতে। লাফ মেরে একেবারে সূর্যের কাছেই পেঁাছেছিলেন। তবে পাকড়াও করে আনতে পারেননি দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য। আরও উল্লেখ আছে, সম্পাতি নামক পক্ষী উড়ে গিয়ে সূর্যের কাছাকাছি হওয়ায় তার ডানাজোড়া পুড়ে গিয়েছিল। মধ্যযুগের বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাসেরও অনুরূপ ধারণা ছিল। সম্ভবতঃ সূর্যের বিশালত্ব সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা ছিল প্রাচীন। হয়ত ভেবেছিলেন গোটা চারেক ফুটবলকে জুড়লে যা হয়, সূর্যের আয়তনও তাই। তা না হলে সূর্যকে হনুমানের বগলদাবা করার কল্পনা করতে পারতেন না।

কেবল ভারত নয়, সেকালের সবদেশের চিন্তাশীলরাই অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। মিশরীয়রা মনে করতো, পৃথিবীর একেবারে সীমান্তদেশে চারদিকে খুঁটি পোঁতা আছে। সেই খুঁটিগুলোকে অবলম্বন করে উপরে পাতানো রয়েছে নীল চন্দ্রাতপখানা, তথা নীল আকাশটা। সূর্য ও চন্দ্র দেবতা সেই আকাশে উদয় অস্ত হচ্ছেন রথে আরোহণ করে। আকাশের ওপারে হচ্ছে স্বর্গ। দেবতাদের বাস সেখানে। চীন সম্রাট ওয়ানহু তো মস্তবড় ঘুড়ি বানিয়ে এবং ঘুড়ির তলায় হাউই গুঁজে স্বর্গে যাওয়ার পরিকল্পনাও করেছিলেন। মোট কথা, সব দেশের মানুষের ধারণা ছিল, সূর্য আদৌ বড় নয় এবং দূরত্বটা এমন কিছু বেশী নয়।

গ্রীক আমলের প্রথম পর্বেও গ্রীকদের সেই একই ধারণা ছিল। তাঁদের ধারণা ছিল, আকাশে সূর্য গ্রীক দেবতা জিউসের হাতের ঢাল অপেক্ষা কিছুটা

বড়। আর অলিম্পিক পাহাড়ের চূড়া থেকে মাত্র দু-চার মাইল উপরে আছে সূর্য।

সেদিন পৃথিবী সম্বন্ধেও কারও তেমন ধারণা ছিল না। নিজ নিজ দেশ এবং পাশাপাশি যে জায়গাগুলোর সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল কেবল সেইটুকু জায়গাকে পৃথিবী বলতো। পৃথিবী যে একটা গোলক এ ধারণাও ছিল না। সমতল বলেই ভাবা হতো। ব্যসটা আর কত হবে! দু-একশ মাইল!

গ্রীকদের সেই একই ধারণা ছিল। এই ধারণার পরিবর্তন ঘটেছিল আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের ফলে। গ্রীক পণ্ডিতরা বুঝতে পারলেন, তাঁরা যা আন্দাজ করেছিলেন, তার চেয়ে ঢের ঢের বড় এই পৃথিবী। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁরই অধিকৃত মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় যখন জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা শুরু হলো, তখনই বিজ্ঞানের অপরাপর শাখা অপেক্ষা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে শুরু হলো ভাবনা চিন্তা। আকাশ আর পৃথিবীর রহস্য উদ্ঘাটনে সবাই হলেন যত্নবান।

সে সময় আলেকজান্দ্রিয়ায় আবির্ভূত হয়েছিলেন হিপারকাস নামে এক অমিত প্রতিভাধর জোতির্বিজ্ঞানী। তিনিই সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন, সূর্যের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসার্ধ অপেক্ষা অনেক অনেক বেশী হবে। কত বেশী? না, তার কোন হদিস দিলেন না হিপারকাস।

হিপারকাসের পর আরও কেটে যায় প্রায় শ'খানেক বছর। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সেই আলেকজান্দ্রিয়ায় আবির্ভূত হলেন আর এক প্রতিভাধর জ্যোতির্বিজ্ঞানী। নাম তাঁর ক্লডিয়াস টলেমিসাস। সংক্ষেপে টলেমি। যদিও টলেমি পৃথিবী স্থির হয়ে অবস্থান করছে বলে মনে করতেন, তবু পৃথিবীর একটা মানচিত্র তিনি এঁকেছিলেন। ত্রুটিপূর্ণ হলেও পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র অঙ্কনের কৃতিত্ব তাঁরই। অপরদিকে গণিতে ত্রিকোনোমিতি শাখারও প্রবর্তক তিনি। তাই পৃথিবীর ব্যাসার্ধটা নির্ণয় করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দু-হাজার মাইলের মত এবং সূর্য রয়েছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ১২০০ গুণ দূরে।

টলেমির হিসেব আদৌ ঠিক ছিল না। তবুও তাঁর পৃথিবীকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের পরিকল্পনা, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, ইত্যাদিকে পৃথিবীর মানুষ দীর্ঘকাল অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়েছিল। টলেমি নির্ধারিত সত্যের যাচাই করা হয় ইওরোপের নবজাগরণের দিনে। কোপার্নিকাস্ গ্যালিলিও প্রমুখ বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন, পৃথিবী স্থির নয়, এবং সে গোলাকার। ভৌগোলিক আবিষ্কারক এবং সমুদ্রে যেসব নাবিক চলাফেরা করতেন তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও একদিন প্রমাণ করলো, পৃথিবী একটি সুবৃহৎ গোলক। এর ব্যাসার্ধও মাত্র দু-হাজার মাইল নয়। আরও অনেক বেশী।

এবার নতুন করে পৃথিবীর মানচিত্র আঁকার প্রচেষ্টা শুরু হলো। সেই

সঙ্গে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ণয়ও। অপরদিকে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নির্ণয় করতেও কেউ কেউ এগিয়ে এলেন। এবং সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্বকে একক ধরে গ্রহ নক্ষত্রদের দূরত্বের অনুপাত নির্ণয় করতেও বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হলেন। প্রচলিত হলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের একক অ্যাসট্রোনমিক্যাল ইউনিট বা বা এ, ইউ।

এই বিষয়ে সর্বাধিক কৃতিত্ব জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোহান কেপলারের। কেপলার টলেমির ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করালেন এবং জানালেন, সূর্য পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ৩৫০০ গুণ দূরে হয়েছে।

না, কেপলারের ধারণাও সত্য ছিল না। তাঁর পরীক্ষায় ত্রুটি ছিল যথেষ্ট। সেই ত্রুটিগুলোকে দূর করতে সচেষ্ট হলেন ক্রিশ্চিয়ান হাইঘেন্স। মঙ্গলগ্রহের উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে মাইক্রোমিটার পদ্ধতিতে তিনি পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব তথা জ্যোতির্বিজ্ঞানের একক স্থির করলেন তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল।

হাইঘেন্স কিন্তু নিজের পদ্ধতিতে নিজে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর পরীক্ষা এবং যন্ত্রের মধ্যে যে ত্রুটি আছে একথা স্বীকারও করলেন এবং উল্লেখ করলেন, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব আরও বেশী হওয়া সম্ভব।

হাইঘেন্সের পরে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেন দুই ফরাসী বিজ্ঞানী পিকার্ড এবং কার্সিনি। ততদিন পৃথিবীর অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমা নির্ণয়ের নির্ভুল পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। পৃথিবীর প্রচলিত মানচিত্রকে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করলেন। ব্যাসার্ধ নির্ণয় করলেন প্রায় চার হাজার মাইলের মত। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর কাছাকাছি এলে একদল ফরাসী বিজ্ঞানীসহ তাঁরা পৃথিবীর নানা জায়গায় গিয়ে পর্যবেক্ষণ চালালেন। গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করলেন সেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের এককটি। এবার দেখা গেল সেই একক আট কোটি সত্তর লক্ষ মাইল। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব স্থির হলো আটকোটি সত্তর লক্ষ মাইল।

হাইঘেন্সের মত কাসিনি নিজেও সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাই তিনিও উল্লেখ করলেন, তাঁর পরীক্ষার ত্রুটি আছে এবং দূরত্বটা আরও বেশী।

কাসিনির পর ৯০ বছর কাল এই নিয়ে যথেষ্ট তর্ক বিতর্ক হয়। নানাজনে নানাভাবে দূরত্বটা নির্ণয় করতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু ব্যর্থ হন সবাই। পরিশেষে বিতর্কের অবসান ঘটাতে একদল বিজ্ঞানী ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ নয় বছর কাল গ্রহদের বিশেষ করে শুক্রগ্রহের উপর পর্যবেক্ষণ চালালেন। ততদিনে গণিতের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, আকাশ পর্যবেক্ষণেরও হাতিয়ার এসেছে। এবার তাই ভুল হলোনা, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব স্থির করা হলো ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল।

সাপের বিষের প্রতিষেধক

প্রায় সব দেশেই কিছু না কিছু বিষধর সাপ আছে এবং প্রতি বছর বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ সর্পদংশনে প্রাণ হারায়। বড় মর্মান্তিক সেই মৃত্যু। তাই মানুষ বোধ হয় বনে থাকার সময় থেকেই সর্প-বিষের প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে এসেছে।

এককালে মানুষের ধারণা ছিল, প্রকৃতিতে গাছপালার রাজ্যেই সর্পবিষের প্রতিষেধক লুকিয়ে আছে। অ্যালকেমিস্টদের মতই এক শ্রেণীর মানুষ হন্যে হয়ে খুঁজেছিলেন সেই প্রতিষেধক। অমৃত কিংবা পরশপাথরের মত সাপের বিষের প্রতিষেধক বোধ হয় কেউ লাভ করতে পারেন নি। শুধু কিংবদন্তীরূপে সমাজে প্রচলিত আছে নানা কাহিনী।

সর্পদংশনের ভয়াবহতাকে কেন্দ্র করে আদিম সমাজ ব্যবস্থা থেকে এপর্যন্ত একদল সর্পবিষ বিষেজ্ঞদের সদর্প পদচারণা লক্ষ্য করা যায়। যাঁদের ঝাড়-ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্র এবং কিছু কিছু ভেষজই সম্বল ছিল। গুরু পরম্পরায় তাঁরা এগুলো লাভ করে আসছেন। তাঁরা সাপে কাটা রোগীকে বাঁচাতে পারেন বলে দাবীও করে থাকেন।

আজকের দিনে সাপ সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে জানা গেছে, বেশীর ভাগ সাপ কিন্তু বিষধর নয়। আবার কিছু কিছু সাপের যে বিষ থাকে, সে বিষ মানুষের সহ্য সীমার ভেতরে। অর্থাৎ ওদের কামড়ে মানুষের মৃত্যু হয় না। যেমন জলঢোঁড়া, প্রজননকালে লাউডগা প্রভৃতি সাপ, কয়েক জাতের বোড়া, ইত্যাদি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ওরাই কামড়ায়। আর ওঝাদের কেরামতি ঠিক সেইখানেই। কিন্তু কোবরা জাতীয় সাপ যথা গোখরো,, কেউটে, শঙ্খচূড় প্রভৃতি কিংবা চন্দ্রবোড়া, বঙ্করাজ, চিত্রল প্রভৃতি আমাদের পরিচিত অতি বিষধর সাপ কামড়ালে ওঝার কেরামতি শেষ। আর ঐ অবস্থায় ওঝারা বলেন "কালে কেটেছে।"

সাপে কাটা রোগীকে নিরাময় করানোর প্রচেষ্টা বহুকালের হলেও বিষের প্রকৃতি, স্বরূপ এবং শরীরে সর্পবিষের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত বিষঘ্ন তৈরি করা কিছুতেই সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞানের উন্নতি হলে এবং টিকাদানের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বিজ্ঞানী চিন্তাভাবনা শুরু করেন। গবেষকদের গবেষণা থেকে ধরা পড়ে সাপের বিষ এক ধরণের

প্রোটিন তথা জটিল জৈব যৌগের সংমিশ্রণ ছাড়া কিছুই নয়। ওতে বিশেষ বিশেষ কয়েকটা উপাদান থাকে। সেই উপাদানগুলো শরীরে নানা ধরণের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া করে এবং রোগীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

কোবরা জাতীয় সাপের বিষে Cardiotoxin এবং Haemoxrhagin নামক দুটি উপাদান খুব বেশী পরিমাণে থাকে। প্রথমটি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করায়। দ্বিতীয়টি রক্তের হিমোগ্লোবিনকে বিনষ্ট করে এবং রক্ত জালকের প্রাচীর ধ্বংস করে রক্তপাত ঘটায়। ফলে দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতিগুলো যেমন বিকল হয়ে যায় তেমনই রক্তকণিকা অক্সিজেন পরিবহণে ব্যর্থ হয় বলে রোগীর শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়।

তাছাড়াও Neorocypotysin এবং Antibactericidam নামক দুটি উপাদান সাপের বিষে থাকে। উপাদান দুটো মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ডকে অসাড় করে দেয়। অপরদিকে মস্তিষ্কে রক্তকরণও ঘটায়। তাই তীব্র বিষধর সাপের দংশনে রোগী অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আবার দংশনের ফলে শিরা যদি ফুটো হয়ে যায় তাহলে শিরার রক্তের মধ্যে বিষ সহজে অনুপ্রবেশ করে। ফলে বিষযুক্ত রক্ত তাড়াতাড়ি হৃৎপিণ্ডে গিয়ে পৌঁছায়। এতে রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। এবং অনেক সময় মাত্র পনের মিনিটের মধ্যে রোগীর মৃত্যু ঘটে যায়।

সর্পবিষের প্রতিষেধক আবিষ্কারের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। এই ব্যাপারে ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছিলেন সিউয়েল নামে এক জীববিজ্ঞানী। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী গবেষকদের গবেষণাকে অবলম্বন করে জীবদেহে অল্প পরিমাণ বিষ ইনজেকশান করে জীবের দেহে ওর প্রতিষেধক অ্যান্টিবডি আপনা হতে জন্মায় কিনা পরীক্ষা করতে যত্নবান হন। প্রথমে তিনি সংগ্রহ করেন র‍্যাটেল সাপের বিষ। তারপর সীমিত পরিমাণে প্রয়োগ করেন কয়েকটা পায়রার উপর।

পায়রাদের মৃত্যু হল না। আবার তিনি অল্প পরিমাণে সেই বিষ প্রয়োগ করলেন। এবারও পায়রাগুলোর কোন ক্ষতি হল না। কয়েকদিন পরে এমন বিষ তিনি প্রয়োগ করলেন, যাতে পায়রাদের মৃত্যু ছিল অবধারিত। কিন্তু না, বেঁচে গেল পায়রাগুলো।

সিওয়েলের পরীক্ষা থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা উৎসাহিত হলেন। তাঁরা সর্পবিষের প্রতিষেধক অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে সেই অ্যাণ্টিবডি প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা অশ্বের উপর প্রয়োগ করলেন বিষ। বেশ কয়েকবার সীমিত পরিমাণে বিষ প্রয়োগের পর নির্দিষ্ট সময় অন্তে সেই অশ্বের দেহ থেকেই গ্রহণ করলেন রক্ত কনিকা এবং সেই রক্ত কণিকা থেকে তৈরি করলেন সর্পবিষের প্রতিষেধক তথা অ্যাণ্টিভেনিন।

প্রয়োগ করতে গিয়ে একটা অসুবিধার সম্মুখীন হলেন চিকিৎসকরা। যে কোন সাপের বিষে একই অ্যাণ্টিভেনিন ক্রিয়া করে না। তখনই প্রা তটি

বিষধরের জন্য পৃথক পৃথক অ্যাণ্টিভেনিন তৈরির জন্য চেষ্টা শুরু হলো এবং বিজ্ঞানী এবার সুফল পেলেন।

বর্তমানে আরও উন্নত মানের অ্যাণ্টিভেনিন তৈরি হয়েছে এবং উদ্ভাবিত হয়েছে উন্নত চিকিৎসা প্রণালী। এমন অ্যাণ্টিভেনিন তৈরী হয়েছে যা এক জাতীয় বেশ কিছু সংখ্যক সর্পবিষের প্রতিষেধক।

তবে হ্যাঁ, রোগীকে যথাসময়ে হাসপাতালে পেঁছে দিতে হয়। দংশন মাত্র ক্ষতস্থানের কিছু উপরে উপরে দুটি কিংবা তিনটি কাপড়ের ফালি দিয়ে টানটান করে খুব ভাল ভাবে বাঁধন দিতে হয়। প্রতি দশ-পনের মিনিট অন্তর অন্তর বাঁধনকে একটু আলগা করে পুনরায় বেঁধে দিতে হয় ভালভাবে। ওতে রক্ত চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না।

রোগীকে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। প্রাথমিক চিকিৎসা কিংবা ওঝা ডাকার জন্য অপেক্ষা করলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। ঠিক সময়ে তথা সর্পদংশনের দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে রোগী যদি চিকিৎসা পায় তাহলে রোগীর মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই। শতকরা ১০০টি রোগীই অ্যারোগ্য লাভ করবে।

আরও ভাল হয়, যদি সাপটিকে চিনে রাখা হয়। তাতে চিকিৎসকের সুবিধা হয় অনেকখানি। নয়ত চিকিৎসকে অপেক্ষা করতে হয় উপসর্গ লক্ষ্য করার জন্য। উপসর্গ দেখেই তাঁরা অবশ্য চিনে নিতে পারেন—কী ধরনের বিষধর দংশন করেছে—কোবরা, চন্দ্রবোড়া, না অন্য কিছু?

আজকের দিনে তাই সাবধান হলে সর্পদংশনে প্রাণ হারানোর কোন প্রশ্নই উঠেনা।
